

মরুতীর্থ হিংলাজ

অবধূত

"অক্ষরদ্বয়ং হিংলারং তৈরবে। তীর্থলোচনং ।
কোটরী না মহানার। ত্রিগুণা বা বিগছরী ।"

মিত্র ও ঘোষ

১০, শ্রীমাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকতা-১২

দ্বিতীয় সংস্করণ
—পাঁচ টাকা—

এই লেখকের আশাবী এই—

বন্দীকরণ

উদ্ধারণপুরের ঘাট

বিশ্ব ৩ যোব, ১০ ভাষাচরণ যে ট্রিট, কলিকাতা ১০ হইতে শ্রীভানু রায় কর্তৃক প্রকাশিত
এছাড়াও, ৩০ কলিকাতা ট্রিট, কলিকাতা ১০ হইতে শ্রীভানু রায় কর্তৃক মুদ্রিত

উৎসর্গ

শ্রীকৃষ্ণাবনচন্দ্রো। অন্নতু

শ্রীকৃষ্ণাবনচন্দ্রায় এন্থোহন্নমর্প্যতে ময়া।

একদা হিংলাজ দর্শনে গিরেছিলাম। বই লেখার কথা তখন মনের কোণেও উদয় হয় নি। আমার বন্ধু চুপী ঘোষের মামা প্রচেষ্টা কবি হুবোধ রায় মহাশয়ের সঙ্গে পরিচয় না ঘটলে কোনও দিন কিছু লিখতেও বলতাম না। এর সংস্পর্শে এসে এই অসাধ্য সাধন করতে বাধ্য হলাম।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সহজ লোক নন। তাঁর হুকুম অমান্য করবার শক্তি আমার ছিল না। তিনি যখন হুকুম করলেন “শেষ করে ফেলুন লেখাটা” তখন মরীয়া হয়ে শেষ করে ফেললাম।

এঁরা দুজনে বইখানি লেখার জন্তে দায়ী। আজ যদি এঁদের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে যাই সেটা স্নেহ বাচালতা করা হবে। আমার কৃতজ্ঞতা এঁদের নাগাল পাবে না।

“নতুন পাথের” পত্রিকার তাঁরা এবং “তরুণের স্বপ্ন” পত্রিকার এঁরা আমাকে ভালবাসা দিয়ে কিনে রেখেছেন।

নেপথ্যে বসে যিনি নিরলস পাহারা দিয়েছেন বানানভুলের ওপর তাঁর নাম শ্রীকৃষ্ণদয়াল বহু। এই ভয়াবহ কাজটি আমাকে করতে হলে কোনও কালে এ বই ছাপা হত না। এই নীরল দায়িত্ব তিনি বেচ্ছায় বহন করেছেন। তাঁকে আন্তরিক প্রণাম জানাচ্ছি।

ভৈরবীর স্বতিশক্তির সহায়তা না পেলে এ কাহিনী লেখা সম্ভব হত না। অতদিন আগেকার ঘটনার খুঁটিনাটি সবই তাঁর মনে আছে, কাজেই তাঁর স্বতিশক্তির কথা উল্লেখ না করা অসম্ভব হবে। ইতি—

আবাহু, ১৩৬২

অবদূত

স্বীকৃতি

প্রকাশক জানালেন “প্রথমবার যা ছাপা হয়েছিল সব ফুরিয়ে গেছে। আবার বই ছাপাখানায় পাঠাচ্ছি, নতুন যদি কিছু বলবার থাকে তা লিখে পাঠান।”

হিতৈষীরা বললেন “আগাগোড়া ভাল করে দেখে-শুনে দাও। বড় কাঁচা হাতের ছাপ রয়েছে। বহু জায়গায় শুকচণ্ডাল দোষ ঘটেছে।”

ভাবতে বসলাম এবং সত্যে ভাবা বন্ধ করলাম। ভাল করতে গিয়ে যদি আরও মন্দ করে বসি—তা’ হলে উপায়?

তার চেয়ে যেমন আছে থাক, আমি সাহিত্যিক নই, স্তূতরাং আমার সাত খুন মাক।

দোষগুণ-স্বক ভাল লাগাই আসল ভাল লাগা। যারা পড়বেন তাঁরা যে খুঁতখুঁতে স্বভাবের মানুষ তাই বা আমি মনে করতে বাব কেন।

লিখে পাঠালাম—“আমার কিছু বলবার নেই। যা খুশি আপনারা বলুন।” ইতি—

মার্চ, ১৩৬২

অবশ্যত

১৩৫৩, আঘাত মাস। ছিটে-কোঁটা বৃষ্টিও দেখা নেই। ধুলার সমুদ্রের মাঝে সর্বপ্রকার আভিজাত্যের হোয়া এড়িয়ে করাচী শহরের শেষ প্রান্তে একটি বস্তি, সেইখানে নাগনাথের আখড়ার অতি প্রাচীন দালানটার এক কোণে আশ্রয় নিয়েছি হিংলাজ-বাজী আমরা কয়জন।

এই স্থানটি করাচী শহরের অনেকগুলি কালভু মানব-মানবীর স্বাদের আস্তানা। পথে কাটে যাদের দিন, তাদের অনেকে রাতটা এখানেই কাটার। সারাদিনের দেওয়া-নেওয়ার হিসাব-নিকাশের জের রাতের আধারে এখানেই টানা হয়। পাশাপাশি শয়ন করলে জনা-শতেক লোক এখানে ধরে। কিন্তু গরজ বখন অনেকের তখন একটু আপদ-বালাই বে বটবেই তাতে সন্দেহ কি। তার উপর অনেকের আবার তিনদিক খোলা দালানটার ওরই মধ্যে একটু আড়াল সম্ভব হওয়া চাই। বিড়ি ধরাবার প্রয়োজনে রাতে দিরাশলাই আলানও নিষিদ্ধ। শালীনতার আঘাত লাগতে পারে।

এই নাগনাথের আখড়া একদা নাথ-সম্প্রদায়ের সাধুরা স্থাপন করেন। সেই একদা বে কবে তার ইতিহাস জানা অসাধ্য। কালে তাঁরা বখাস্থানে প্রস্থান করেছেন। বর্তমানে আখড়া ধারা দখল করেন তাঁরাই এর চারিদিকে লসলসার বসবাস করছেন।

এঁদের পেশার অভ নেই। জুতা-সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ পর্যন্ত। তার মধ্যে বড় পেশা—বছরে দু' একমল বাজী নিয়ে হিংলাজ বাজা। একদা সাধুরা এই আখড়া স্থাপন করেন হিংলাজ দর্শনাভিলাষী সাধুসঙ্ঘের আশ্রয়-স্থানের অভাব পূরণের অস্ত্রেই।

কিন্তু আজ ধারা পেশা হিসাবে হিংলাজ-বাজী নিয়ে তীর্থ দর্শন করাতে যান তাঁদের পোড়া পেটের দাবী মেটাবার মত উৎস এ পেশার সম্ভব নয়।

সারা ভারত থেকে প্রাণের মারা ত্যাগ করে বসকমহীন এই তীর্থে বাজীই বা জোটে কয়জন ? যদিও বা কেউ আসেন তিনি হয় লোটা-কমল-চিমটা-সমল মাড়কে-খানেকালা অথবা বড়জোর একমল কাথীওয়াড়ী চাবী, সমল যাদের আটা লবণ বরিচ ও কমল ।

হুতরাং হিংলাজের ছড়িদারদের সংসার ও সংসার-লক্ষীদের চেহারা আর যে-কোন পরিচরই থাকুক, শ্রী ও শান্তির চিহ্নমাত্র নেই, থাকতেও পারে না ।

হুজন চারজন করে জমতে জমতে শেষ পর্যন্ত বাজীদল ত্রিশ পর্যন্ত পৌঁছল গোটা একমাল অপেক্ষা করে । আর অপেক্ষা করাও সম্ভব নয় । পথের নদী-গুলো শুকনো থাকতেই ফিরে আসা চাই । অনেকবার নাকি এমনও ঘটেছে যে নদীর জল বৃষ্টির কলে দিনের পর দিন আটকে পড়ায় বাজীদলের আহাৰ পেছে হুঝিরে, তারা আর কখনও ফিরে আসে নি । পরের বছর যারা গেছেন তারা এখানে ওখানে বালুর উপর রাশি রাশি শুকনো শুভ্র হাড় দেখতে পেয়েছেন ।

ছড়িদারদের তরফ থেকেও এবার বাজার তাগিদ দেখা দিল । এখন উটওয়ালা এলেই হয় ।

গোটা একটা মাস পার হয়ে গেল সেই নাগনাথের আখড়ার দালানটার । নিশীথ রাত্রে চারিদিকের রহস্যময় ঘুমন্ত মাছুষগুলির মধ্যে শুয়ে কত কি যে ভাবতাম—জন্ম মৃত্যু, পাপ পুণ্য, ইহকাল পরকাল । কোন কিছুই কুল-কিনারা নেই । সারা জীবনটা চোখের সামনে গড়গড় করে বয়ে চলে যেত । আমি নামক লোকটি যেন এই জীবন-নাটকটার নাম-কুমিকার অভিনেতা । কিন্তু নাটকটা যার লেখা—তার ইচ্ছা ও মজির বাইরে এক-পা কেলবার কমতা আমার নেই । সবচেয়ে বড় মজা, এখনও যে অকগুলি থাকি আছে—তাতে যে আমাকে কি অভিনয় করতে হবে, তাও জানবার উপায় নেই ।

ঐ বে দূরে আকাশের পশ্চিম দিকে আস্তে আস্তে সন্ধ্যাতারাটা চলে যাচ্ছে, ঐ দিকেই কোথাও হিংলাজ। আজও জানি না ঐখানে পৌছনো আমার কপালে ঘটে উঠবে কি না। আর এই সুদীর্ঘ ধৈর্যপরীকার শেষ কল বখন মিলবে তখন কোতূহল নিবৃত্তির আকস্মিক ছাড়া আর কি আমার ঘরে পড়বে তাই বা কে জানে।

দীর্ঘনিঃশ্বাস আপন হতেই বুক থেকে বেরিয়ে আসে। ছুটে চলেছি যেখানে সতীর ব্রহ্মরক্ষু পড়েছিল, সেই মহাপীঠ হিংলাজে। ভগবান রামচন্দ্র দাবণ-বধ করে ব্রহ্মহত্যার পাপ-ভাগী হয়েছিলেন, তাঁর সেই পাপশালন হয় এই মহাতীর্থ দর্শনে। অতবড় পাপ অবশ্য আমার হিসাবের ঘরে জমা থাকে সম্ভব নয়। এ যুগে ব্রাহ্মণ কোথায় যে, ব্রহ্মহত্যার পাপ ঘটবে আমার। তবে অন্তত এইটুকু আমার কপালে নিশ্চয়ই জুটবে বাতে আমার এই জীবন-নাটকের অনাগত অজানা অঙ্কগুলিতে ছোটোছুটির পালা আর থাকবে না, আকুলি-বিকুলির ঘবনিকা-পাত হবে। এই আশাটুকুই মনের কোণে চেপে আগামী কালের অপেক্ষায় পাশ ফিরে শুই।

দিনের বেলা ব্যস্ত থাকি—পাথের যোগাড়ে। শেঠ ভগবান দাস সব থেকে বড় সোনার ব্যবসায়ী করাচী শহরে। তিনি কলকাতার কালী আর মৌহাটির কামাখ্যা স্নান দর্শন করেছেন। তিনি ব্যবস্থা করলেন আমাদের হিংলাজ দর্শনের। কামাখ্যার ত্র্যম্বক ভৈরব-ভৈরবীর প্রতি তাঁর অটল আস্থা—যদিও তিনি নিজে গোঁড়া জৈন। পোকা খাবার ভরে অর্থাৎ পাছে জীবহত্যা হয় এ কারণে সন্ধ্যার পর তিনি জলও পান করেন না।

কিন্তু মুশকিল বাধল বাঙলা দেশের আগরাতকে নিরে। হিংলাজ-পাথের কষ্ট সহ্য করা কোনও ক্রমেই তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়।

শেষ পর্যন্ত প্রচুর অর্থ ব্যয় করে একটা আস্ত উট ব্যবস্থা করলেন তিনি ভৈরবীর অস্ত্রে। সেই উটের গিঠে উঠল মুখঢাকা টিনে টিনে বোকাই চীনা-বাদার আখরোট কিনসিরি খেজুর মিহরি আর বড়া বড়া চাল আটা লস

মরিচ আলু পেঁয়াজ! বড় বড় বোম্বাই পেঁয়াজ! পেঁয়াজ কেন হিংসাজে
চলেছে? পেঁয়াজী আমাদের বোঝালেন বাণুর মধ্যে এই পেঁয়াজ চিবিয়ে
খেলো 'লু' লাগবে না আর পিপাসাও কম পাবে।

ব্যবস্থা এতই দরাজ হাতে হল যে দলহুদু সবাই মায় ছড়িয়াররা আমাকে
মোহন্ত মহারাজ বলে ডাকতে শুরু করলে।

জারপর সেই বিপুল পরিমাণ লটবহরকে দুই ভাগে ভাগ করে উটের
হুঁধারে ঝুলিয়ে দেওয়া হল, তাতে তার পিঠের উপর খানিকটা সমতল স্থান
তৈরী হল। তার উপর একটা খাটিয়া চিৎ করে পেতে উটের সঙ্গে আচ্ছা
করে বেঁধে দেওয়া হল। শেষে খাটিয়ার পায়া চারটে ঘিরে দড়ি বাঁধা হল।
সেই চিৎ-করা খাটিয়ার মধ্যে দড়ি ধরে বলে চললেন ভৈরবী। তাজব ব্যাপার
হচ্ছে এই যে, বাওয়া আলার বোল হুগুণে বজ্রিশ দিন দৈনিক আটবটা হিসাবে
সমানে তিনি ঝাঁকি খেলেন। আর সে কি ঝাঁকানি! উট এক কদম চরণ
কেললে ঈশান অগ্নি নৈঋত বায়ু চারকোণে চারবার টাল সামলাতে হয় তাঁকে
যিনি উপরে চড়ে বসে থাকেন। কিন্তু কোন অভিযোগের কোন তোয়াকা
নেই ভৈরবীর। ধুলী মনে সমানে চীনাবাদাম ও খেজুর চিবনোই হচ্ছে তাঁর
কাজ। একেবারে রাজসিক ব্যাপার। লটবহর নিয়ে যাত্রা আরম্ভ হল
একদিন বিকেল তিনটের সময়। তার পূর্বে প্রত্যহ সকাল-সন্ধ্যা অষ্টপ্রহরে
কম্বে কম অষ্টআশী বার "উটওয়ালো কবে আসবে" এই এক কথা জিজ্ঞাসা
করতে করতে আমাদের নাতিখাল ওঠবার উপক্রম হল। এদিকে আমাদের
প্রব্ধের ছড়িয়ারগণ নির্বিকার ভাবে উত্তর দিতেন, "কে জানে কবে আসবে,
সংবাদ শু দেওয়া হয়েছে, বাধীন মুহুরের লোক তারা; সবই তাদের বেজাজের
উপর নির্ভর করে।"

বাধীন দেশের লোক উটওয়ালারা। আমরা যেখানে তীর্থ করতে
যাচ্—সেই দেশ বাধীন লাগবেলা স্টেট। করাচীর সীমানা পার হয়ে সেই
দেশের আরম্ভ এবং শেষ বেগুচিহানের সীমানায়। সেখান থেকে আসবে

সেই দেশের উট আর উটওয়ানা। লোক জনে সরকারের খাতার লিখিয়ে দিয়ে আমাদের ভার নেবে সে। কিরিয়ে দিয়ে যাওয়াও তার দায়িত্ব। রাত্তা সেই জানে, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে প্রমাণ হল, না তা নয়, জানে তার উট।

অবশেষে একদিন এসে পৌছল তারা। তারা চার জন। উটেরা মা ও ঘেয়ে দু'জন, আর বাপ-ছেলে উটওয়ানারা দু'জন।

শেখ গুলমহম্মদ অর্থাৎ বাপ মহাশয় বকতে বকতে উপস্থিত হলেন। তাঁর ভয়ানক ক্রোধ এবং ক্রোধের তাড়নাতেই এত বয়সে তাঁকে ঘর ছেড়ে এই শক্ত কাজ করতে হচ্ছে। সবই নসীব! তবে হাঁ, ধর্মনিপাত্ত 'নানী কী হজ' বাজিগণের তিনি নোকর হুতরাং পরপারে তাঁর বেহেস্তে কাল ঠেকার কে।

আমাদের সকলকে নত হয়ে বার বার সেলাম করে উটদের তিনি বলতে লাগলেন যে, তাদেরও জন্ম সার্থক, কারণ এ হেন পুণ্যাত্মা বাজিগণ ইতিপূর্বে আর কখনও আসে নি এবং এটা একেবারে সুনিশ্চিত যে এবারের যাত্রায় খয়রাৎ বা জুটবে তাতে নিশ্চিত একবছর ঘরে বসে আরাম করা যাবে। আরও কত কি তিনি বলে যেতে লাগলেন কে তার হিসাব রাখে।

রৌদ্রদগ্ধ সাড়ে ছয় ফুট লম্বা গুলমহম্মদ এককালে রূপবান ছিলেন। পুজ দিলমহম্মদও লম্বায় সাড়ে ছ'ফুট, বাহ্যিক বেশ সুন্দর। রূপ, বয়স ও মুখ-টিপে হাসি সমস্ত মিলিয়ে যেন রূপকথার রাজপুত্র। একমাত্র বিপদ হচ্ছে ওদের পরিধেয়গুলির দুর্গন্ধ। কলকাতায় কাবুলিওয়ানা দেখা যায় অনেক। হুতরাং এদের আকৃতি সবচেয়ে সকলেরই মোটামুটি একটা ধারণা থাকতে পারে। কিন্তু সাজ-পোশাকের কদর নোংরা অবস্থাটা কল্পনা করা অসাধ্য। আর তাদের প্রকৃতির মাধুর্যের তুলনা দিতেও আমি সম্পূর্ণ অক্ষম।

বজ্রিশ দিন এদের হাতে জীবন-মরণ, মান-ইজ্জত সব কিছু সমর্পণ করে জন-মানবহীন আকাশতলে ঘুরেছি আর প্রতি পদে পদে মর্মে মর্মে এই মৃত্যু-

টুকু অহমত্ব করেছি যে দ্বিভক্তা আর নীচতা এক বস্তু নয়। সেবা করার প্রকৃতি উপদেশ শুনে বা বই পড়ে কারও মধ্যে পজার না। সততা বাপারটা শেনাল কোড ও পুলিশের চোখ-রাঙানিতে বেঁচে আছে এও সত্য নয়। ডাল-যক্ষ, স্তার-অস্তার—এই সমস্ত প্রেমের বাইরে আলাদা আর-একটা জগৎ আছে যেখানে নিদারুণ অভাবেও প্রকৃতির নিরাভরণ নিঃস্ব সন্তানেরা দরদওয়ালার বৃক্ষের ছাতি নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। সেই বৃক্ষগুলির মধ্যে একমাত্র প্রেম ও ভালবাসারই রাজত্ব। সেই রাজত্বের রাজা ও রাজপুত্র নির্বিকারচিত্তে আমাদের সকল দায়িত্ব তুলে নিলে।

আমাদের রাজা হল স্কর। উর্টের মায়ের পিঠে উঠল জনা-প্রতি বজ্রিশ লের হিলাবে আটা লবণ মরিচ শুড়। মেয়ের পিঠে উঠলেন সন্তোজ্য ও সবজ্য ভৈরবী। দল বেঁধে বস্তির মেয়েরা ভৈরবীকে বিনায় দিতে ঘিরে দাঁড়াল। মেটে সিঁহুরে তাঁর কপাল লালে লাল, লাল সূতার শুচ্ছ কজি থেকে কচুই পর্যন্ত সকলে বেঁধে দিল। সকলের চক্ষু সজল।

সূর্য তখন অস্তগামী। অস্তগামী সূর্যকে সামনে রেখে আমরা এগিয়ে চললাম। কিরে আসার পর—গুলমহম্মদ ও দিলমহম্মদকে পুরা হুঁধান পাগড়ির কাপড়ের অঙ্গীকার করলেন শেঠজী। ভৈরবীর পিঠে কমসে কম দশলের ওজনের পাঞ্জাবানা রেখে গুলমহম্মদ তার জীবনভোর না-রাজা সন্তর বছরের পুরানো হলুদ স্বেত্রের বজ্রিশখানা মজবুত দাঁত বার করে শপথ করলে—জান কবুল করে তার মায়ের মান-ইজ্জত সে রাখবেই। উপযুক্ত পুত্র তার সহায়, আর খোদা উপরে আছেন।

প্রথমে মিনিট-কুড়ি করাচীর পিচ-ঢালা রাস্তা, তারপর ধানকতক চষা জমি। সর্বসম্মত নেড়বট্টা চলার পর আমরা হাব নদীর ধারে রাজের জন্ত ধামলুম। বায়ে করাচী এম্বোড্রোমের লাল আলোঙলি মাথা উচু

করে পাহারা দিচ্ছে। আমরা নদীর কিনারায় গুলের দক্ষিণে খোলা মাঠে আসন পাতলুম, এইখানে অতি প্রত্যাশে আমাদের যাত্রার সংকল্প গ্রহণ করতে হবে। তারপর নদী পার হয়ে আমাদের সত্যকার যাত্রা শুরু হবে।

আমাদের ছড়িয়ার বে কারা তখনও তা আমরা জানতে পারি নি। ছড়ি, অর্থাৎ হিংলাজ থেকে আনা একটা গাছের ডাল, দেখতে অনেকটা ত্রিশুলের মত। ত্রিশুলটাকে সিন্দূর মাখিয়ে এক অপূর্ব ও বিস্ময়কর বস্তুতে পরিণত করা হয়েছে। মূশকিল-আসানদের মত তাতে বিচিত্র বর্ণের কাপড়ের কালি ঝোলানো। এটি একটি ভয়ানক পবিত্র বস্তু। যেখানে পৌঁছে প্রতিদিনের যাত্রার বিরতি হবে সেখানে এটিকে বাগির উপর পুঁতে সর্বপ্রথম এর ভোগ লাগানো হবে। ভোগ লাগানো মানে হচ্ছে এক ছিলিম গাঁজা সেজে এঁকে সসন্ত্রমে নিবেদন করে—নিজেরা কবে দম লাগানো। এই ছড়ির প্রসাদাৎ—অর্থাৎ এঁকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য না করলে—আমাদের যাত্রা হবে নির্বিঘ্ন।

শেষ রাত্রে হাব নদীর কিনারায় আমরা দলস্থল লোক সন্ন্যাসী লাজলার। প্রত্যেকের অন্তে এক একখানা কমালের মাশে নৃতন কাপড় গেকরা বসে ছুপিয়ে নিয়ে এলেন এক প্রোড় পাণ্ডা। তিনি গুরুগম্ভীর গলায় তাঁর নিজস্ব ভাষায় আমাদের শপথ করালেন যে, মাতা হিংলাজ দর্শন করে এখানে কিরে আসা পর্যন্ত আমরা আমাদের সন্ন্যাস-ব্রত পালন করব এবং কেউ কাউকে হিংলা করব না। আমরা সকলে সকলকে সাধ্যমত সাহায্য করব কিন্তু কোনক্রমেই নিজ নিজ কুঁজোর জল অপরকে দান করব না। এমন কি, স্বামী স্ত্রীকে, স্ত্রী স্বামীকে, বা ছেলেকে বা ছেলে মাকেও নিজের কুঁজোর জল দিতে পারবে না। তার কারণ, তাতে শেষ পর্যন্ত দুটো জীবনই নষ্ট হতে পারে। প্রত্যেকের মাথায় সেই গেকরা বস্ত্রখণ্ড বেঁধে দিয়ে দলের মধ্যে একজনকে মোহন্ত, একজনকে ভাণ্ডারী ইত্যাদির কার্যভার দিয়ে তিনি ব্রাহ্মযুহুর্তে আমাদের নদী পার করে দিয়ে বিদায় দিলেন। হিংলাজ যাত্রার অর্থপত্রের সঙ্গে ছড়ি উঠল। সবিস্ময়ে দেখলাম আমাদের ছড়িয়ার বা সঙ্গী হুঁজনের বরল একসঙ্গে বোগ দিলে ত্রিশ

পার হবে না। অর্থাৎ বড়টি সন্তেরো বা আঠারো এবং ছোটটি বারো বা তেরোর সীমানা পার হয় নি। ভরসা কোথায়?

এদের দু'জন সারা দিনবাজে ছিলিম তিরিশেক গাঁজা খেতে পারে, অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালি করতে পারে, এবং সদাসর্বদা হিন্দী কিলমের গান গাইতে পারে।

আমরা যাত্রীরা হলাম এঁদের বজমান। আমরা এঁদের ভক্তি করব, এঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করব, এঁদের সেবাও করব। নচেৎ তীর্থ দর্শনের কষ্টটুকুই লভা হবে, পুণ্যটা বাবে উবে।

এঁরা চললেন ছড়ি বাড়ে করে প্রথমে; কণ্ঠে হিন্দী কিলমের গান। আমরা চললাম পিছনে; কণ্ঠ রুদ্ধ, মাথার হুচিভা।

ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। পাখীরা জাগছে, পিছনে ফেলে আসা এরোড্রোমের লাল আলোগুলো তখনও বোধ হয় আমাদের ফিরে যেতেই ইসারা করছে। পারের তলার কাঁটা ফুটছে, কাঁটাগাছের খোপগুলির মধ্যে দিয়েই পথ।

পিছনে পূর্ব আকাশে আলো ফুটে উঠল। মনে পড়ল, এতক্ষণে পুরীতে সূর্যোদয় হয়েছে। আলোর ভেসে যাচ্ছে সমুদ্র-লৈকত। বহুবীর দেখা জগন্নাথ দেবের মন্দিরের চূড়াটি ভেসে উঠল চোখের সামনে। নূতন সূর্যের আলোর সর্বপ্রথম সেই চূড়াটিই ঝলমল করে ওঠে।

কি বিচিত্র এই সৃষ্টি! এখানে এখনো আধার। বই-পড়ে-জানা প্রকৃতির এই বিচিত্র রূপ মূর্তিমান বিশ্বের মত চোখের উপর ধরা পড়ল। এই সৃষ্টির যিনি হেতুরূপ, সেই জগন্নাথদেবকে মনে মনে বার বার প্রণাম করে এগিয়ে চললাম।

আমরা চলেছি.....

বাঁবালাগাছের কদর আর কারও কাছে থাকুক না থাকুক উটের কাছে এর গুণের তুলনা নেই। ছোট ছোট পাতারূপ কাঁটার তাল চিবুতে যে কি আনন্দ

তা একমাত্র উটই জানে। তার সঙ্গে চাটুনি হিলাবে মাঝে মাঝে আরও বেশি কাঁটাওয়ালা টক কুলের গাছ। চোখ বুজে বিচিত্র ভঙ্গিমায় ধীরে হুঁহুে সেই চর্বণ একটা দেখবার মত ব্যাপার। ভিত্ত কেটে রক্ত গড়াচ্ছে কব বেয়ে। তা হোক, তবু এতবড় মূখরোচক খাত্ত চিবনো খায়বে না।

আমরাও খামি না। হু' পারের তলায় অল্প কাঁটা ফুটছে, এক পা তুলে অল্প পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে কাঁটাটা টেনে কেলে দিয়ে আবার চলেছি। হু' একটা ভেঙে পারের তলায় থেকেও যাচ্ছে। থাকুক, যখন সে দিনের চলার পাল্লা সাজ হবে তখন ওগুলোর ব্যবস্থা করা যাবে। আপাতত খামার উপায় নেই। দল এগিয়ে যাচ্ছে, অর্থাৎ উট এগিয়ে চলেছে। একবার চোখের আড়াল হলে বুক চাপড়ে কাদলেও আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।

কি করেই বা যাবে। ডাইনে বাঁয়ে সামনে পিছনে ঝোপ-কাঁটাগাছের বংশাবলীর মধ্যে কেউ বাত নেই। পাশাপাশি ঠাসাঠানি সকলে বলে গেছে, শিরুশিরিয়ে মাথা নাড়ছে, ফিস্‌ফিসিয়ে চলেছে কানাকানি পরামর্শ। বোধ হয় হঠাৎ-আগন্তক এই মাহুঘগুলির ভবিষ্যৎ নিয়েই জল্পনাকল্পনা হচ্ছে।

এদের কাউকে দক্ষিণে কাউকে বামে রেখে সসম্মুখে পাশ কাটিয়ে ঘুরে ঘুরে আমরা চলেছি। পথ বলতে কোথাও কিছু নেই। হয়ত বা আছে কোথাও, কিন্তু সে পথ উটের দ্বার পছন্দ নয়। মলমল সকলের খাত্তজব্বা বাড়ছে করে সে সংকিশ্রুতম পথে চলেছে সেখানে, যেখানে মিষ্টিজল মিলবে। আমাদেরও আজকের মত এই দিকদারির হাত থেকে পরিজ্ঞান মিলবে।

কিন্তু এর আর শেষ নেই—শেষ নেই অবিরাম মোড় ঘোরান। দল পা সোজা চলার উপায় নেই। সামনের ঐ ঝোপগুলো পার হলে নিশ্চয়ই পরিষ্কার জমি দেখতে পাওয়া যাবে এই আশায় সেই ভোর রাত থেকে চোখের দৃষ্টি অনবরত বাধা পেতে পেতে মেজাজ পর্যন্ত বিগুড়ে উঠেছে। একটা হাত-হুই উচু টিপি সামনে দেখে তার উপর উঠে লাড় উচু করে দেখবার চেষ্টা করলার আর কতদূর গেলে খোলা মাঠ মিলবে। 'হুতোয় ছাই' বলে নেমে পুনরায়

উটের পশ্চাৎ অহুসরণ। বতনুর দৃষ্টি পৌছিল বোপেনের শুষ্কগোড়ায় সবাই চকুদিকে ঝাপটি মেরে বলে আছে।

এর নাম যদি মরুভূমি হয় তবে আবাল্য যে সব মরুভূমির ছবি দেখলাম অথবা বইয়ে পড়লাম ‘ধূ ধূ করছে দিগন্তবিহীন বালু’—সবই স্মৃতি হয়ে।

পারের তলার অবস্থা বালু, কিন্তু এই গোবেচারা বালুদের দিগন্ত দেখে প্রাণের সাধ যেটানো অনেক দূরের কথা, কতটুকু আকাশই বা দেখতে পার এরা।

ভাগ্যে পার না দেখতে আকাশ। যেখানে তা পার আর ছুদিন পরেই পৌছে গেলাম সেখানে। সেই অগ্নিকুণ্ডের মাঝে পড়ে বার বার স্মরণ হল—ছুদিন আগে ছেড়ে আসা কাঁটাঝোপগুলোকে। বাজার প্রথম ছুদিন যদি সেই কাঁটাগাছের ছায়ায় পারের তলার ধরিজী শীতল না থাকত তবে হয়ত আবার হাব নদী পার হয়ে কগাচী পৌছে সেইখানেই বাজার ইতি করতে হত।

বড়লোকদের বৈঠকখানায় মোসাহেবদের নির্লজ্জ হামবড়াপনার সঙ্গে তুলনা দিতে অনেক সময় বলা হয়—সূর্যের চেয়ে বালুর তাপ বেশি। এই নিরীহ তুলনাটা যে কি মারাত্মক ব্যাপার তার মর্যাদিক পরিচয় পেয়ে বড়লোকের মোসাহেবদের কথা মনের কোণেও উদয় হল না। তার বদলে চোখের সামনে ভেসে উঠল গোয়ালন্দ থেকে চাঁদপুরগামী জাহাজের গর্ভে বয়লারের ভিতরটা। কয়লা দেবার সময় ওটার দরজা বন্ধন খোলে তখন ভিতরের যে অংশটুকু দেখা যায়—রেলিংএ ঝুঁকে দাঁড়িয়ে তা দেখে বাওয়া-আসার পথে অনেক সময় কাটিয়েছি। কালো কয়লার চাঁড়াতুলো ভিতরে পৌছেই বাহিরে পালিয়ে আসবার জন্তে ছটকট করে ওঠে, কিন্তু কোনও উপায় নেই। কয়েক মুহূর্ত পরেই লালে লাল, আর নড়তে হয় না।

সেখানে একটু একটু করে সূর্যদেব এগিয়ে এসে ঠিক বাথার উপর দাঁড়িয়ে পড়েন, আর নড়বার নামটি করেন না।

ধীর ধীরে মা ধরণীর দেহের উত্তাপ বৃদ্ধি হতে থাকে। ক্রমে চারিদিকের অগ্ন্য সঙ্কুচিত হয়ে আসে; যেন ঘন কুয়াসা করেছে। চার হাত দূরেও সব আবছা, আরও দূরে কিছুই দেখা যায় না।

প্রথমে মাথার তালু জ্বালা করতে থাকে, পায়ের তলায় শেষ পর্যন্ত কোনও সাড়ই থাকে না। নিঃশ্বাসের কষ্ট শুরু হয়। হাঁ করা মুখ দিয়ে, শ্বাসপ্রশ্বাস চলতে থাকে, ফলে গলা থেকে গেটের ভিতর পর্যন্ত শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায়।

তখন দিখিদিগ্জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটে কোথাও পালানো ভিন্ন অস্ত্র কিছুই মাথায় আসে না। আর তখন সেই হিংস্র বালুর উপর তাড়াতাড়ি এগুতে গেলেই পায়ের গোছ পর্যন্ত বালুতে বসে গিয়ে ক্রমাগত পিছিয়ে পড়তে হয়। সেই অসহায়তার ভুলনা কোথায়।

তার নাম মরুভূমি। তবে সেই মরুর মাঝে গিয়ে পৌঁছেছিলাম আমরা আর কয়েক দিন পরে।

মাথা নিচু করে একমনে কাঁটা এড়িয়ে কতক্ষণ চলছিলাম খেয়াল ছিল না। হঠাৎ মুখ ভুলে দেখি—

একি! এরা সব গেল কোথায়?

লোকজন, উটেরা, মায় উটের উপর ভৈরবী পর্যন্ত!

ঘাবড়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম। তারপর বালুর উপর মাছের আর উটের পায়ের ছাপ দেখে এগিয়ে চললাম।

পুনরায় আচম্বিতে—সামনে পরিষ্কার, বোপজল সমস্ত সাক।

আধমাইল চওড়া সাদা ধপধপে একখানি রুপার পাত ঐ নীচে দক্ষিণ থেকে এসে বামে চলে গেছে। বামদিকে অতি সন্দর্পণে বৌচকা-বুচকি সহ উটটুকি কোণাকূর্ণি নেমে যাচ্ছে। জলমহম্মদ বড় উটটার বুকের নীচে কাঁধ ঠেকিয়ে পিছনে ঠেলে রেখে ধীরে ধীরে তাকে নামাচ্ছে। যদি মালপত্র-বাঁধা অবস্থায় বালুর উপর উটের পা হড়কার তবে গুরুভার মালের টানে

সোজা একেবারে নদীগর্ভে গিয়ে পৌঁছে বাবে উট এবং আর কখনও উঠে দাঁড়াবে না।

ছোট উটটির গলার নীচে দু'হাত দিয়ে পিছনে ঠেলে রেখে দিলমহম্মদ পিছু হেঁটে নামছে। এবং তখনও সেই উটের উপর খাটিয়ার মধ্যে ভৈরবী সমাসীন।

উপরে দাঁড়িয়ে রুদ্ধ নিঃশ্বাসে সেই নেমে যাওয়া পর্ব দর্শন করলুম। ব্যতকণ না উট নামানো শেষ হল ততক্ষণ খাটিয়ার পায়ার বাঁধা দড়ি ধরে কোনক্রমে বাহনের উপর টিকে থাকবার জন্যে ভৈরবীর সেই প্রাণান্তকর প্রয়াস দেখতে দেখতে আমার পিঠের শিরদাঁড়ার ভিতরটা জমে হিম হয়ে যেতে লাগল।

অকসেবে অবতরণের পালা শেষ হলে আমিও নেমে গেলাম সোজাহুজি তর তর করে ছুটে। একটা হাত-দুই চওড়া জলের রেখা বয়ে যাচ্ছে। জল—ঠাণ্ডা, মিষ্টি ও পরিষ্কার জল।

সহযাত্রীরা জলের ধারে হাঁটু গেড়ে বসে অজলি ভরে সেই জল মাথার মুখে দিচ্ছেন, পানও করছেন। আমি একেবারে সেই জলের ভিতর নেমে দাঁড়ালুম। অল্প কঁটা বিঁধে পায়ের তলা আর কঁটার ঘায়ে ছিঁড়ে হাঁটু পর্বন্ত জালা করছিল।

জুড়াল।

উটের প্রতি পারে দুটি করে হাঁটু। সেইজন্তে বসতে গেলে উট দুইস্থানে পা মুড়ে তবে বসে। প্রথমে সামনের পায়ের নীচের অংশটুকু মুড়ে দেহটা সামনের দিকে কিছুটা নামিয়ে নেয় তারপর পিছনের পায়ের শেষ অংশটা মুড়ে ফেলে। তখন সামনের পায়ের উপরের হাঁটু মুড়ে বুকটা মাটির সঙ্গে ঠেকিয়ে শেষে পিছনের পায়ের উপরের হাঁটু ঠাঁজ করে বসে পড়ে। কাজে কাজেই উটের টপ্ করে বসে পড়া হয়ে ওঠে না।

সেই ভাবে উটকে বসিয়ে ভৈরবীকে নামানো হল। ভূমিষ্ঠ হয়ে তিনি আমাকে জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সেখানেই এগিয়ে এলেন।

জিজ্ঞাসা করলার “কেমন লাগছে উটে চড়া?” অতি প্রশান্ত উত্তর হল,
“কি যে মজা উপরে বসে দোল খেতে! আমার ত ঘুম আসছিল।”

মুখের দিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখলাম, নাঃ, বানিয়ে বলছে না।
কায়মনোবাক্যে মজাই উপভোগ করছে। যাক—কথা বাড়াতে আর প্রবৃত্তি
হল না।

দড়িদড়া খুলে বস্তাগুলো সেখানে কেলে উটদের জলের ধারে নিয়ে আনা
হল। সামনের পাঁচুটি মুড়ে লম্বা গলা বাড়িয়ে জলে মুখ দিয়ে সমানে আধখণ্টা
ধরে তারা জলপান করলে। শেষে উপরের কোণের ধারে নিয়ে গিয়ে তাদের
ছেড়ে দেওয়া হল। দিলমহম্মদ সঙ্গে সঙ্গেই রইল। বিশ্বাস নেই—কাঁটা
চিবুতে চিবুতে কতদূর চলে যাবে কিছুই বলা যায় না।

এখানে তখন কাঁটাগাছের শুকনো ডাল জমা করতে সকলেই ব্যস্ত হয়ে
পড়লেন। রাস্তা চড়বে। রাস্তা কিন্তু চড়লও না নামলও না। ভালপালা
জলে, যে যেমন ভাবে পারলে, আঁটা মেখে চাবড়া চাবড়া বানিয়ে পুড়িয়ে
নিলে। শেষে লম্বার শুঁড়ো ও লবণ সহযোগে তাই চর্বণ। ল্যাঠা চুকে
গেল।

আমাদের দল অদৃষ্টে তখনও অনেক দখানি বাকি ছিল। গুলমহম্মদের
চাউল খাবার ভয়ানক শখ। সেজন্তে বেচারী পরিশ্রমও অন্ন করলে না।
ভালপালা জোটানো, উম্মনের জন্তে পাখর খুঁজে আনা, হাওয়া বালির হাত
থেকে নিস্তার পাবার জন্তে খাটিয়াখানাকে খাড়া করে তাতে কয়ল টাঙিয়ে
আড়াল করা সমস্তই সে করলে। কিন্তু বহু মাথা খোঁড়াখুঁড়িতেও চুলা থেকে
অনর্গল কুণ্ডলী পাকিয়ে ধোঁয়া ছাড়া আগুন বেরল না। লাতের মধ্যে ভৈরবী
চোখের জলে নাকের জলে নাকাল হলেন। তখন শেষ উপায় করাচী থেকে
আনা চীনাবাদামগুলিকে পোড়ানো। তাই করা গেল।

সেই সময় সন্ধ্যা হল একটি মুখচাকা চ্যাপ্টা টিনের কথা। শেঠজীর স্ত্রী
আমা দয় বিদায় দেবার সময় ওটিকে নিয়ে নিয়ে আসেন। ডিঙরে কি যত

আছে তখনও খুঁলে দেখা হয়নি। এখন সেটি খুঁলে তার মধ্যে পাওয়া গেল সমস্তে শুঁড়িয়ে দেওয়া নানারকমের মিঠাই পোড়া লাডু, আরও কত কি। এমন কি কুরিভাজা চানাচুরভাজা আর নানারকমের আচার পর্যন্ত রয়েছে। গুলমহম্মদ তার ছেলে আর আমরা দুজন পোড়া চীনাবাদাম সহযোগে সেইগুলির সম্ভাবহার করে পেট ভরে জল পান করলাম।

এই বাজার প্রথা হচ্ছে—প্রত্যহ প্রত্যেক বাজী একখানি রুটি উটওয়ালাকে এবং আর একখানি রুটি জলওয়ালাকে দেবে। এই পথের যেখানে যেখানে মিষ্টি জলের সন্ধান পেয়ে বালি খুঁড়ে জল বার করে কুপওয়ালার পাহারা দিচ্ছে সেই কুপওয়ালার প্রাপ্য মাত্র এই মত রুটির একখানি প্রত্যেক বাজীর কাছ থেকে। এর অতিরিক্ত সে কিছু প্রত্যাশাও করে না পায়ও না। কিন্তু দেখেছি যে, হয় রুটির ওজন নিয়ে নয় মাথা পিছু প্রত্যেক বাজীর একখানি করে হিসাবে কম পড়ার দরুন প্রতি কুপের দার থেকে বওনা হবার সময় বিড়ম্বনার অন্ত থাকত না। আমরা অনেকেই চেষ্টা করতাম বাতে একখানি পাতলা রুটি বা না-পোড়া রুটি কুপওয়ালাকে দিয়ে তাড়াতাড়ি বওয়ানা হওয়া বার সেখান থেকে।

কিন্তু এই জল, বার আশায় বট। আট দশ মরুভূমি পার হয়ে ছুটে আসছি, বা আমরা নিজ নিজ কুঁজোর ভরে নিয়ে পুনরায় বওয়ানা হব—বখান্ধানে পৌঁছে যদি সেই জল না পাওয়া যেত? কিংবা যদি জলওয়ালার নির্বাক একাকী মরুর মাঝে বাসা বেঁধে জল বন্ধ না করত—তা হলে?

তখন আমরা শুকনো কুঁজো খাড়ে করে কুপের দারে পৌঁছে কুপের পাত্তাও পেতাম না। কারণ প্রতিদিন না খুঁড়লে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই উড়ন্ত বালিতে কুপ বোকাই হয়ে চারিদিকের সঙ্গে সমান হয়ে যেত। চিনে নেবার উপায়ও থাকত না যে কোথায় জল ছিল।

কলে যে তখন কি হতে পারত বা পারত না তা চিন্তা করতেও সাহস হয় না। কিন্তু সে চিন্তা না করে জল পেয়ে আকর্ষণ পান করে কুঁজোর ভরে নিয়ে

সর্বপ্রথম যে কন্দিটি আমরা অনেকই আঁটতাম তা হচ্ছে, কি উপায়ে কন্দিখানি জলগয়ালাকে দিতে ভুলে যাওয়া যায়।

কূপগুলি সেখানকার মরুবাসীদের কাছে কতবড় সম্পদ তা স্বচক্ষে দেখেছি। দেখেছি ক্রোশের পর ক্রোশ ভেঙে দল বেঁধে স্ত্রী-পুরুষ আসছে একপাল ছাগল নিয়ে কূপের ধারে। ছাগল জল বয়ে নিয়ে যাবে। জল যাবেও ছাগলের মধ্যে ভরতি হয়ে। একটা ছাগলের গলা থেকে মাথাটা কেটে ফেলে কি এক অভূত উপায়ে চামড়ার ভিতর থেকে হাড় মাংস সমস্ত বের করে নেওয়া হয়। পায়ের খুর চারটে বাদ দিয়ে পায়ের শেষ প্রান্ত চারটি বেঁধে সেই চামড়ার মধ্যে গলা দিয়ে জল ভরতি করা হয়। তারপর—গলাটি চামড়ার ফিতা দিয়ে বেঁধে ছাগলের গিঠে চাপিয়ে তারা স্বহানে নিয়ে যায় জল। গভীর বালু খুঁড়ে, জলে ভরতি এই চামড়ার ডোলগুলি বালু চাপা দিয়ে রাখা হয়। এই ভাবে মাসের পর মাস জল রক্ষা করা হয়। এতে জল ঠাণ্ডা থাকে, নষ্টও হয় না।

দশ বিশ ক্রোশের মধ্যে একটি মাত্র মিষ্টি জলের কূয়া, হুতরাং প্রত্যাহ 'জলকে চল' ব্যাপারটা সেখানে কোনও ক্রমেই সম্ভব নয় বলেই এই ব্যবস্থা।

এই ব্যবস্থার অস্ত্র একটা দিকও আছে। জল নিতে এসে উত্তরদিকের লোক দক্ষিণের লোকের সঙ্গে সংঘাত এই জলগয়ালার কানেই বেধে যায়। এখানেই বহু রকমের বহু দেনাপাওনার হিসাব মেটানো হয়, এমন কি মন দেওয়া-নেওয়ার শাকীও এই জলগয়লা। অনেকের অনেক ঝামেলা তাকে পোহাতে হয়। বহু সমস্তার হরেক রকমের মীমাংসা তাকেই করে দিতে হয়। সে দেশের লোকের কাছে এই জলগয়ালার মর্যাদা সামান্য নয়।

তা হলে কি হবে, আমাদের কাছে সে মাত্র একখানি কন্দির প্রত্যাহ—হুতরাং ডিন্ধুক ছাড়া আর কি?

কিন্তু এখন দিনে নদীর জলেই এখন আমাদের সমস্ত প্রয়োজন

মিটে গেল তখন কুপওয়ালার কটির কথা আর উঠল না। তার বদলে উটওয়ালার কটির যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করার জন্তে আমাদের প্রথম অধিবেশন আরম্ভ হল।

বহুত বহুত সেলাম আনিয়ে গুলমহম্মদ অতি বিনীত ভাবে প্রস্তাব পেশ করলে যে উটওয়ালার প্রাপ্য একখানি কটির বিনিময়ে তাকে জনা-প্রতি আধা পোয়া হিসাবে আটা দেওয়া হোক। তাদের জন্তে কটি বানাবার কষ্ট থেকে সে এই পুণ্যাত্মা যাজীদের রেহাই দিতে চায়।

অতি নিরীহ জাতের প্রস্তাব। সকলেই প্রায় একবাক্যে সমর্থন করে কেললেন।

শ্রীকৃপলাল পণ্ডিত হচ্ছেন আমাদের জ্যেষ্ঠ ছড়িওয়াল।—অর্থাৎ আমাদের অভিভাবক। তাঁর মতামতের মূল্য আছে। তিনি তখন চুল আঁচড়াচ্ছিলেন। এই বিশেষ কর্মটি তিনি যখন তখন বহবার সমাধা করতেন আর সেইজন্তে তাঁর লাল ডোরাকাটা শার্টের বুকপকেটে একখানি চিকনি সদসর্বদাই গলা বাড়িয়ে বিরাজমান। চিকনিখানি থেকে সবসঙ্গে ছেঁড়া চুল ছাড়াতে ছাড়াতে তিনি তাঁর মূল্যবান অভিমত প্রকাশ করলেন।

তাঁর মতে আটা যদি দিতেই হয় তবে এখনই হিসাব করে সম্পূর্ণ প্রাপ্য আটাটা ওদের দিয়ে দেওয়াই ভাল। বহবার দেখা গেছে যে, ভোজ্য বা সন্দেশে তখন দ্বারা শেষ পর্যন্ত যাজীদেরই ক্ষুধাবৃত্তি হয় না, সেই জন্তেই বলা হয় যে হিংলাজের পথে আছে ক্ষুধা ও ঝগড়া। এই ঝগড়া বাতে এড়ানো যায়—সেই জন্তেই তাঁর এই সংশোধনী প্রস্তাব।

শুনলে মনে হবে যে এই প্রস্তাবটি আরও নিরীহ জাতের। আটাটা যখন দিতেই হবে তখন দিয়ে দিলেই হাজারার শেষ হয়। তা হয়ত হত। কিন্তু হিসাব করে দেখা গেল যে জিনজর লোকের মাথা পিছু আধ পোয়া করে আটা দিতে গেলে দৈনিক দিতে হয় পোনে চার সের। বজ্রিশ দিনে এই যাজা সমাপ্ত হবে এই আশায় জনা-প্রতি বজ্রিশ সের হিসাবে আটা নিয়ে যাওয়া

হচ্ছে। বজ্রিশ দিনের ভ্রমণে বজ্রিশবার এই পৌনে চার সেরকে বোণ দিলে হয় তিন মণ। অর্থাৎ এখনই দু বস্তা আটার মাঝা ত্যাগ করতে হয়।

হিসাবটা যখন শেষ হল তখন সভা হল নিস্তর। তবে খাতক কেউ উপস্থিত না থাকায় সাঁড়ানি বন্ধ করে দেহ হেঁড়াছিঁড়িটা আর হল না।

তখন একটি পার্শ্বা প্রস্তাব আমি পেশ করে বললাম। মণ দেড়েক চাল আমাদের উঠের গিটে বাচ্ছে। অক্লেশে আমরা আটার মাঝা ত্যাগ করতে পারি। আটাই হোক আর চালই হোক, রাখা না করে গলাফাকরণ করা সম্ভব হবে না। আজকের রাখার ব্যবস্থা দেখে ও-সময়ে যেখি আশা না করাই শ্রেয়। অতএব সকলের চুক্তিভা দূর করার ভ্রমে আমাদের আটার বস্তাটা শেখ সাহেবদের অগ্রিম সঁপে দিতে চাইলাম।

চুক্তিভা কিছু কালো বোরখা ঢাকা দিয়ে আমাদের পিছু নিলে শ্রিয়ান পণ্ডিতজীর শেষ কথাটিতে। শেষ পর্যন্ত খাতক সকলের ভাগ্যে ঢালাও ভুলে যাবে এই ভরসা দান করে তিনি নির্বিকার ভাবে বললেন যে, পথে ছুঁচায়জন ত কয়েকই, স্ত্রত্যং ভাবনা কি ?

করবে অর্থাৎ আমরা সকলে সশরীরে হিংলাজ পর্যন্ত পৌঁছব না এবং এক কারণটি যে কি তা আন্দাজ করে নিয়ে আমরা প্রত্যেকে অস্ত্র মুখগুলির উপর একবার চোখ বুলিয়ে নিলাম।

হায়, কে বলে দেবে সেই ছুঁচায়জন আমাদের যথো কে কে !

সভার কার্য শেষ হবার পূর্বেই দিলমহম্মদ উটসহ প্রত্যাবর্তন করলে। আর তৎক্ষণাৎ বলা নেই কওয়া নেই, পিতাপুত্র মালপত্র উঠের গিটে তুলে রাখতে শুরু করে দিলে।

শেষে যখন বুঝলাম যে সেখান থেকে পুনরায় উঠতে হচ্ছে তখন পশ্চিমের আকাশটার কে যেন আগুন ধরিয়ে দিয়ে লাল লাল করে তুলছে। ছেকে আসা নদীর পূর্ব তীর ইতিমধ্যেই বহু আধারে বহুস্তম্ব হয়ে উঠেছে।

সায়নের পশ্চিম তীরে গারে গারে ঠালাঠালি করে বসে কাঁদা যেন

আমাদের হাতছানি দিবে ডাকছে। সেই দিকে চেয়ে আগল সন্ধ্যার গারে কাঁটা দিয়ে উঠল।

কিন্তু উপায় কি ?

খাটিয়ার আড়ালে চাদর চাপা দিয়ে তৈরবী খুঁবিরে ছিলেন। উটের শিঠে খাটিয়া বাঁধা হলে বালিহুঁচ চাদরটা তাঁর উপর থেকে সাবধানে তুলে নিলার। ইতিমধ্যেই হাওয়ার উড়ে একরাশ বালি তাঁর চাদরের উপর জমেছিল। নিজাতক হলে অতি কষ্টে কহুয়ের উপর ভর দিয়ে ধীরে ধীরে কোমর সোজা করে উঠে বসলেন তিনি। উটের শিঠে মজার দোল খাবার ফল হাড়ে হাড়ে মিলেছে। সর্বাঙ্গ টাটিয়ে টন্টন্ করছে।

বললার—“আবার চড়ে বস।”

ভয়কণ্ঠে তিনি বিজ্ঞাসা করলেন—“আজ আবার কেন ?” বাহল্য বোধে এই ‘কেন’র আর উত্তর দিলার না।

বহুকরা ঘোমটা টেনে মুখ ঢাকা দিলেন। এই নদীটি তাঁর সীমন্তের নীতি। ঘোমটার মধ্যেও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

উট ছুটিকে ঘিরে আমরা বাহুব কজন নিঃশব্দে অগ্রসর হলাম অজানা ঠিকানার উদ্দেশে, জল যেদিক থেকে আসছে সেইদিকে।

সেদিন সন্ধ্যার পরে চন্দ্রদেব বোধ হয় কোথাও কোনও গোপনীয় কর্মে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। অনেক রাতে অর্ধেকেরও বেশি মুখ ঢেকে শরমে অঙ্কিত চরণ ছুখানি টানতে টানতে নদীর পূর্বতীরের খুটখুটে আখারের ভিতর থেকে বখন তিনি দেখা দিলেন তখন হঠাৎ নদীপর্বে আমাদের মধ্যে তাঁর বিশ্বের সীমা রইল না। এ হেন অবস্থার রাজিশেবে তাঁর চুপিচুপি বাড়ি কেয়ার সাক্ষী থাকবার ভক্তে সেই অস্থানে অতগুলি জীব জেগে রয়েছে, এ নিশ্চয়ই তাঁর কল্পনারও ছিল না—বহা অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন।

আমাদের তবু একজন নদীবৃদ্ধি হল, একজন নর—ছ’জন। তোরের

ভারাটাও একদৃষ্টে আমাদের কাণ্ডকারখানা দেখছিল। তখন আমরা আমাদের নিজ নিজ কুঁজো উটের পিঠ থেকে নামিয়ে নিয়ে নদীর জল ভরে নিচ্ছি। জল-ভরতি কুঁজোগুলি এবার প্রত্যেকের কাঁধে কাঁধে চলবে। আমার কুঁজোটি অবশ্য ভৈরবীর কুঁজোর সঙ্গে উটের পিঠে খাটিয়ার মধ্যেই স্থান পেল। চাঁদের সঙ্গে সঙ্গে আমরা নদীর পশ্চিমতীরে উঠলাম।

বহুলপুত্রের নদীর তীরে সহযাত্রীগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত নবকুমার বধন আগুন দেখতে পেয়েছিলেন তখন,—ওখানে নিশ্চয়ই মাহুব আছে নরত আগুন জালালো কে,—এই চিন্তা করে আগ্রহের আশায় তাড়াতাড়ি সেই আগুনের কাছে গিয়ে কাপালিকের খপ্পরে পড়েন। আর সেই রাত্রি শেষ গ্রহরে তীরে উঠেই অদূরে আগুন দেখতে পেয়ে সহযাত্রীগণপরিবৃত্ত আমরা সকলেই একেবারে পঙ্ক হয়ে পড়লাম। কার মনে কি উদয় হয়েছিল তা বলতে পারি না তবে কাপালিকের কথাটা আমার স্মরণ হয় নি। হলে হয়ত বনদেবী কপালকুণ্ডলার চান্দ্র্য পরিচয় লাভের আশায় কি করে বলতার তার ঠিক নেই। হলপ করে বলতে পারি বহ্নি-গ্রহাবলীর মলাটখানির ছবিও মনের কোণে ভেসে ওঠে নি। চরম অসহায়তার নিবিড় অহুভূতি কোনও কিছু চিন্তা বা বিচার করবার পূর্বেই পা দুটিকে একেবারে পাবাণে পরিণত করল, অলস আগুনটা যেন নিষ্ঠুর নিরতি, রক্তচক্ষু নিয়ে ঐ আধাবের বুকে নাচছে।

হাঁশ ফিরে পেলার একটা বিচিত্র শব্দ-তরঙ্গে—বুড়ো গুলমহম্মদ তার জুহাতের চেটে দিবে চোঙা বানিয়ে তাতে মুখ লাগিয়ে একটানা আগুয়াজ করলেন “উ উ উ হো”। সেই আগুয়াজ তিনবার করবার পর উত্তর ভেসে এল সেই আগুনের দিক থেকে “উ উ উ হো।”

উত্তর পেয়ে পিতা পুত্রকে আগুন ডায়ায় কি বানিক পজ্, পজ্, করে বললে। তারপর উটের নাকের দড়িতে টান পড়ল, আমরা আগুনের দিকে এগিয়ে চললাম।

একটা ইকি ছয়েক লম্বা কাঠিকে বুহুরীদের হাতের তুলো ধুব্বার, সুতরের

মত বানিয়ে সেই কাঠিটা উর্টের নাকে ছেঁদা করে পরিয়ে দেওয়া হয়। নাকের দুই গর্ত থেকে কাঠিটার দুই প্রান্ত বেরিয়ে থাকে। সেই দুই প্রান্তে বাঁধা হয় একগাছি রেশমের বা লোমের তৈরী সফ দড়ি। অপেক্ষাকৃত মোটা দড়ি একগাছি সেই সফ দড়িটার সঙ্গে বেঁধে তার শেষ প্রান্ত উর্টওয়ালার হাতে থাকে। এই হচ্ছে উর্টের লাগাম, নাকে টান পড়লেই উর্ট জল। এতবড় একটা প্রাণীকে সেই দড়ি টেনে যে ধারে ইচ্ছা চালানো হয়। বাকের বলে প্রকৃত নাকে দড়ি দিয়ে বোরানো। কিন্তু এ পর্যন্ত আমাদের নাকেই অদৃষ্ট দড়ি বেঁধে উর্ট বোরানো ছিল। এইবার তাকে তার অনিচ্ছার বেতে হল নাকের দড়ির টানে টানে উর্টওয়ালার পিছু পিছু সেই আগুনের দিকে।

কড়া-বাথখাল-জটাজুটধারী কেউ তপস্বী করছেন এ দৃষ্ট আমাদের ভাগ্যে জুটল না। তার বদলে আমরা পেলাম আপাদমস্তক কাবুলীর লাজ-পোশাকপরা জনা-তিনেক করাচী-বাত্রী। হাড়গোড়, মড়ার মাথা, খাঁড়া—এ সমস্ত কিছুই নয়, আগুন জ্বলে তাঁরা গরম জল চাপিয়েছেন চা বানাবার জন্তে। সাদরে তাঁরা আমাদের চা পানের আহ্বান জানানেন।

শ্রবণ হল যে আমাদের সঙ্গেও চা চিনি দুধ সবই আছে। কিন্তু তখন লে নমস্ত পাবার উপায় নেই। উর্টের পিঠ থেকে খাটরা খোলা হলে মালপত্র নামলে তখন তার নাগাল পাওয়া বাবে। উর্ট এখানে থামবে না, অগত্যা তাঁদের আশ্রয়ন স্বীকার করা গেল। কাণীওয়ারী ভাইরা এ সবেল তোয়াকা রাখেন না। সপুত্র গুলমহম্মদ ও সন্তান রুপলালকে নিয়ে আমি চা পান করতে বসলাম। আহা, কি তার স্বাদ, আর কি অপকৃপ তার গন্ধ, বাকের ভাল কথাই বলা হয় যেতার। অন্নপ্রাণনের অন্ন উঠে আসবার যোগাড়! বৃহৎ পক্কভিত্তিকথায় গরম গরম ভেলী শুড়ের প্রক্ষেপসহ পান। মুখে অবশ্য বসলাম 'ইয়াঃ' এবং 'তোক'। শেষে বহুত গাফা-লড়ালডি ও মাথা-নাড়া-নাড়ির পর আমরা আমাদের পথ ধরলাম, তাঁরাও নদীতে নামবার জন্তে তৈরী হলেন।

পরদিন প্রথম চোখ মেলে যা দেখলার তা হচ্ছে বাহি। ছোটখাট গৃহস্থ বাহি নয়, আসল কাবুলী বাহি—এক একটি চীনাবাদামের মত বড়। হাজারে হাজারে তাঁরা কোথা থেকে এসে হেঁকে ধয়েছেন, তাঁদেরই সমবেত কঠোর ঐকতানে নিদ্রাভঙ্গ হল।

শেষরাত্রে পৌছে দালানটার এককোণে কবল বিছিয়ে চাদর চাপা দিয়ে শুয়ে পড়ি। শুখন শরীর মনের বা অবস্থা তাতে সাপ বিছা বা কিসের উপর কবল পাতছি, তা দেখার খেঁচ ছিল না। কিছুমাত্র চিন্তা না করে শয়ন এবং সঙ্গে সঙ্গে সকল দুঃখের অবসান—এই হচ্ছে গভীররাত্রে শেষ কর্ম।

জাগে উঠে দেখি সকলেই পেটের ব্যবস্থা করতে ব্যস্ত। সেদিন থেকে আমাদের দলে রূপলাল পণ্ডিতের ছোটভাই সুখলাল যোগদান করার তৈরবীর আর কোনও অসুবিধা নেই। তার মহা উৎসাহে সর্বকর্মে সাহায্যদান—সারার দুঃখ দূর করেছে। তাত রাঁধবার পাত্রটা মাত্র দুজনের উপযুক্ত আনা হয়েছে, তাতেই পাঁচজনের ব্যবস্থা হুঁবারে হচ্ছে। তারপর ভালও হবে। শেষে হবে রুটি—রাতে পথের সহল।

দালানটার দক্ষিণে কুরা, জল মুখে দেবার উপায় নেই, এতই বিবাদ। জান করা গেল। পানের জল ত নদী থেকেই বয়ে আনা হয়েছে। কিন্তু খুব সাবধান, বার বার রূপলাল আর গুলমহম্মদ সকলকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে যে, কুঁজোর জলে সারারাত আর পরদিন দুপুর পর্যন্ত চলা চাই। শোনবেশী না পৌছলে কোনও উপায় নেই আর জল পাবার।

সে রাজ্যের রাজধানীর নাম শোনবেশী, করাচী থেকে তিনদিনের পথ। পথে এই দালানটাই একমাত্র আশ্রয়স্থান, সে দেশের সরকারের নিজস্ব ব্যবস্থা। সেখান থেকে বেরিয়ে সারারাত হেঁটে পরদিন কোনও এক সময় আমরা শোনবেশী পৌছব, অবশ্য ইতিমধ্যে যদি আর কোনও বিভ্রাট না ঘটে বলে।

জানেন পর পুরো এক পেলাল চা পান করে চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে

পড়লার : হতে থাকুক রাগা ততক্ষণ। বসে থাকবার কি উপায় আছে ?
কঁকে কঁকে বাছি এসে মূখের উপর আছড়ে পড়ছে।

ডাকাতাকির ফলে আবার বধন উঠে বসলাম, তখন সমস্ত প্রস্তুত। ভাত
ডাল, ডালের মধ্যে আলু সিদ্ধ, সঙ্গে খণ্ড খণ্ড কাঁচা পেঁয়াজ। পেঁয়াজ খেতেই
হবে, নয়ত জল তেঁট। কিছুতেই কমবে না। কাঁচা পেঁয়াজ কামড়ে খাওয়া এর
পূর্বে আর কপালে ঘটে ওঠে নি। স্থানবাহিন্যে সত্যিই খারাপ লাগল না।
যরং ঐ পেঁয়াজের দৌলতেই খাদ্য উদরস্থ হল বলা চলে।

লম্বা ধূরে মেজে বাঁধা ছাঁদা করে আবার শয়ন। দু'তিন ঘণ্টা পরে রোদ
কমলে বধন বালি ঠাণ্ডা হবে তখন বেরনো বাবে শুনে বে বার চানরের তলার
চুকল।

যুগ আর হল না। খাওয়ার আগে পর্বত দু'বারে বা হয়েছে তা একেবারে
মন্দ নয়। চানর মুড়ি দিয়ে ভেগে শুয়ে থাকার আর এক অবস্থা। মাছিয়া
মনে করেছে যে আমরা বেঁচে নেই, বরা ভেবে চানরের উপর ছেঁয়ে কেলেছে।
চানর কেলে বাইরে এসে দাঁড়ালাম।

বাইরে গুলমহম্মদ মালপত্রের বস্তাগুলোর উপর ঘুমিয়ে পড়েছে। দালানটার
পূর্বদিকে হাত দুইক ছায়া পড়েছে, সেইখানেই জিনিসপত্রগুলো শুপাকার
পড়ে আছে। বতদূর দৃষ্টি বার জলন্ত রোদ কঁক কঁক করছে। জনপ্রাণী-
হীন বহু বহুর বুকে একটা কাকপক্ষীরও ডাক শোনা যায় না। না জানি
কোথার কোন্‌দিকে উট দুটিকে নিয়ে দিলমহম্মদ চরাচ্ছে। বিখাতা উট
পূজন করে তার আহাবের ব্যবস্থা এই বালুর বুকে করতে ভোলেন নি।
পেট ভরে খেয়ে কিরে এসে তারা লম্বা গলা বোকাই করে জল নিয়ে নেবে।
তারপর নিশ্চিন্তে সারারাত পাড়ি দেবে বতক্ষণ না আবার জলের কাছে পৌঁছনো
যায়। যবে পড়ল, দিল্লী হেল হাণ্ডা ছেড়ে বস্টাখানেক দৌড়ে বর্ধমান
পৌঁছেই এক পেট জল খায়, নয়ত আর নড়তে পারে না, সারারাত কতবার
জল খায় কে জানে। উট সারারাত জলের পরোয়া না করে সামনে এগিয়ে

চলে, পিঠে বিশ মণ বোঝা। সৃষ্টিকর্তার কারখানার তাঁর নিজের হাতে গড়া ইঞ্জিন, একেবারে নিখুঁত, কিছু বলবার উপায় নেই।

নির্বাসনদণ্ড যে কতবড় স্বকঠোর শাস্তি, মর্মে মর্মে তা অহুভব করলাম আমাদের আশ্রয়স্থল তিনদিক-বহু একদিক-খোলা দালানটার দিকে চেয়ে। নারা ছুনিয়ার তাবৎ শহরপল্লীর ছোট বড় বড় ঘরবাড়ি আছে, সকলে মিলে একলা না জানি কোন্ মহা অপরাধের দরুন এই দালানটাকে নির্বাসন দেয়, সেই থেকে বেচারী দিগন্তবিস্তৃত বাসুরাশির মধ্যে একলা ঠার দাঁড়িয়ে আছে। ওর মুখ পুড়ে কালো হয়ে গেছে, কারণ যে-কেউ কিছুক্ষণের জন্তেও আশ্রয় নেয় সে-ই পেটের দারে এর মধ্যে আগুন জ্বালায়। কলে পশ্চিমের পাঁচটা খোলা খিলান দিয়ে ধোঁয়া বেরিয়ে কালো দাগ পড়ে গেছে। এত বালি চারিদিকে তবু এর সঙ্গে কোথাও ছিটে-ফোঁটাও চুনবালির স্পর্শ নেই। এই মুখ-পোড়া হাড়-বার-করা বৃদ্ধ একলা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হুঁকছে কত যুগযুগান্ত কে জানে!

নিযুক্তি রাতে সমুদ্র-কিনারায় একলা বহুক্ষণ চুপচাপ বলে থাকলে ঢেউ-গুলোর আছড়ে পড়া দেখতে দেখতে মনে হয়, হাতের কাছে যদি এমন কোনও একটা উপায় থাকত যার দ্বারা কোনও ক্রমে সমুদ্রটাকে কিছুক্ষণের জন্তে ঠাণ্ডা করে রাখা যেত তবে স্বস্তি পাওয়া যেত। একটার পর একটা ঢেউ অনবরত ঝপাং ঝপাং করে আছড়ে এসে পড়ছে ত পড়ছেই, কিছুতেই বিরাম নেই বিজ্ঞার নেই। দেখতে দেখতে শরীরের মধ্যে একটা তোলপাড় শুরু হয়। একবার যদি কিছু সময়ের জন্তেও চুপ করে তবেই শাস্তি।

কিন্তু তা কখনোই হবার নয়। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডটা তালগোল পাকিয়ে বানিয়ে ব্রহ্মা তাঁর দুহাতের কতই পর্বত মাথা কাদামাটি পরিষ্কার করবার জন্তে জলের মধ্যে দু'হাত ডুবিয়ে বেশ করে ধুয়ে ফেলেন। সেই যে জলে দোলা লাগল আজ পর্বত তা আর থামল না। তার আগে নিশ্চয়ই সমুদ্র শান্ত আচরণ ছিল।

কিন্তু এখানে ধরতির এই অংশটুকু একেবারে বিপরীত। কখনও কোনও কারণে এ নড়ে ওঠে না। সমুদ্রের মত বালুরাশিও ঢেউয়ের পর ঢেউ তুলে চলে গিয়েছে, গিরে আকাশের সঙ্গে মিশেছে। দেখলে মনে হয় একদা এরও প্রাণ ছিল, সমুদ্রের মত তখন এও অশান্ত ছিল। হঠাৎ কোনও এক বাতাসে স্তব্ধ হয়ে গেছে। আজ আর এতে প্রাণের চিহ্নমাত্র নেই। সমুদ্রের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে নিখিল বিশ্বের বিরাট প্রাণের স্পন্দন স্পষ্ট অনুভব করা যায়। আর সেদিন হুগুরে সেই নিখোঁপ স্তব্ধতার মধ্যে দাঁড়িয়ে জগৎজোড়া মৃত্যুর সীতলতার মাঝে ধীরে ধীরে তলিয়ে যেতে লাগলাম। জীবন ও মৃত্যু এই দুটির কোনটি যে বেশি শক্তিশালী তাই চিন্তা করতে লাগলাম।

কতকণ একভাবে তাকিয়ে ছিলাম খেরাল ছিল না। হঠাৎ মনে হল বহুদূরে আমার দৃষ্টির শেষ সীমায় কি যেন নড়ে উঠল। পশ্চিমদিক থেকে হাওয়া আর বালু পূবদিকে বয়ে বাজছিল, তার উপর চোখ ধাঁধানো বোঝ। ফুল দেখছি মনে করে হুঁচোখ বন্ধ করে রইলাম। কিছুকণ পরে আবার বখন চেয়ে দেখলাম তখন আরও কাছে স্পষ্ট দেখা গেল কি যেন এখানেই এগিরে আসছে। একটা বালুর ঢেউয়ের উপর উঠে আবার বখন সামনের ঢেউটার শিঁহনে নামছে তখন আর দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু আবার বখন আর একটা ঢেউয়ের মাথায় উঠে আসছে তখন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। হুঁহাত দ্বিগুণে চোখ বগড়ে নিয়ে এবার ভাল করে চেয়ে দেখি—না কিছুতেই ফুল দেখছি না—নিশ্চয়ই কিছু এগিরে আসছে এদিকে। চেয়ে রইলাম মোহাবিষ্ট হয়ে।

ক্রমে সেই কালো বিন্দুটা বড় হয়ে একটা রূপ গ্রহণ করতে লাগল। মনে হল যেন একটা স্তব্ধতার কিছু টেনে আনছে কোনও প্রাণী। আনতে তারও প্রাণান্ত হচ্ছে। রুদ্ধনিঃশ্বাসে প্রতীক্ষা করছি।

ঐ আবার একটা বালুর টিলার মাথায় উঠেছে। এবার সন্দেহ হল—মৃত্যুর নর ত ? আবার নেমে অদৃশ্য হল। শেষে বখন আবার দেখতে পেলাম তখন

আর ভুল হল না—মারুবই। কি একটা কাঁধে করে আনতে আনতে হুড়ি খেয়ে পড়ল।

তাড়াতাড়ি গুলমহম্মদকে খাড়া দিয়ে আগালাম। উঠে বসে ছুতোখ কচলে বুড়ো কণিকের ওস্তে সেই দিকে তাকিয়ে রইল। মরুবাসীর অভ্যস্ত চক্ষুকে ফাঁকি দেবার উপায় কি। পরমুহূর্তে লাম্বিয়ে উঠে একটা চীৎকার করে সেই-দিকে দৌড় দিলে। কোনও কিছু চিন্তা করবার পূর্বেই আমিও তার পিছু পিছু ছুটলাম।

সেই তপ্ত বালুর মধ্যে বার দুই তিন আছাড় খেয়ে বখন সেখানে পৌঁছলাম তখন আর বাক্যব্যয়ের অবকাশ ছিল না। চোখের নিম্নে গুলমহম্মদ একটা দেহ কাঁধে তুলে নিল, আর একটাকে তুলে আমিও কাঁধে ফেললাম, তারপর সেই স্পন্দনহীন দেহ নিয়ে বতদূর শক্তিতে কুলোল,—দৌড়।

দৌড়োবার উপায় কি। তার কাঁধে বালুর মধ্যে পা বসে যেতে লাগল। সামনে যেতে যেতে গুলমহম্মদ হুঁশিয়ার করে দিলে, পা বেন না হড়কার। এখনও হরত এদের প্রাণ আছে, আছাড় খেলে জীবনের আর আশা থাকবে না।

পথ আর শেষ হয় না, দালানটাও পিছিয়ে যাচ্ছে। শেষে বখন দালানটার কাছে পৌঁছলাম তখন সকলে ভেগে উঠেছে। বাবার আগে গুলমহম্মদের চীৎকারে সকলের ঘুম ভেঙে যায়। কিন্তু আমাদের কেউ দেখতে পার নি। কারণ দালানটার পিছনে পূর্বদিকে আমরা দৌড়েছিলাম।

সকলেই ঘিরে দাঁড়াল। কাঁধের বোঝা নামাতে দেখা গেল গুলমহম্মদ যাকে এনেছে সে পুরুষ এবং আমার কাঁধে এসেছে একটি নারী।

আমার দম তখন শেষ হয়ে গেছে। তার নামিয়ে তার পাশেই বসে পড়লাম।

ভৈরবী একটা কুঁজো নিয়ে ছুটে এলেন। আমি আমার পাশের দেহটাকে দেখিয়ে দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে তিনি বসে পড়ে সেই মহামূল্য নীতল জল, বা কাল পর্বত অতি সাবধানে খরচ করা একান্ত প্রয়োজন, তার সবটুকু অকণপন হস্তে

তার মাথার মুখে ঢালতে লাগলেন। বাজার পূর্বে হাব নদীর কিনারায় কাকেও এক কোঁটা কুঁজোর জল না দেবার সেই প্রতিজ্ঞাটার এইভাবে চরম গতি লাভ হল।

মুখে মাথায় জল ঢেলে কি লাভ হবে? আগে দেখা দরকার এখনও খালটুকু বইছে কি না। ভৈরবী তার বুকের উপর মাথা রেখে কান দিয়ে শোনবার চেষ্টা করতে লাগলেন হুৎপিণ্ডের আওয়াজ। আমি তার একটা হাত তুলে নিয়ে নাড়ী চলছে কি না দেখবার চেষ্টা করলাম। প্রথমে একে-বারেই কিছু বোঝা গেল না, তারপর মনে হল যেন কীণ, অতি কীণ একটা গতি তখনও চলছে।

মেয়েটির বরস তেইশ চব্বিশের বেশি হবে না। বোনে পোড়া কর্ণা রঙ, হাকা ছিপছিপে গড়ন। একটু লম্বা হাঁদের মুখ, চেপ্টা বা ভোঁতা নয়। চোখ দুটি সে বুজে আছে। মাত্র দু আঙুল চওড়া কপালে অ দুটি পরস্পর ছুঁয়ে আছে। কোঁকড়ানো কালো ঘন চুলে বহুদিন বোধহয় চিরনি হোঁয়ানো হয় নি। টিকোলো নাকের বামদিকে একটা সত্তা লাল রঙের পাখর বা কাঁচ বসানো নাকছাবি। পাতলা 'ঠোটুখানি একটু কাক হয়ে রয়েছে। দুই কব বেয়ে গাঁজলা ভেঙেছে, তার স্পষ্ট দাগ দেখা যাচ্ছে। ভৈরবী ঠোটের মধ্যে আঙুল দিয়ে বললেন, "দাঁতে দাঁত লেগে আছে বোধ হয়—অনেকক্ষণ অজান হয়ে পড়েছে।"

ওখানে তখন পোপটভাই, রূপলাল—ওরা সবাই মিলে সেই লোকটাকে নিয়ে স্তম্ভ। তার দেহটা খাড়া করে বসিয়ে মাথার মুখে জলের ঝাপটা দিচ্ছে, তারও জীবনের লক্ষণ নেই। ক্রমাগত "হা আচ্ছা হা আচ্ছা" বলছে স্তম্ভমহম্মদ আর এখার ওখার ছুটোছুটি করছে।

আমি উঠে দাঁড়ালাম। দালানটার এখানে হাওয়া একেবারে নেই। বললাম, "চল এদের সারনের দিকে নিয়ে, বাতাস পাওয়া বাবে।"

পুরুষটিকে ওরা ধরাধরি করে বয়ে নিয়ে গেল। ভৈরবী আর আমি

মেয়েটাকে তুলতে গেলাম। তার পায়ের দিকে খরতে গিয়ে ভৈরবী চমকে উঠে ইসারা করে আমাকে দেখালেন। শুভ্র নিটোল ছুটি পা হাঁটু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে, পায়ের পাতার উপরে রূপোর চওড়া একটা অলঙ্কার, আর হাঁটুর উপর দিবে ঘাঘরার নিচে থেকে দুই পা বেয়ে রক্তের রেখা পায়ের পাতা পর্যন্ত নেমে শুকিয়ে কালো হয়ে গেছে। সেই দিকে চেয়ে শিউরে উঠলাম।

কিরোজা বংএর ঘাঘরা তার পরনে, তাতেও রক্ত লেগে শুকিয়ে শক্ত হয়ে রয়েছে। সব কোমরে ঘাঘরাটা বেখানে কবে বাঁধা তার উপর পেটের চামড়া অনেকটা দেখা যাচ্ছে। গারে একটা কমলা রঙের কাঁচুলী জাতীয় জামা, মাঝ বুকের উপরের মাংসপিণ্ডটিকে ঢেকে রেখেছে। উপরে আধখানা বুক গলা পর্যন্ত খোলা। মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত খুটিয়ে দেখে সন্দেহের অবকাশ বইল না যে হাড় মাংস রক্তে গড়া এই নির্ধৃত বস্তুটির উপর লালনা নখদন্ত নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে একে নিংড়ে মুচড়ে দলে ধেঁতলে এই অবস্থা করে দিয়ে গিয়েছে।

ভৈরবীর মুখের দিকে চেয়ে দেখলাম তিনি নির্বাক নিম্পন্দ। তাঁর কপালের উপরে একটা শির দাঁড়িয়ে উঠেছে। এক হাত বাড়ান নীচে আর এক হাত পায়ের নীচে দিয়ে মেয়েটাকে তুলে নিলাম, ধেমন করে খুমন্ত ছেলেমেয়েকে তোলা হয়। ভৈরবী কুঁজোটাকে নিয়ে পিছন পিছন এলেন।

দালানের সামনে রকের একধারে তাকে নামিয়ে পোপটতাই আর গুলমহম্মদকে ডাকলাম। কাখীগুহাড়ী ভাইদের মধ্যে পোপটলাল প্যাটেল মুকব্বী লোক। পাগড়ির নীচে তাঁর চওড়া কপালে পাঁচ পাঁচটা হুগতীর রেখা এখার থেকে ওখার পর্যন্ত চলে গেছে। অবস্থাটা তাদের বুঝিয়ে দিয়ে আর সকলকে এখানে আসতে বারণ করতে বললাম। সমস্ত শুনে গুলমহম্মদ আবার “হা আল্লা হা আল্লা” বলে কপাল চাপড়াত্তে লাগল।

আঠার উনিশ বছরের ছোকরা রূপলাল হঠাৎ একেবারে চলিশ পার হয়ে পঞ্চাশের কোঠার গিয়ে পৌঁছল। সকলেই বখন কিংকর্তব্যবিমূঢ়, তখন

সে সমস্ত লোকটার নেতৃত্ব গ্রহণ করলে। অভাবনীয় অসহায়তার মধ্যে ছুটো জীবন বাঁচাতে গেলে যখন সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হল উপস্থিতবুদ্ধির, আর হাতের কাছে যা পাওয়া যায় তার দ্বারা বতটা সম্ভব চেষ্টা করার—তখন রূপলাল—আমাদের চেয়ে অধিকেকরও কম বয়সের ছড়িওয়ালী, সকলকে সাহস দিয়ে ক্রম দিয়ে কাজ করাতে লাগল, যেন এরকমের দু'চারটে কাণ্ড এই বয়সেই করার দেখা হয়ে গেছে।

এই ব্যাক্তার আগাগোড়া দেখেছি যে এই ছোকরা সারাদিন হয় চুল আঁচড়াচ্ছে, শিশ দিচ্ছে, মুহুরতকী গীত চালাচ্ছে, নয়ত লম্বা কলকের কষে দম দিচ্ছে; কিন্তু ঠিক প্রয়োজনের মুহূর্তে এর মধ্য থেকে আর একটি মাহুব আত্ম-প্রকাশ করেছে, যে জন্মেছে এই মরুসমুদ্রের কাণ্ডারী হয়ে, বার বাপ ঠাকুর-কান্না একের পর এক এই কর্ম করতে করতে শেষে নিজেরা পার হয়ে চলে গেছে ওপারে।

ততকালে সেই লোকটার একটু একটু জ্ঞান কিরে আসছে। তার গা থেকে ছেঁড়া শার্টটা খুলে কলে দিয়ে তাকে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসিয়ে রূপলাল তখনও মুখে জলের ছিটা দিচ্ছিল। সেখান থেকেই আমাকে বলল গরম চায়ের ব্যবস্থা করতে। এদের গরম চা খাওয়ানো জরুরী প্রয়োজন। তৎক্ষণাৎ ছোটভাই সুখলাল, আরও কয়েকজন জল গরম করতে লেগে গেল।

কুয়ার জল তখনও বোদের জন্তে গরম ছিল। আমাদের সঙ্গে বালতি একটি, অস্ত্র সকলের মোটার গলায় দড়ি বাঁধা; সকলেই নিজ নিজ মোটার জল এনে ভৈরবীর বালতি ভরতি করে দিলে। আমি সেই জল ঢালতে লাগলাম আর ভৈরবী মেয়েটার শরীর থেকে শুকনো রক্ত ঘষে ঘষে তুলে দিলেন।

অনেক চেষ্টার পরিকার করে, কাঁচুলী আর দাবরা ছাড়িয়ে, ভৈরবীর একখানা শাড়ি জড়িয়ে যখন তাকে তুলে এনে কবলের উপর শোয়ানো হল তখন একটা

লম্বা নিখাস কেলে সে পাশ ফিরলে। পোপটলাল ভাই তাঁর নিজের কবলখামা এনে তার পা থেকে গলা পর্যন্ত ঢেকে দিলেন। এ সময় শরীর গরম থাকা একান্ত প্রয়োজন। রূপলাল একটা চামচে দিয়ে গরম চা তার মুখের মধ্যে দেবার চেষ্টা করে দেখলে তখনও দাঁত ছাড়ে নি। পুষ্কটি তখন খানিকটা চা খেয়ে কবল চাপা দিয়ে শুয়েছে। ভৈরবী পুমসার জান করতে গেলেন। আঁহি, মেয়েটির পাশে বসে রইলাম।

বেলা পড়ে আসছে, ঘোদের তাপ অনেক কমেছে। আমাদের বেকবাক সময় হয়েছে নিশ্চয়ই, কিন্তু কেউ একবার সে কথা মনেও করছে না। সকলেই এদের নিয়ে ব্যস্ত। ফাঁক পেয়ে ওখানে বড় কলকের আগুন দিয়ে সকলে গোল হয়ে বসেছে, সেখানে চাপাগলার কি সমস্ত আলাপ আলোচনা হচ্ছে—হরত এদের সম্বন্ধেই। এরা কারা, কোথা থেকে আসছে, কি করে এদের এ দশা হল, এই রকম অনেক প্রশ্ন সকলেরই মনে তোলপাড় করছে। কিন্তু কে উত্তর দেবে যতক্ষণ না এদের জ্ঞান ফিরে আসে।

আঁহি বসে আছি। ডান পাশে মেয়েটি কবল চাপা পড়ে আছে। ক্রমে তার শ্বাসপ্রশ্বাস স্বাভাবিক হয়ে আসছে। বেন সে যুঝোছে। তিজা কৌকড়ানো চুলগুলির কয়েক গোছা মুখের উপর এসে পড়েছে। হঠাৎ মেয়েটি হুঁপিয়ে কঁাদতে আরম্ভ করল। কপালের উপরের চুলগুলি সরিয়ে দিলে তাকে আগাবার চেষ্টা করলাম। কোনও ফল পাওয়া গেল না। তখনও বেহঁশ অবস্থা, সেই অবস্থাতেই সে হুঁহাতে মূঠোর আবার হাতখানা চেপে ধরে আবার চুপ করল। বেন একটা আঁকড়ে ধরবার মত অবলম্বন পেরে নিশ্চিন্ত হল।

ঠিক এমনই হয়। ভাগ্যের নির্মম পরিহাসের ফলে উল্লঙ্ঘ্য ভবিষ্যতের হাঁ-করা মুখ-গহ্বরকে বাঁপ দেওয়া তির বধন আর কোনও উপায়ই থাকে না। তখন আর চেনা-অচেনা, আশ্রয়, আত-বেজাতের প্রশ্নই ওঠে না। কপাহাজ সহায়ভূতি, একবিন্দু সাহায্য—যা কেবল মাহুকের কাছ থেকেই পাওয়া সম্ভব—

তার অস্ত্রে খাঙ্করের কাছেই আশ্রয় আছড়ে গিয়ে পড়ি। খাঙ্কর পেনেই হল, তাঁ সে বড় দুর্বলই হোক না কেন। তাকেই আঁকড়ে ধরা তখন পরম সাধনা।

উঁট দুটিকে নিয়ে দিলমহম্মদ ফিরে এল। সঙ্গে নিয়ে এল একটা ছোট্ট গলার বোলাবার হারমোনিয়াম, একটা কাঁখে বোলাবার বুলি, আর একখানা পাতলা ফুলকাটা জরিব ফিতা বনানো মেয়েদের চাদর বাকের সঙ্গে ওড়না। নদীর ধারে একজায়গার কুড়িয়ে পেয়েছে। বুলিটার মধ্যে পাওয়া গেল— তিনটে হাড়ের তৈরী চৌকো পাশা, দু'হুড়া পায়ে বেঁধে নাচবার ঘুঙুর, আরশি চিকনি, ঠোটে গালে মাখবার একশিশি রঙ, আরও এইরকমের কয়েকটা টুকিটাকি জিনিস। আর একখানা ছাপানো শাড়ি, একটা পায়জামা, নগর এগার টাকা কয়েক আনা পরশা। এখানের অবস্থা দেখে শুনে দিলমহম্মদের সমস্ত শরীরের রক্ত মুখে এসে জমা হল। একেই সে কথা কর কর, দু'হাত মুষ্টিবদ্ধ করে দাঁতে দাঁত চেপে বার দুই উচ্চারণ করলে, “হারামীকে বাচ্চা, শরতানকে বাচ্চালোক!” তার মুখের অবস্থা দেখে আর কিছু ভিজালা করতে সাহস হল না কারও।

সেই রাত সেখানেই থাকা ঠিক হল। এদের এ অবস্থায় ফেলে রেখে বাওয়া যায় না, সঙ্গে নিয়ে বাওয়াও এখন সম্ভব নয়। এক প্রঙ্গ পানীর জলের। জল বা আছে তাতে সাগরগাড়ে অভাব হবে না বটে কিন্তু তারপর? ঠিক হল, তোর রাতে দিলমহম্মদ যখন উঁটেদের নিয়ে নদীর ধারে চরাতে যাবে তখন এক একজন দুটো করে খালি কুঁজো লাঠির দু'মাখার বেঁধে তার সঙ্গে গিয়ে জল শুয়ে আনবে। নদী ত রাজ আড়াই কোশ। হুতরাং পরোয়া নেই, আজ রাতটা আর কাল সন্ধ্যা পর্যন্ত এদের অবস্থা কি সাড়ার দেখে তারপর বা হর ব্যবস্থা করা যাবে।

মেয়েটিকে নিয়ে তৈরবী একধারে আর আমরা সকলে আর একধারে কখন বিছিয়ে শুয়ে পড়লাম। মালপত্র সহ উঁট দুটিকে লাগানের সামনে রেখে দিল-

মহম্মদ ও গুলমহম্মদ সেখানেই আসন বিছান, সলাজাএত রূপলাল রোয়াকের উপর বসে একটা জুংসই মুহক্কৎকী পীত ধরলে।

শহর শোনবেগী হটতে হটতে একেবারে সমুদ্রের কিনারায় গিয়ে আস্তানা গেড়েছে। এমনই অশুভ লগ্নে লাসবেলা রিহাসতের স্বন্দরী রাজধানীর সঙ্গে আমাদের শুভদৃষ্টিটা হল যখন রস নামক পদার্থটি শরীরের মধ্য থেকে বাষ্প হয়ে বেরিয়ে একেবারে উবে গিয়েছে। ফলে মোট দুইরাত দুইদিন ধরে সেখানকার ঘরকন্নার শেষ মুহূর্তটি পর্যন্ত আমাদের চক্ষু কর্ণ নাগিকা জিহ্বা স্বক্-এর একটিরও তৃপ্ত হবার মত কোন কিছুই জুটল না সেখানে।

বেলা বোধ হয় তখন বারোটোর ঘরও ছাড়িয়ে গিয়েছে। উট ছোটোর দুই কব ঘেঁরে কেনা দেখা দিয়েছে। আমাদের কুঁজোর বেটুকু জল অবশিষ্ট আছে তা তেতে এমন অবস্থায় পৌঁছেছে যে চাবের পাতা একমুঠো তার ভেতর কেলে দিলে সাজুভালীর গরম এক কাপ চা তৎক্ষণাত্ হাতে হাতে মেলে। সে সময় আমরা ঠিক হাঁটছিও না, হামাগুড়িও দিচ্ছি না, এই ছ'এর মাঝামাঝি একটা কসরৎ করে মোটের উপর বেহটাকে এগিয়ে নিয়ে চলেছি।

সর্বশেষে একটা বালির স্তূপের উপর উঠে চোখে পড়ল—চোখে পড়ল না বলে বলি আবির্ভূত হল—নীল—নীলে নীল একখানা ঢাকনা—নিরাবরণ কৃত্রী ধূসর ধরণীর সকল লক্ষ্য নিবারণ করে আকাশের গারে যিগে গিয়েছে। দৌড়ে নেমে গিয়ে ঐ নীলের মাঝে কাঁপিয়ে পড়ে নিজেকে লুকিয়ে ফেলবার একটা অদম্য বাসনা তিতরে জোলপাড় করতে লাগল। বামদিকে মুখ কিরিয়ে দেখলাম, দূরে লাগরের জল ছুঁয়ে মুখ খুবড়ে পড়ে আছে শহর শোনবেগী নামতে শুরু করল।

সমাপ্তি সব কিছুই আছে। হুতরাং হাফ মাংস অস্থি লক্ষ্যের শিও

সেহটাকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে চলারও সমাপ্তি হল। চারিদিক গোল করে সিমেন্ট দিয়ে বাঁধানো একটা ইদারার ধারে সেহটাকে আছড়ে ফেললাম। কুরার পিছনেই হাত ত্রিশেক দূরে ধর্মশালা। থাকুক—ত্রিশ হাত তখন তেত্রিশ ক্রোশের থাক। শরীর বখন উঠতে পারবে নিজে থেকে, তখন উঠবে গিয়ে ঐ ধর্মশালার। আমার স্বাধা আর এক ইঞ্চিও এঁকে বয়ে নিয়ে বাঁওয়া সম্ভব নয়। সেখানেই শুয়ে পড়লাম।

আয়গাটার ছায়া ছিল, অনবরত জল পড়ার দরুন শীতলও ছিল। ডান পাশ ফিরে হাতের উপর মাথা রেখে চোখ বুজলাম।

আগের দিন ঠিক এমনি সময় বা ঘটছিল আর তখন আমাদের মনের মধ্যে বা হচ্ছিল, সেই সমস্ত আগাগোড়া স্মরণ হল। সকালের রাগা-ধাওয়ার পাট চুকলে পর দলহুত্বে সবাই একেবারে অস্থির—কতক্ষণে বেরিয়ে পড়া বাবে। অনর্থক অনেক সময় নষ্ট হয়েছে, নষ্ট হয়েছে উড়ে এসে ঘাড়ে পড়া বাজে ঝগাটের দরুন। নরুত কাল ঠিক এমনি সময় এই শোনবেগীতে আমরা পৌঁছে যেতে পারতাম। কমবেশি সকলে সেই আফসোসেই কাল এমন সময় পড়াচ্ছিলাম। কিন্তু বধাকালে শোনবেগী পৌঁছে একটি প্রাণীর মুখেও রা' নেই। শান্তি বা স্বস্তি বোধ করা অনেক দূরের কথা—আমি নামক চিড়িয়াটি শরীর নামক খাঁচাটির মধ্যে টিকে আছে না উড়েই গেছে তাও বোল আনা বালুম হচ্ছে না।

এরই নাম বোধ হয় ব্যাগার খাটা। ব্যাগার, তা সে কুতেরই হোক আর ভবিষ্যতেরই হোক, মোটের উপর ব্যাগার হচ্ছে সব সময়ই বিড়ম্বনা। যে কাজে স্বাধীনতা নেই তাতে আনন্দের লেশমাত্র থাকতে পারে না। কি অপরিণীত উৎসাহ বুকে নিয়ে মহানন্দে কাল সন্ধ্যায় আমরা পথচলা শুরু করি। শেষ রাতের দিকে সেই আনন্দ, উৎসাহ কোথায় কর্পূরের মত উবে গেল বখন আন্তে আন্তে ভিতরে জন্মাতে লাগল একটি নিরীহ বাসনা—এবার খামলে হত। তার পর থেকে আবৃত্ত হল গরজের তানিমে

হাটা। শরীর পায়ছে না, মন মুখ কিরিরে জবাব দিবে বলেছে, কিন্তু চলতেই হবে, সমানে এগিয়ে যাওয়া ভিন্ন উপায়ান্তর নাতি। ঠিকানায় না পৌঁছে থামা মানে চিরকালের মত চলার চরম বিরতি। কাঁধের কুঁজোর মধ্যে আছে জীবন, সেটুকু নিশেষ হবার পূর্বেই বেতাবে হোক পৌঁছতে হবে সেখানে যেখানে কুঁজো পুনবার পূর্ণ করা যাবে। তার পূর্বে মন বা শরীর কেঁদে মাথা খুঁড়ে ম'লেও তাদের আকার রক্ষা করা সম্ভব নয়।

সকালে সূর্যদেব যথারীতি উদয় হলেন। কিন্তু মার্তও ভৈরবকে আমন্ত্রণ কেউ হাত জোড় করে আগত জানালায় না। প্রণাম করার বদলে লভরে সিঁহন দিয়ে তাকিয়ে দেখলাম উদিত আদিত্য রক্তচক্ষু নিয়ে ভেঙে আসছেন আমাদের পাকড়াও করবার জন্যে। তখন সকলের মনে একটি মাত্র প্রশ্ন—“আর কত দূর?” কোনও ক্রমে ইনি মাথার উপরে এসে পৌঁছবার পূর্বেই একটা যে-কোন রকমের আশ্রয়ের তলায় আমরা নিজেরা মাথা ভাঁজতে যদি পারি সেই আশায় মাহুদ কজন আর উট দুটির কি আশ্রয় চেষ্টা।

কিন্তু তা কি কখনও হয়? পথ কি কারও ব্যাকুল কামনার করে? বরং আরও দীর্ঘ হয়। নিজের মধ্যে আকুলি-বিকুলি বত বাড়তে থাকে পথও সেই অস্থগাতে ক্রমাগত লম্বা হয় আর ঠিকানা বার পিছিয়ে। তখন আরও হয় প্রাণহীন পথ আর সম্মুখ পথিকের মধ্যে কঙ্কালসংগ্রাম, শেষ পর্যন্ত পথ বা পথিক বার নিস্ত হয়, সেই থাকে টিকে। হয় পথ খতম হয়, নয় পথিক সেই পথের বুকেই অস্তির শয্যায় লুটিয়ে পড়ে। তখন সেই হতভাগ্য আর তার পথ-চলা ছুরেরই চিরন্তনে সমাধি রচিত হয় পথের উপর।

এই জীবনটা কি! স্মৃতিকাগৃহ থেকে রাজা শুরু করে অশান পর্যন্ত পৌঁছবার সময়টুকুর নামই ত জীবন। সেই অশান পর্যন্ত পৌঁছতে কেউ হয়ত দীর্ঘ দিন ধরে নানা সড়ক ঘুরে বহু ঘাটের লোনামিঠা পানি খিলে টান-বাহানা করে লম্বা দেয়ী করে কেনে—কেউ বা লোজা-পথে লই করে গিরে

পৌছয়। কিন্তু হুতিকাগৃহ থেকে শ্রমশান পর্যন্ত পথটুকু চলতে যদি ব্যাগার খাটার দিকদারি না ভোগ করতে হয় তবেই না জীবনের সার্থকতা। স্বাধীনভাবে বুক ফুলিয়ে ভালটা মন্দটা চাখতে চাখতে মজিবত থেমে জিরিয়ে শেষ পর্যন্ত পৌছে খুশী মনে ‘তবে আসি’ বলে পথের কাছ থেকে হেসে বিদায় নেওয়ার নামই জীবন্ত যত্না, অর্থাৎ সার্থক যবনিকা-গতন।

কিন্তু এই আকাশকুসুম কল্পনের ভাগ্যে জোটে। স্রোতের মুখে খড়কুটার মত ভাসতে ভাসতে ঠোঁকর খেতে খেতে উদ্বেগহীন বাজার হঠাৎ যেখানে চরম ছেদ পড়ে তখন তাকে যেমন না বলা যায় যত্না, তেমনি শুমরে কান্ডে কান্ডে অনিচ্ছায় পথ চলাটাকে কোনও রকমেই জীবন বলা চলে না। বেঁচে থাকা আর মরে যাওয়া—দুটোই এক বিরাট ঝাঁকি হয়ে দাঁড়ায়। তাই বিদায়ের কণে সঙ্কল্প হা-হতাশ ছাড়া জমার ঘরে কিছুই পড়ে থাকে না। এরই অপর নাম বেঁচে থাকার নির্মম পরিহাস।

তবে এবারের মত যখন পথই খতম হয়েছে এবং আমি এখন পর্যন্ত তা হই নি তখন চোখও খুলতে হল, উঠেও বসতে হল ছড়িওয়ালার রূপালীর তাড়নার। ততকালে মালপত্র নামানো হয়েছে, উটেরা আমার পায়ের কাছে এসে বলে পড়েছে, দিলমহম্মদ শিকল-বাঁধা বালতি দিয়ে কপিকলের সাহায্যে ইয়ারা থেকে জল তুলে বাঁধানো নালার ঢালছে, আর উট দুটো নালার মুখ জুড়ে চোঁ চোঁ করে লেই জল শুবছে। আমি মাথাটা বালতির নীচে এগিয়ে দিলাম। বালতি বালতি জল মাথা বেয়ে নালার পড়ে উটের পেটে গিয়ে ঢুকল। খড়ে গ্রাণ কিরে এল।

ধর্মশালাটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং চুনবাগি ধরানো। এমন কি জানলা দরজাগুলিতেও রঙ দেওয়া। মারোয়াড়ীর ভৈরী বাড়িটিতে মামসীতার একটি ছোট মন্দিরও রয়েছে। কেবলমাত্র যে হিংলাজ-বাজীদের জন্তেই এই ধর্মশালার প্রয়োজনীয়তা তা নয়, শোনবেনীতে এবং এই বিদ্যাসভের আরও বহুস্থানে রাজহানিবাসী কারাবাসী লোক অনেক আছেন, তাঁদের সকলের জন্তে

স্বাক্ষরনীতে এটা একটা মজবুত আশ্রয়স্থান। দু'দু'রান্তরে পাহাড়ে অবলে
বীপে মরুভূমিতে, একেবারে কলনারও আসে না যে সেখানেও হিন্দু বারোবাড়ী
থাকতে পারেন এমন স্থানেও গিয়ে দেখা বাবে, অপরিণীত মৈথবের অধিকারী এই
বেনিয়ারা অচ্ছন্দে ব্যবসা বাণিজ্য চালাচ্ছেন এবং পরলোকটি কামিয়ে একটা
ধর্মশালা তুলেছেন এবং একটি মন্দিরও প্রতিষ্ঠা করেছেন। এঁরাই লার্ক
বলতে পারেন 'দেশে দেশে মোর ঘর আছে।'

এখানকার বাড়ি ঘর সব পুষ্করী, সমুদ্রের দিকে পিছন করে রয়েছে।
ধর্মশালাটির দু'পাশে দু'খানি লম্বা ঘর, মাঝে চৌকো হালান, তার সামনে
রোয়াক। রোয়াকের নীচে বাঁধানো উঠান। ছোট মন্দিরটি উঠানের এক
কোণার। মন্দির উঠান সমস্ত পাঁচিল দিয়ে ঘেঁরা। তার বাহিরে একাধিক
ইদারা—সাবা শহরের ইতর ভদ্র হিন্দু মুসলমান সকলের পানীর জল পানার
একমাত্র উপায়। ইদারা সরকারী সম্পত্তি, বাঁধানো হয়েছে সিমেন্ট পাথর
দিয়ে ধর্মশালার প্রতিষ্ঠাতার অর্থে। পাঁচিলের গারে ধর্মশালার প্রবেশের
ফটক। মাথার জল ঢালার পর ফটক পেরিয়ে ধর্মশালার গিয়ে ঢুকলাম।

রোয়াকের উপর সকলে বসে পড়েছে। অনেকে হাড়ি-বাঁধা লোটার
জল এনে মুখ হাত ধুচ্ছে। কে ভৈরবীকেও এক হালতি জল এনে দিয়েছে।
হালতিটা সামনে নিয়ে তিনি খান ঠেস দিয়ে বসে আছেন—একখানা ডিম্ব
সামছার তাঁর মুখ মাথা গলা পর্যন্ত ঢাকা। ভৈরবী বসে আছেন—হাঁপ
আছে কি না বোঝা গেল না, আর তাঁর প্রাণ গা ঘেঁসে বসে রয়েছে সেই
মেয়েটি। নার তাঁর কুন্তী বাই।

কুন্তীকে আনা হয়েছে ভৈরবীর সঙ্গে উঠের পিঠে খাটটার মধ্যে শুইয়ে।
কাল যাত্রাকালেও তার দাঁড়াবার সার্বথা হয় নি। উঠের উপর ভৈরবী তাকে
সারটা পথ খেজুর আর বাহার খাইয়ে এনেছেন। এই প্রথম তাকে খাড়া হয়ে
বসতে দেখে অনেকটা নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।

ঈমান বিরহল কিন্তু আত্মারের সঙ্গে গারে হেঁটেই একেছে। তবে মরুত

পঞ্চটা ছুজন ছপাশে থেকে তাকে একরকম টানতে টানতে এনেছে। বেদম প্রহারের চোটে বেচারার হাড়গোড় বোধ হয় আঁত নেই। পণ্ডিত রূপলালের বড় বলকের টানের গুণে সেও অনেকটা সামলে গেছে। এ পর্যন্ত কেউই তাদের কোন কথা জিজ্ঞাসা করে নি। মাত্র নাম দুটো জেনে নেওয়া হয়েছে আর জানা গেছে তারা রাজপুতানার বিকানীরের কাছে একটা গ্রামের ছেলেমেয়ে—বর্তমানে বাঁধাবর বেদে।

ক্রমে খাতস্থ হয়ে যে যার কবল বিছিয়ে ভিন্ন ভিন্ন সীমানা নির্দিষ্ট করে শুছিয়ে বসল। হাতে অটেল সময়। এই মুহূর্তের রাজকর্মচারীরা রাজী পিছু এক টাকা চৌক আনা কর নিয়ে নিজদের খাতাপত্রে আমাদের জমা করে ছাড়পত্র দিলে তবে আবার রওনা হওয়া যাবে। সুতরাং আপাতত নিশ্চিন্ত।

ধর্মশালার শিল নৌড়া রয়েছে, ইদারার আশেপাশে পুদিনার জঙ্গল। পুরানো তেঁতুল আমাদের কোলার। শ্রীমান সুখলাল কালবিলম্ব না করে বাটতে বসে গেল পুদিনা আর তেঁতুল। আজ ভাগ্যে মহাভোজ।

হেঁচৈ করে ভোজ্য বানানো আরম্ভ হল। আমাদের মধ্যে এততেও বাঁদের উৎসাহে তাঁটা পড়ে নি তাঁরা ছুটলেন শহরের বাজারে কিছু পাওয়া যায় কিনা দেখতে। পাওয়া গেল ব্যাসম আর ছাগল দুধের দই। তাই নিয়ে তাঁরা কিরে এলেন। সেই ব্যাসম আর ছাগলের দই পাতলা করে জলে গুলে ছুন আর লঙ্কার গুঁড়ো মিশিয়ে এক কড়াই জাল দিয়ে কাষিওয়াড়ী ভাইরা মহা আদারে রুটি ভিজিয়ে ভোজন করলেন। সেই মহাসুখাত্ত এক লোটা আমাদের জন্তেও এল, রূপ দেখে আর গন্ধ শুঁকে সে পদার্থ মুখে দিতে সাহস হল না। সুখলাল আর কুন্তী সবটুকু চেটে পুটে শেষ করলে।

বাঁওয়া-নাওয়ার পালা সাক হলো আমি আর গুলমহম্মদ বাইরে কুরোর পাড়ে গেলাম শুভে। ধর্মশালার ভেতরটা ভেতে আগুন হয়ে উঠেছে, তার উপর মাছিয়া সবংশে সমুপস্থিত ত রয়েছেই। বাইরেও সুবিধা হল না, নাগরিকীরা জলকে এসেছেন, গাঙ্গরি ভরণে নয়, ছাগলের চামড়ার খোল ভরণে।

তখন আর কি করা যাবে, নিজের আশা ত্যাগ করে আমরা দুজনে শহর দেখতে বার হলাম।

দেখবার মত আশ্চর্য শহরই বটে। ধর্মশালার পশ্চিমে মিনিট পাঁচেক যাঠ আর কাঁটাঝোপ পার হয়ে শহরে গিয়ে ঢোকা গেল। প্রথমেই বাজার। পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা পাশাপাশি পাঁচ ছ'টা চালা, এত নিচু যে প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে চুকতে হয়। আঁকাবাঁকা ভেউড়ানো গাছের ডালের খোঁটা পুঁতে তার উপর ঘরের চাল। চাল ঢাকা হয়েছে বা হাতের কাছে মিলেছে তাই দিয়েই। কবলের টুকরো, ছেঁড়া চট, তার উপর আলকাতরা মাখানো কাটা জিপল, কেরোলিনের টিন চেন্টা করে আঁটকানো হয়েছে ঘরের চালে, বাজারে যে সমস্ত মালপত্র এদেছে তার বাক্সগুলোর কাঠও ব্যবহার করা হয়েছে। শুকনো ছাগলের চামড়াও বাদ পড়ে নি। এক কথার কিছুই বাদ পড়ে নি বা কেলা যায় নি। কেলা না কিছুর সব তুলে দেওয়া হয়েছে ঘরের চালে। এই রকমের এক একটা লম্বা চালার নীচে আট দশটা দোকান। দোকানগুলিতে চর্ব্য চুষ লেহু পের সব রকমের দাবী মেটাবার রসদ জমা রয়েছে, তার সঙ্গে শয্যা বস্ত্র লাগুই কোনও কিছুই অভাব নেই।

ছোটো চালার মাঝখানে যে রাস্তা—বে রাস্তা দিয়ে ঋষিদেবের লক্ষ্মীরা শুভাগমন করেন দোকানে—সেই হাত দশেক চওড়া রাস্তার দুপাশে চার হাত করে বাদ দিলে মাঝখানে যে দুহাত চওড়া স্থানটুকু থাকে, তার উপর কাঠ, চট, চামড়া, লোহার টুকরা, চাবড়া চাবড়া পাথর ইত্যাদি ছনিয়ার সমস্ত প্রকার কালতু জিনিস বিছিয়ে দিয়ে রাস্তার মাঝখানটা খানিক উঁচু করে আগিয়ে রাখা হয়েছে; তার দুধারে একইটু পচা পাক। দোকানগুলিতে প্রবেশ করবার জন্যে রাস্তার মাঝের সেই উঁচু আল থেকে দরজা পর্যন্ত লম্বা তক্তা বা লোহা ফেলে রাখা হয়েছে। মোটের উপর রূপে রসে গন্ধে সমগ্র বাজার এলাকাটি—যাকে বলা চলে গুলজার করা একটি আদর্শ নরক।

তার মাঝে কাকিধানার প্রায়োচোন বাজছে। দেওয়ালে ঝুলছে দুন্দরী

সিনেয়া-ভারকানের সদাহাস্তমুখ কোটোঙলো। গোলমাল হানিঠাটা আনন্দ-ফুটির কিছুমাত্র অভাব নেই। হাঁটু মুড়ে নিচু হয়ে ছ' একখানা দোকানে ঢুকে দেখলাম—বস্তা বাজ গারলা টিন সমস্ত খিচুড়ি পাکیয়ে ঢাল দেওয়া রয়েছে, মাছিতে সমস্ত কালো হয়ে গিয়েছে। তারই মাঝে কপালের চন্দন কুমকুম লাগিয়ে, ভুড়ি বার করে, গেঞ্জির সামনেটা বুকের উপর পর্বস্ত তুলে, হুটপুট রাজস্থানী বেনিমা মহাজন পরম নিশ্চিন্তে বাম হাতে শরীরের বিশেষ এক অংশ কপুতন করতে করতে ডান হাতে খেরো বাঁধানো লম্বা খাতার জমাখরচ লিখছেন।

গুলবহাদর অনেকটা সজে 'সালাম আলেকুম' আর 'আলেকুম সালাম' সাব্বতে লাগল। জ্যাপসা হুর্গন্ধের হাত থেকে পরিজ্ঞাপ পাবার আশায় আমি ভাড়াভাড়ি পশ্চিমদিক দিয়ে বাজার থেকে বেরিয়ে গিয়ে হাঁক ছেড়ে বাঁচলাম।

বাজারের পশ্চিমপ্রান্ত থেকে একেবারে সমুদ্রের কিনার পর্বস্ত বস্তি, তা প্রায় মাইল খানেক হবে। কাঁচা-পাকা ঘরবাড়ি সমস্ত স্থানটি জুড়ে বার যেমন খুশি বলে আছে। কোনও শৃঙ্খলা নেই। কোনও পরিকল্পনার ধার ধারবার প্রয়োজন বোধ না করে শহর যারা গড়েছেন তাঁরা বাসস্থান বানিয়েছেন। রাস্তা বা গলি এ সমস্তের কোনও হালান্না নেই। সর্বত্রই পথ, অথবা কোথাও পথ বলতে কিছু নেই। বেখান দিয়ে ইচ্ছা, যেমন ভাবে খুশি, সব বাড়িতেই বাওয়া আসা বার। দেখলে মনে হবে মহাপুত্র থেকে মুঠো মুঠো ঘরবাড়ি কে যেন ছুঁড়ে কেলে দিয়েছে, সেগুলো সমুদ্রের জলে না পড়ে ছত্রাকার হয়ে ছড়িয়ে পড়ে আছে ভাঙ্গার।

শহরের ঘরবাড়ির অবস্থা অধিকাংশই বাজারের চালাগুলির মত; আবার বালি মাটি পাথর জমানো দেওয়ালের উপর স্রেষ্ঠ পাথরের ছাতওয়ালা অট্টালিকাও রয়েছে। অনেক বাড়ির মেঝে সিমেন্ট করা, কিন্তু সমস্ত ইমারতই বেঁটে। এই খর্বকার গৃহ নির্মাণের হেতু পশ্চিম দিক থেকে আগত সমুদ্রবড়। এ দেশে বড়ের সমস্তম বলে কোনও কিছু নেই, বখন তখন এলেই হল; ছ' পাঁচ

মিনিট বা বড়জোর আধ ঘণ্টার মধ্যে সমস্ত লণ্ডতও করে দিয়ে তাড়াতাড়ি পূর্ব দিকে বেগে প্রস্থান, এই হচ্ছে এখানকার কড়জলের রীতি।

বস্তি উত্তর-দক্ষিণে অনেকদূর পর্যন্ত চলে গিয়েছে। এই শহরের বাসিন্দার সংখ্যা কত তার হিসাব দেবার কেউ নেই। তবে ঘরবাড়ি দেখে ধারণা হল, নেহাৎ কমও হবে না। বাড়লা দেশের বেশ বড় একটি পল্লীগ্রাম। শহরস্থল লোকের পেশা সমুদ্রে মাছ ধরা, সেই মাছকে শুটকিতে পরিণত করা এবং সেই শুটকি মাছ বস্তাবন্দী করে সমুদ্রপথে বা উটের পিঠে করাচী চালান দেওয়া। শহরময় বস্ত্র তত্ত্ব ছোট বড় নানা আকারের মাছ-ধরা জাল দেখে এই ধারণাই হল।

শহর ভ্রমণ করতে করতে এ কথা বুঝতে কষ্ট হল না যে এখানকার লোকে কাঁটার ব্যবহার জানে না এবং আন্তাহুড় বলতে কোনও কিছুই বালাই এখানে নেই। ছাই-পাঁশ, পেরাজ, ভিষের খোলা, পশুপাখীর চামড়া পালক হাড়গোড়, মাছের জীবজন্তুর বিষ্ঠা—এক কথায় বা কিছু কেল দেওয়ার প্রয়োজন—সমস্তই সারা শহরের রাস্তাময় ছড়ানো রয়েছে। বিকারহীন শহরবাসীরা পরম সন্তোষে এরই মধ্যে বসবাস করছে, গৃহস্থালী করছে, বিয়ে-সাদী সন্তানপালন সবতাই করছে। সাবাস না দিয়ে উপায় কি।

শুলমহম্মদের পরামর্শ মত, উত্তর দিকে যেখানে শহর শেষ হয়েছে সেই পর্যন্ত গিয়ে এখানকার সরকারী কাছারী পাওয়া গেল। পাকা দালান, উপরে টিন, অনেকটা আমাদের পুলিশ ফাঁড়ির মত দেখতে। কেউ কোথাও নেই। একটি জোকা পরা জীলোক এক কোণায় বসে সুদীর্ঘ পালক ছাড়াচ্ছিল। সে বললে যে সরকারী হজুররা সকালে উপস্থিত থাকেন। শুনে কিরলাম। কিন্তু আর শহরের ভিতর দিয়ে নয়, সমুদ্রের কিনারায় আরও উত্তরে খানিক এগিয়ে তারপর শহরকে পাশ কাটিয়ে পূর্বদিকে রাইল বেডেক হেঁটে প্রায় সন্ধ্যার সময় ধর্মশালার এসে উঠলাম।

ধর্মশালার উঠানে রামসীতার মন্দিরের সিঁড়িতে তখন ভয়ভয়টি কাণ্ড।

বিশ-পঁচিশ জন নানা বয়সের মায়োয়াকী মহিলা লাল রঙের উপর কালোর বিচিত্র বরফি কাটা ওড়না জড়িয়ে সেই ওড়নার মুখ ঢেকে অথচ সমস্ত উদর মায় নাভির নীচে পর্যন্ত খোলা রেখে বিস্তর ঘেঁষাওয়া নানা রঙের ঘাঘরা পরে উপস্থিত হয়েছেন। তাঁরা সমস্ত স্থানটুকু জুড়ে ভৈরবীকে ঘিরে বসে গান আরম্ভ করে দিয়েছেন। প্রায় প্রত্যেকের সামনেই একখানি করে থালি। থালিতে রয়েছে মিছরের দাগ দেওয়া ছোবড়াহুড়ু, এক একটি নারকেল, হলুদে ছোপানো গুতার গুচ্ছ—আর কিছু কিছু শুকনো মেওয়া মিছরি। বাঙলা দেশের এক আওয়াং হিংলাজ দর্শনে চলেছেন এই সংবাদ শুনে তীর্থযাত্রীদের দর্শন লাভের জন্যে এই সমস্ত দ্রব্যসামগ্রী নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন এঁরা। এগুলি মাতা হিংলাজের পূজার উপচার, আপাতত হিংলাজ মাঘীর একটি বন্দনাসঙ্গীত চলছে। হঠাৎ এ ছেন স্থানে এই অকল্পনীয় ব্যাপার দেখে থ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

মহিলারা চলে গেলেন। পণ্ডিত রূপলাল সবসঙ্গে নারকেল এবং মেওয়া মিছরিগুলি পোটলা বাঁধলে। লালপাড় একখানি কোরা কাপড় পরা একটি মেয়ে এসে আমার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলে। এ আবার কে। চমকে উঠলাম। প্রণাম সেয়ে উঠে দাঁড়াতে দেখি—আমাদের কুন্তী।

মাথার সাবান ঘষে স্নান করেছে। অপরাপ্ত কক্ষ চুল ঘোমটার ভিতর থেকে বেরিয়ে মুখের দুপাশ আবৃত করে নেবে এসে বুদ্ধের উপর ছাপিয়ে পড়েছে। জ্ঞান করে স্নান করবার ফলে শরীরের মানি লাক হয়ে গিয়েছে। সন্ধ্যার আবহা অন্ধকারে নতুন শাড়ি পরা এই মেয়েটির সারা শরীরে যে স্নিগ্ধ সূচিভা আর স্ত্রী সূটে উঠেছে তা দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল। পরশুদিন বাকে কাঁধে করে বয়ে এনেছিলাম এ যেন সে নয়, সে ছিল একটা জড় পদার্থ, আজ এতকণে তাতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়েছে।

ভৈরবী কুন্তীকে চারের জল চড়াতে বললেন। কুন্তী চলে গেল। এই অগ্নিব সৌষ্ঠববতী তব্বতী মেয়েটির চলার দিকে চেয়ে রইলাম।

সেইখানেই বন্ধিরের সিঁড়ির উপর বসলাম। বন্ধিরে একটি দীপ জলছে। মাথার উপরে অনেক উচুতে অনেকগুলি দীপ একসঙ্গে মিটমিট করে জলে উঠল। সমুদ্র থেকে গুরুগম্ভীর ধ্বনি মিটি হাওয়ার ভেনে আসছে। বাইরে আমাদের উট দুটির গলার ঘণ্টার টিং টিং আওয়াজ হচ্ছে। সমস্ত কিছু মিলে মিশে সম্ভাব্যতার সমস্ত আয়োজন যেন সুসম্পূর্ণ করে তুলেছে। স্থান কাল অবস্থা সব কিছু ভুলে গিয়ে কপিকের জন্তে একটি অপার্থিব তৃপ্তির আশ্বাস পাওয়া গেল। বুক ভরে একটা নিশ্বাস নিয়ে চুপ করে বসে রইলাম।

ভৈরবী বললেন, “কুন্ডী আর আমাদের সম্বন্ধ আছে না, আমাদের সম্বন্ধই সে বাবে।”

জিজ্ঞাসা করলাম, “কোথায়?”

ভৈরবী উত্তর দিলেন, “এখন হিংলাজ, তারপর সেখান থেকে কিরে আমরা যেখানে বাব সেইখানে।”

ভয়ানক আশ্চর্য হয়ে গেলাম, “কিন্তু ওর ওই বিরমল?”

বা কল্পনাতেও আসে না সেই উত্তর পেলাম।

“বিরমলকে ও জয়ের শোধ ছেড়েছে। বিরমল ওর কেউ নয়। তার বেখানে খুশি সে চুলোর বাক না, কে তাকে ধরে রেখেছে? সে কোথায় বাবে, কি করবে, কুন্ডী তার জানে কী? সে আমাদের ছেড়ে কোথাও বাবে না। ওই হস্তছাড়াই বত নঠের মূল, ও দূর হয়ে বাক!”

এই পর্যন্ত বলে প্রসঙ্গটার একেবারে ইতি করে তিনি তাঁর কটকী জাঁতি দিয়ে কটাকট করে কয়েক খণ্ড সুপারি কেটে মুখে ফেললেন। তারপর একটুখানি দোস্তাপাতা ছিঁড়ে নিয়ে তাতে উপযুক্ত পরিমাণ চুন প্রয়োগ করতে মনোনিবেশ করলেন।

তা তিনি করুন, কিন্তু আমি পড়লাম ভাবনার অকূল সমুদ্রে। কে এই মেরে, কার ঘর থেকে এসেছে—আর অবশীলাক্রমে এই বে সে ছোকরাকে ত্যাগ করে আমাদের সম্বন্ধ ধরতে চাইছে—সেই ছোকরার সঙ্গে ওর সম্বন্ধই বা কি? সম্বন্ধ

বাই হোক, সেই ছোকরা ঐ ঘেরের জন্তে মার খেয়ে হাড় ভাঙে করেছে, নিজের চক্ষে দেখেছি—এই ঘেরকে ঘাড়ে করে বয়ে আনতে আনতে সার্বথ্যের চরম সীমার পৌঁছে নিজে মুখ ওঁজড়ে পড়ে তবে সে কাজ দিয়েছে। “থিকমল ওর কেউ নয়” ভৈরবীর এই কথাটি শুধ শুধ করে আমার মাথার মধ্যে ঘা দিতে লাগল। কেউই যদি না হবে তবে এ ভাবে নিজের জীবনের মারা ত্যাগ করে ওকে বাঁচাবার জন্তে অস্তিম চেষ্টা সে করে কেন? সেই মকর মাঝে ঐ ঘেরকে ফেলে রেখে নিজের প্রাণ নিয়ে পালালে আজ কুতী থাকতই বা কোথায় আর আমাদের লক্ষ্য পাকড়াতই বা কেমন করে? হয়ত সত্যই থিকমল ওর কেউ নয়। হতেও পারে ঘেরটার দুর্দশার কারণও ওই থিকমল ছোকরা। কিন্তু যমের প্রাণ থেকে ওকে টেনে আনতে সে নিজেই যমের মুখে ঢুকেছিল এও ত অলজ্ঞান সত্য। “আমি তোমার কেউ নই” বা “তুমি আমার কে বটে”—এই দুটি বাক্য উচ্চারণ করা এমন কিছু কঠিন কার্য নয়, কিন্তু...

এই কিস্তির সন্মানে দাঁড়িয়ে নিজেই কঁকড়ে এতটুকু হয়ে গেলাম। পরশ-দিন সেই ছপুর বোদে সেই বালির টিলার উপর দিয়ে এই ঘেরকে ঘাড়ে করে আমিও খানিক বয়ে এনেছি। কেন যে সে কাজ করতে গিয়েছিলাম তখন তা ভাববারও অবকাশ ছিল না। একজন পুরুষ থিকমল যতক্ষণ নিজের পারের উপর খাড়া থাকতে পেরেছে ততক্ষণ একে বয়ে এনেছে, তারপর আর একজন পুরুষ আমি তার অসমাপ্ত কার্যটি শেষ করেছি। আজ বিনা বিধার এই ঘেরে বলছে থিকমলকে, “তুমি আমার কেউ নও!” এই নিরীহ বাক্যটি আর একজন পুরুষের প্রাণে কি হুয়ে বাজে এই নারী কি তা চিন্তা করে দেখেছে?

ভৈরবীকে জিজ্ঞাসা করলাম, “এ কথা থিকমলকে বলা হয়েছে?”

উত্তর হল, “ওকে আবার বলে কি হবে? ওর বেখানে খুশি চলে থাক না, কে ওকে আটকে রেখেছে?”

পরম চা ভরতি পিতলের পেলাসটা নতুন কাপড়ের আঁচল দিয়ে চেপে ধরে কুন্ডী এসে দাঁড়াল। বিশেষ এক নতুন দৃষ্টিতে ওর আগাদমস্তক একবার দেখে নিলাম। এই যে ছন্দোময় পতিভক্তি, এই যে স্বকৃত্য আর তনিমা, এর অন্তরালবর্তিনী যে নারী, সেই নারীদেহের প্রতিটি রেখা আমার একান্ত পরিচিত। মাত্র কয়েক ঘণ্টা পূর্বে এর নিরাবরণ অচেতন দেহ স্বচ্ছন্দে দুইয়েছি মুছিয়েছি, অর্ধচেতন অবস্থায় নিজের দুই হাতের মুঠায় আমার একটা হাত চেপে ধরে এই নারী পরম আশ্বাস লাভ করেছে। আজ নতুন করে মনে হল—এঁকে চিনিও না জানিও না। এই নতুন শাড়ির মধ্যে যে দেহ, সেই দেহের মধ্যে সত্যিকার যে নারী তাকে স্পষ্ট দেখতে পেলাম। বিতৃষ্ণায় মনটা তিক্ত হয়ে গেল। নারী চিরকাল পুরুষের নাগালের বাইরে, দূরে বহু দূরে বোজনাস্তরে বাস করে। সেখানে পৌঁছনো পুরুষের অসাধ্য। তাকে ধরা বা ছোঁয়ার চেষ্টা করা আর মরীচিকার পিছনে দৌড়নো একই কথা।

গেলাসটা কুন্ডীর হাত থেকে নিয়ে বাইরে কুয়ার ধারে উঠে গেলাম। সেখানে সকলে গোল হয়ে বসেছে, বড় কলকের আগুন দেওয়া হয়েছে।

আমাকে দেখে ওদের মধ্যে বা আলোচনা চলছিল বহু হয়ে গেল। নন্দজের আলোর মধ্যে নিলাম কে কে আছে। ভাই পোপট আছে, গুলমহম্মদ রয়েছে, মুখলাল বিক্রমল এবং আরও জনা-দশেক বসে রয়েছে। পিছনে কুয়ার পাড় ঠেস দিয়ে দিলমহম্মদ দাঁড়িয়ে আছে, বড় ছোট কোনও কলকের ধারই ও ধারে না। গেলাস হাতে পোপটলাল ভাইয়ের পাশে গিয়ে বসে পড়লাম।

সবাই চুপচাপ, অলস কলকেটা একজনের হাত থেকে আর একজনের হাতে কিরছে। গেলাসের চা শেষ করে একবার কেসে গলাটা সাফ করে নিয়ে ডাকলাম, “বিক্রমল!” সবাই একটু চমকে উঠল। বিক্রমল উঠে দাঁড়াল, তারপর বাড়ি হেঁট করে উত্তর দিলে, “হ্যাঁ জী মহারাজ!”

বললাম, “এস এখানে, আমার কাছে বসবে।”

কুণ্ঠিত পদে এগিয়ে এসে থিরমল। হাত ধরে কাছে বসলাম, তারপর তার গিঠে হাত বুলাতে বুলাতে জিজ্ঞাসা করলাম, “এখন কেমন মনে হচ্ছে, মানে শরীরে বেশ বল পেয়েছ ত?” এ কথার উত্তর সে দিলে না, নিজের চুই হাঁটুর ভিতর মুখ গুঁজে ফুলে ফুলে কান্না আরম্ভ করলে। সে কান্নার অব্যক্ত ভাবা বেশ বুঝতে পারলাম কিন্তু কোন সাহসনার বাণী কারও মুখে জোগাল না।

কেবল মাত্র গুলশহাদ্দ বার-চুই “হা আল্লা হা আল্লা” বলে উঠল।

অবশেষে পোপটলাল প্যাটেল মুখ খুললেন। বসতে লাগলেন তিনি দুর্ভাগ্যের জীবনকাহিনী, যা তাঁরা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেরা করে সারা বিকেল বেলাটা ধরে এর কাছ থেকে বার করেছেন। মুক্ত আকাশের তলার পোপটলালের ধীর শান্ত গভীর চাপা স্বর সমুদ্র থেকে ভেসে আসা গুরু-গুরু ধ্বনির সঙ্গে মিশে এমন ভাবেই স্থানটিকে আচ্ছন্ন করে ফেললে যে সবটুকু শেষ না হওয়া পর্যন্ত বাতানও যেন শুরু হয়ে রইল।

আরম্ভ করলেন পোপটলাল—খুব ছোট বেলার থিরমলের বাপ মা দুজনেই ছয় মাসা বার নয় তাকে ত্যাগ করে পালিয়ে যায়। বারা তাকে বড় করে তুললে তাদের জাত যে কি এবং পেশা যে কি নয় তা থিরমল শেষ পর্যন্ত জানতে পারে নি। যে-মায়ের বুকের দুধ পান করে সে বেঁচেছে তার সেই মা রাস্তার ঘাটে ঘাটে বাজারে নাচত আর গান গাইত। নাচগানের সঙ্গে যে লোকটি হারমোনিয়াম বাজাত, বড় হয়ে থিরমল তাকে বাবা বলে ডাকতে আরম্ভ করে। বছর সাতেক বয়স পর্যন্ত থিরমল তার গলার-হারমোনিয়াম-খোলানো বাপ আর নাচিয়ে মায়ের সঙ্গে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াল।

সেই সময় জন্মালো তার সেই মায়ের পেটে এক মেয়ে। এই মেয়ে জন্মেই তার ভাগ্যে চিড় খাওয়ালে। এই সময় তাকে প্রথম জানানো হল যে তারা তাকে রেল-স্টেশনে হুড়িয়ে পেয়ে বাহুব করেছে। এবং এখন তার ভিক্ষা

করে পেট চালাবার মত বয়স হয়েছে সুতরাং তাকে বিদায় নিতে হবে। তার সেই মা অবশ্য চেষ্টার কসর করলে না তাকে কাছে রাখবার জন্যে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিরমলকে পালাতেই হল এই হারমোনিয়াম-বাজিরে বাপের অত্যাচারের স্তোত্র।

পালিয়ে গেল সে আর একজন হারমোনিয়াম-বাজিরের সঙ্গে। সে লোকটা তাকে বাগরা পরিয়ে মেয়ে সাজিয়ে নাচিয়ে নিয়ে বেড়াতে লাগল। নাচটা তার মায়ের সঙ্গে থাকতে থাকতে একরকম অভ্যাস হয়েই ছিল সুতরাং আটকাল না। এই ভাবে বছর তিনেকের মধ্যে কলকাতা বোম্বাই সমস্ত ঘোরা শেষ করে ওরা লক্কৌ গিয়ে পৌঁছল। সেখানে বিরমলের গলায় হারমোনিয়ামটি ঝুলিয়ে দিয়ে সে লোকটা নাচগানের মাথা জয়ের শোধ ত্যাগ করলে, রোগে পড়ে সে ম'ল। তখন বিরমলের বয়স তেরো পার হয়েছে। বাগরা আর কাঁচুলি খুলে বিরমল হাঁক ছেড়ে বাঁচল। তখন সে একরকম সাবালক হয়েই পড়েছে, নেশা বলতে সব কটাই করতে শিখেছে, হারমোনিয়ামেও বেশ হাত চলে।

কিন্তু স্বাধীনভাবে নাচগানের কারবার চালাতে গেলে আর একজন চাই। তেরো বোর্ড বছরের ছেলের আর-একজন জুটবে কেন। সুতরাং তাকে অল্প পেশা ধরতে হল। পেশাটি খুবই সহজ এবং সরল; অল্প কিছুই নয়—হাত সাফায়ের খেল দেখানো। কিন্তু ঝুঁকিটা এ পেশায় অত্যধিক। কয়েকবার ধরা পড়বার পর তাকে তিন বছরের জন্যে আটকা পড়তে হল। যে বিচ্ছেদগুলি তখনও তার শিকার হয় নি এই তিন বছরে সেই সমস্ত বিচ্ছেদ একেবারে ওস্তাদ হয়ে বখন ছাড়া পেল তখন সে পূর্ণ যুবক। এতকাল তার নাম ছিল ছুয়ু, এবার সে হল বিরমল।

নাড়ীর টান ছিল রাজস্থানের সঙ্গে। সেখানকার জাঁকজমক হাতী হাওরা আতর গোলাপ ধারী নাচওয়ালী—এ সমস্তর সঙ্গে ছিল তার মস্তকর লবঙ্গ। উপস্থিত হল বিরমল রাজস্থানে নিজের জাগ্য পরীক্ষা করতে।

ভাগ্য যুখ তুলে চাইতে কহুর করলেন না। পড়ে গেল এক বড় ঘরের মাথা সাহেবের নজরে। তিনি তাকে তাঁর খাস বাইজীর কাজে বাহাল করে দিলেন। ফলে এই ছুনিয়ার বেটুকু দেখতে আর জানতে তার বাকি ছিল অল্প দিনেই সে সমস্ত রপ্ত হয়ে গেল। আদব-কায়দা চাল-চলন যেমন বদলান নজরও গেল তেমনি পার্শে। ছোট কিছুতে আর মন ওঠে না। ঘরওয়ানা ঘরের আন্তাহুড়ের কুস্তারিও মেজাজ আছে।

আমিরী চালে চলছিল দিন ভালই। কিন্তু বড় ঘরের বড় ব্যাপার ঘটে বসল। এক বাগান-বাড়িতে বাইজী একদিন খুন হলেন। কে তাঁকে গুলি করলে। তিনি শু মরে রেহাই পেলেন কিন্তু চাকর-বাকররা অল্পে রেহাই পেল না। বছর খানেক হাজত বালের পর ছাড়া পেয়ে আবার বখন সে পথের মাঝে এসে দাঁড়াল, তখন এই ছুনিয়ার হালচালের উপর তার খিকার জন্মে গেছে।

এইবার সব কিছু ছেড়েছুড়ে দিয়ে তিনটে হাড়ের তৈরী চৌকো পাশা আর একখানা হিজিবিজি-কাটা ছক সজল করে সে মাহুকের ভাগ্য-গণনার পেশা অবলম্বন করে ককিরি নিয়ে বার হল। এর মত আধীন নিরুপদ্রব পেশা ছুনিয়ার ছুটি নেই। ঝকি নেই, কামেলা নেই, কোনও ক্যানাদ নেই। বিধন পরজের শুভোর লোকে এসে বেজায় গলা বাড়িয়ে দেয়, তখন একমাত্র শুণের প্রয়োজন যিনি ভবিষ্যৎ বাংলাবের তাঁর নিজের নির্দিষ্ট নির্বিকার ভাবটি বজায় রাখা, তারপর ধীরে হুহু পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে চাকু চালানো। জন্ম থেকে নানারকমের অবস্থার ভিতর দিয়ে পার হয়ে এসে নানাঘাটের লোনা মিঠা পানি গিলে তিথারী আর আমীর সব রকম লোকের সঙ্গে বিশেষ বিক্রমলের একটা উচ্চশ্রেণীর নৈব্যক্তিক ভাব এসেই গিয়েছিল। এখন সেটা চরংকার কাজ দিলে এই ভাগ্যগণনার পেশার। ফলাও কারবার জন্মে গেল।

কিন্তু এখানে ক্যানাদ বাধল অস্ত রকমের। বিক্রমলের ভিতরের বে ভিতর সে এবার জেগে উঠল। শু শু জেগে উঠল না, একেবারে জেগে উঠল। ফেপল

ওই কুস্তীকে দেখে। ওই মেয়েকে ধরে সে নীড় রচনা করবার যত্ন দেখতে শুরু করলে। শেষ পর্যন্ত এই বদখেয়ালই যত অনর্থের মূল হয়ে দাঁড়াল।

কুস্তীও নেহাৎ খা-তা ঘরের মেয়ে নয়। বাপ তার একজন ছোটখাটো জায়গীরদার। আর-পাঁচজনের যত মেয়ের দশ বছর বয়সে তিনি ধরে দেন উপযুক্ত পাত্রের সঙ্গে। জামাই সরকারী কোজের চাকুরে। কোম্পানীলোক বছরে ছুঁচার দিনের অঙ্কে ছুটি পেয়ে বাড়িতে এসে থাকে আবার চলে যায়। সেই ভাবেই চলছিল। এমন সময় লাগল লড়াই। কুস্তীর কোম্পানী জামী লড়াই শুরু হবার পর সেই বে গেল সেই বাওয়াই তার শেষ বাওয়া। লোকটার পাত্তা পর্যন্ত পাওয়া গেল না।

মাহুকের ভাগ্য আর ভবিষ্যৎ বাংলাবার বিরাট দায়িত্ব কক্ষে নিয়ে বাবা ঘুরে বেড়ায় তাদের কাছে যে স্ত্রীলোকের দীর্ঘদিন জামীর খোঁজ মিলছে না সেই স্ত্রীলোকই সর্বগুণাধিতা মক্কেল। কাঁখে কোলা ঝুলিয়ে থিকমল যেদিন গিরে দাঁড়াল কুস্তীর বাপের দরজার সেদিন সর্বপ্রথম তাকে ছক পেতে হাড়ের পাশা চলে দেখতে হল কুস্তীর নিখোঁজ জামীর কোন হদিশ মেলে কি না। লামনে অস্ত্র সকলের সঙ্গে বলে কুস্তীও ককনিখাসে গণংকারের দায় শোনবার অপেক্ষার রয়েছে। অনেকক্ষণ ধরে বনের হুখে অনেকবার ঘুরিয়ে কিরিয়ে পাশা কেলে অনেক রকমের শক্ত হিসাব করে শেষে গণংকার কুস্তীর হাত দেখতে চাইলে। তারপর তার হাতখানি নিজের হাতের মুঠোর পেয়ে পুখুহুপুখুরূপে রেখাখিচার চক্রে লাগল।

কিন্তু সে বিচার কি সহজে শেষ হয়! গণংকারের নিজের কুকের ভিতরে তখন চিশ্টিপ শুরু হয়েছে, কপালে আর কানের পাশে দুটে উঠেছে বিন্দু বিন্দু ঘাম। বাকু—শেষ পর্যন্ত টাকা পরস্য কিছুই না নিয়ে সেদিনের যত গণংকার খিয়ার মিলে। বলে গেল, আবার সে আসবে, এসে বিচারের কল জানাবে। তখন টাকাকড়ি বা নেবার নেবে।

এই ভাবে সে কয়েকবার এসে গেল, প্রতিবারই পাশার দুটি বহু জালাচালি

কল্পে আর কুস্তীর হাত ধরে বসে দীর্ঘ সময় অনেক শক্ত বিচার করলে। কুস্তীর হারানো স্বামী অবশ্য শেষ পর্যন্ত হারানোই রয়ে গেল। তবে মাসখানেকের মধ্যে কুস্তীও গেল নিখোঁজ হয়ে। বোধ হয় স্বামীর খোঁজেই পা বাড়ালে। গণৎকারকেও আর কখনও সে অকলে দেখা গেল না।

এই হল আরম্ভ—কুস্তী আর থিকমলের একসঙ্গে পথ চলার শুরু। এমনি করেই বছর খানেক পূর্বে শুরু হয় ওদের জীবনের ঐত সঙ্গীত।

এই পর্যন্ত বলে পোপটলাল ভাই একজনের হাত থেকে অলস কলকেটা গ্রহণ করলেন। তারপর সেটা দু-হাতের মুঠোর বাগিয়ে ধরে তাতে ঠোট সংযোগ করলেন।

শেঁ। শেঁ। করে গোটা কতক টান দেবার পর শেষে একটি অতিদীর্ঘ মোকম টানের সঙ্গে দপ্ করে কলকেটার মাথায় আগুন জলে উঠল। তখন কলকেটা আর একজনের হাতে দিয়ে পোপটলাল দম বন্ধ করে বসে রইলেন। মহামূল্য ধূমের এক বিস্ফুও না নাক-মুখ দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে অপচয় হয়।

সবাই নিস্তরু, থিকমল একভাবে হাঁটুতে মুখ গুঁজে বসে আছে। কান্না তার অনেককণ ধেমেছে। সেই বিকেল থেকে এদের সকলের জেরার মুখে নিজের সারা জীবনের সমস্ত খুঁটিনাটি উজাড় করে দিয়ে বেচারী একেবারে নিঃশ্ব হয়ে পড়েছে। নিজেকে কতদূর অসহ্য বোধ করলে তবে মাহুয এভাবে বিগত জীবনটা অপরের সামনে নির্দয় ভাবে খুলে ধরে—সেই কথা চিন্তা করে নিউরে উঠগাম।

অনেককণ পর প্রিজালা করলার থিকমলকেই, “একটা কথা কিছুতেই বুঝতে পারছি না যে শেষ পর্যন্ত কি আশায় তোমরা এই ভয়ানক মূর্খকে মাথা গলালে। আর চলেছই বা কোথায় এই বয়ালকের মধ্যে? অস্ত্র কোথাও পড়ে যদি মরতে অন্তত জলটুকুও ত পেতে, এখানে সে আশাও বে নেই। লাকাত মৃত্যুর মুখে চোকবায় অস্ত্র এই হুঃসাহস কেন করতে গেলে তোমরা?”

বিক্রমল সেই ভাবেই বসে বইল, মুখও তুললে না। উত্তর দিলে কপলাল।
এতক্ষণের এত দীর্ঘ পাবাণের মত ভারী কাহিনীটিকে হালকা তুলনা করে উড়িয়ে
দিলে ছু কথার। সে বললে—

বাকিটুকু ভয়ানক সোজা—একেবারে জলবৎ তরল। প্রথমে হুঁজনে
পালিয়ে বেড়াতে লাগল ধরা পড়বার ভয়ে। কুয়িরে এল হুঁজনের কাছে বা
কিছু ছিল যেত। মেয়েটার গহনাগুলি পর্বত বখন উন্নয়ের টানে উঠে গেল
তখন আমদানি না হলে চলে কি করে। আরও হল খিটখিটি। শেষে জল
থেকে কজি-বোজগারের যে উপায় বিক্রমলের জানা ছিল সেই সোজাপথে পা
বাড়ালে। কুন্ডী লাগল নাচতে—আর তার পিছু পিছু ঐ পিনপিনে বাতবতট।
গলার ঝুলিয়ে ঘুরতে লাগল বিক্রমল। কিন্তু তাতেও শান্তি নেই। বিক্রমলের
এত সাধের সম্পত্তি ওই যেয়েই হাতছাড়া হবার ভয়। নাচ দেখে বান্ধা পক্ষা দেখে
তাঁদের তিত্তর আবার অনেকে বেশি পরমা ধরত করে নাচগারানীকেও ধানিক
পেতে চায়। বিক্রমল দেখলে হুনিরাত্ত নবাই হাঁ করে তেড়ে আসছে—এক
গ্রাম নেবেই তার বুকের পাঁজরা থেকে। তখন পালাও, পালাও। ওই বেয়ে
নিরে এমন স্থান খুঁজে বেড়াতে লাগল যেখানে কারও দেবার ভয় নেই।
এমন সময় করাচী শহরে উপস্থিত হয়ে ওরা তখন একদল বাজী চলেছে
হিংসাজ। এদের লক্ষ ধরতে পারলে অসুস্থ বাস খানেকের মত নিশ্চিন্ত। সেই
আশা নিয়ে ওরাও করাচী ত্যাগ করে এল আশরা বেদিন করাচী থেকে বগুয়ানা
হই তার পরদিন সকালে। গ্রামপথে আসছিল যদি আমাদের নাগাল পায়।
ওরা ভবেছিল বাজীদলে একজন হাইদ্রীও আছেন। আমাদের ধরতে আশ
বাজ করেই বট। চলা বাকি এমন সময় সেদিন সকালে নদীর বাঁকে পড়ল
হুঁজনের সামনে। জারিসিক থেকে তাকী থেকে পালিয়ে এনে শেষ পর্বত বাঁকের
মুখেই পড়তে হল।

এতক্ষণ পরে হাতে হাত ধরে দিলবদ্বন্দ্ব উচ্চারণ করলে, “আর একবার যদি
সেই শরতান তিনটের দেখা পেতাম।”

চক্ষুকে উঠানায়, “কে তারা, তাদের চেন তুমি সিলমহম্মদ?”

হাহাকারের মত শোনাল অবাবটা। অবাব মিলে গুলমহম্মদ, “হজুর, সেই রাত্রি শেবে আমরা হাবামী বাচ্চাদের কাছেই চা খেয়েছিলাম। তারা পরদেশী, তারা পেশোয়ারের লোক। হয় কোঁকী আদমী নয়ত ডাকাত, পালিয়ে বেড়াচ্ছে, তাদের সামনেই এরা পড়ে গিয়েছিল, সেই উল্কা পাঠাবা...”

এই পর্বন্ত বলে বৃদ্ধ বার বার মাথা নাড়তে লাগল—আর তার গলা দিয়ে কিছু বার হল না।

হঠাৎ মনে হল কপালের ছপাশের বগ ছুটো টন টন করে ছিঁড়ে বাচ্ছে। আর একটি কথাও না বলে উঠে গেলার। ইদারার ওপাশে নেমে অন্ধকারে বালুর উপর এখার থেকে ওখার পায়চারি করতে লাগলার। অসহ বস্ত্রণার মাথাটা বেন ছিঁড়ে পড়তে চার।

কতকণ এমনি ভাবে পায়চারি করছিলেন খেয়াল ছিল না। ধর্মশালার ভিতর থেকে ভৈরবী হুখলালকে পাঠালেন। সংবাদ—কুটি বানানো শেষ হয়েছে, গুড় সহযোগে জলপান সমাপ্ত করে আজ রাতের মত শুয়ে পড়া প্রয়োজন।

এতকণে স্মরণ হল—আমরা হিংলাজ-বাদী, এবং হিংলাজ তখনও বহুদূর।

ভোর রাতে বস্ত্র দেখলার। দেখলার এক উৎকট বস্ত্র। আমাদের মতকে তিনটে শেরালে তাড়া করেছে। অজান আশ্রমের দীঘির পাড়ে ঘটছে ব্যাপারটা। মত প্রাণপণে দৌড়ে আসতে আসতে হঠাৎ পিছন কিরে নিঠের লোর খাড়া করে কখে দাঁড়াল। শেরাল তিনটে তিন দিকে বিবেছে, কিন্তু ওর ওই ভয়ঙ্কর রূপ দেখে আর এগুতে সাহস করছে না। একটা শেরাল এক লাফে এল ডেড়ে। চক্ষুর নিম্নে মত তার দিকে কিরে থাবা উচিরে কাঁপিয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে আর একটা শেরাল পিছন দিক থেকে দৌড়ে এলে মতর ঘাড় কামড়ে ধরলে। কিন্তু রাখতে পারলেন না। এক আটকান নিজেই ছাড়িয়ে নিয়ে মত বরীরা হয়ে দৌড়ল আশ্রমের দিকে। তার মাথা লোমের উপর দিয়ে লাল রক্ত গড়িয়ে নামছে। ছুটে এলে সে

ভৈরবীর কোলে কাঁপিয়ে পড়ল। শুকে বুকে তুলে নিয়ে ভৈরবী হাউমাউ করে কাঁদছেন; শুকে তাঁর বুক কাপড়চোপড় ভেসে যাচ্ছে। বিড়ালটা আন্তে আন্তে নেতিয়ে পড়ল।

ঘুম ভেঙে গেল।

উঠে বসলাম। সকাল হতে আর বেশি ঘেরি নেই। উট দুটিকে নিয়ে দিলমহম্মদ রওয়ানা হচ্ছে। তার হাতের টাঙ্গির ছোট কলাখানির উপর নজর পড়ল। শুদের হৃদয়ের হাতেই এই বকর চকচকে কলাওয়ানা হুখানা টাঙ্গি সদাসর্বদা রয়েছে। উট যদি কেনে বার তখন ঐ টাঙ্গির সাহায্যেই আত্মরক্ষা হবে। এতদিন এতবার ঐ টাঙ্গি হুখানি চোখে পড়েছে অথচ কেন যে ঐ হুখানির উপর ভাল করে নজর দেবার অবকাশ পাই নি,— আর আজই ঐ চকচকে কলাখানির উপর বিশেষ করে কেন যে বারবার দুটি গিয়ে পড়তে লাগল—এই কথা ভাবতে ভাবতে চোখে মুখে জল দেবার জন্তে ঘের হলাম। শোনবেগীতে প্রথম রাত কাটল।

আমরা বহুব্রহ্মাতি যখন এই পৃথিবীর অজ্ঞাত প্রাণীদের নাম উল্লেখ করি তখন পর পর এই ভাবেই বলে বাই, যেমন—হাতী ঘোড়া উট বাঘ, কখনও বাঘকে আগে বলিয়ে বাঘ হাতী ঘোড়া উট বলি না, অথবা উটকে আগে স্থান দিবে উট বাঘ ঘোড়া হাতী এরকমও উচ্চারণ করি না। সকল সময়ই সর্বপ্রথমে হাতীর স্থান, তারপর ঘোড়ার, তৃতীয় স্থান উটের এবং শেষ স্থান বাঘের। হাতীর নাম প্রথমে বসায় কারও আপত্তি করার কিছুই থাকতে পারে না। কারণ হাতী হচ্ছে হাতী, এ ছুনিয়ার নিয়ম হচ্ছে বা কিছু বিস্মৃতি আর মনে-ভারী তার কনর সবচেয়ে বেশি, চট্ট করে চোখে ধরে যায় কিনা।

আমার বক্তব্য হচ্ছে, ঘোড়ার পরে উটকে না বলিয়ে উটের পরে ঘোড়ার স্থান দিলে কেমন হয়? হাতী উট ঘোড়া বাঘ—এই ভাবে বললে যেমন ক্রমে বড় থেকে ছোটতে আসা হয়, শক্তিসামর্থ্যের দিক থেকে বিচার

করতে গেলে ভেদমি উটকে দ্বিতীয় হানটি দিয়ে খোড়াকে তৃতীয় হানে মাঝিরে আনলে ভাষ্য বিচারের বর্ধালা থাকে।

এক আপত্তি উঠবে যে, সৌন্দর্যের প্রতিযোগিতায় উটের হান কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তা একবার ভেবে দেখেছি কি বাপু ?

উত্তরে আমি বলছি, সৌন্দর্য বস্তুটা পারিপার্শ্বিক পরিবেশের উপর ভিত্তি নির্ভর করে ততটা বার সৌন্দর্য বিচার হচ্ছে তার গুণের বা রূপের উপর করে না। গণ্ডারকে আমাদের জঙ্গল থেকে ধরে এনে আলিপুরে রাখলে তাকে দেখে মাক মিটকায়েই, কিন্তু আমাদের সেই বন আশ্রয় জলা আর জঙ্গলের মধ্যে গণ্ডার ভিন্ন অন্য কিছুই মনে হবে না। আমার কথা মনেতেই হবে যদি কেউ উটকে তার নিজের বন-গৃহস্থালির দিকে, তার সেই মসকব-শূণ্ড মসকুমিতে কাঁটাগাছ আর বাবলাগাছগুলির মধ্যে লম্বা গলা উঠিয়ে বস্তুকে ঘুরে কাঁটা চিন্তে দেখে। কখনও কখনও করা যায় না যে উটের সেই নিজের অগতে বিশালকার হাতীকে বা চকচকে বকরকে পালিশ করা যেসের খোড়াকে মানাবে। একেবারে বেখান্না বেরুয়ো বেরাড়া বলে মনে হবে সেখানে হাতী আর খোড়ার উপস্থিতি। সৌন্দর্যের প্রতিযোগিতা এর লক্ষে ওদের চলেই না। উটেরও একটা বিশেষ সৌন্দর্য আছে, সে সৌন্দর্য ভাববাক্যারে বা কবানীপুরে মানাবে না, যদিও হাতীবাক্যানে হাতীকে এবং বাগবাক্যানে মাককে মানালেও হয়ত মানাতে পারে। উটের অন্তে বেকবাক্যানেই প্রশংসা হান। সেখানে গিয়ে, সৌন্দর্য কেন, যে-কোনও জাতের প্রতিযোগিতায় তাকে পরাস্ত করা সম্পূর্ণ অসম্ভব, তা বাতুল না তার পিঠে আস্ত একটা কুঁড়।

কুঁড় বস্তুও আমার ঘোরতর আপত্তি আছে। উটের কোনও কুঁড়ই নেই। আর পর্বত কোথাও একদল বা অন্তত একটা চেন্টা-পিঠওয়াল উট কি কেউ দেখেছে ? কখনও নয়। উট মাজেরই পিঠটা ওই ধরনের, ওখানে কুঁড় পড়াতে যাবে কোন্‌ দুখে। কোনও দেশের দেশজ লোকের হুটো

পা যদি অস্বাভাবিক স্বীকৃত হয় তবে কি বলতে হবে যে সে দেশের ভাষার লোকের গোদ হয়েছে ? তা হতে পারে না, বরঞ্চ ওদের মধ্যে যদি ছুঁচাঙ্গনের পা সরু আর স্বাভাবিক থাকে তবে তাদেরই কোনও রোগ হয়েছে বলে ধরে নিতে হবে। হুতরাং কুজপৃষ্ঠ হাজনেহ ইত্যাদি বদ্ বিশেষণগুলির অন্তে উটেদের তরফ থেকে আমি তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করছি।

যে উট-হুহিতার পিঠে চড়ে ভৈরবী তীর্থবাজা করছেন, আরও করে তার নাম রেখেছেন উর্বশী। শুনেই হয়ত “নহু মাতা নহু কস্তা”-পড়ার মত মুখ বাঁকিয়ে বলবেন “এঃ, ছি ছি ছি।” বলুন তাঁরা একশ গুণা ছি ছি, বললেও ভৈরবীর বাহনের নাম তিনি বদলাবেন না, কিছুতেই তিনি মানবেন না যে উর্বশী মার বাধাটা একটু বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে গিয়েছে।

আর খাঁটি কথা বলতে গেলে বলতেই হবে—কে-ই বা চর্যচক্ষে দেখেছে উর্বশীকে ? বার বারটা প্রাণে চেয়েছে ঐ উর্বশী নামটি ঘিরে কল্পনার রঙীন স্বপ্ন দেখার সাধ মিটিয়েছে। অলস-প্রেরণাকে কল্পনা করতে গিয়ে তাঁর বাহনের অপরূপ রূপটাই যদি ভৈরবীর মনে ভেসে ওঠে তাতে ওদের আপত্তি করবার কি আছে। পৌচাৰ কথাটা ধরা যাক না। কুলী কাকেও বোঝাতে গেলে বলা হয় ‘পৌচাৰ মত দেখতে।’ অথচ এই পৌচাই বা লক্ষীর বাহন। বা লক্ষী নিশ্চয়ই পৌচাকে পৌচাৰ মত দেখেন না।

যাক, কথা হচ্ছিল উর্বশীকে নিয়ে। ভৈরবী বললেন, “ওর অন্তে মোটা করে ছুখানা কটি বানানো হোক বোজ।”

জলমহম্মদকে কথাটা বুঝিয়ে দিতে সে আকাশ থেকে পড়ল—উট খাবে কটি—ক্যা তাজব।

কিন্তু তাজবের আরও বাকি ছিল। শুধু কটিই আছে বাকি। ইতিমধ্যে ত্রিমতী উর্বশী খেজুর কিসমিস আখরোট বাদাম জড় সমস্তই চেখে দেখেছেন। জলমহম্মদের কাছ থেকে এই সংবাদ শুনে বললার, “তাৎ চেয়ে ওকে হুগাতি মোস্তা চর্বণটা দেখাও। একবারে রাহব হয়ে যাক।”

কে কার কথার কান দেয়, কুড়ীকে হকুম হয়ে গেল ভাল করে ছ'খানা কটি পোড়াবার জন্তে।

আজ দিনের বেলা আমাদের প্রধান কর্ম—সরকারী প্রতুরা কখন উপস্থিত থাকেন, শহরে গিয়ে তার খোঁজ নেওয়া। তাঁরা মেহেরবানি করে আমাদের নামখান লিখে নিয়ে কয় আদার করে কতকণে ছেড়ে দেবেন এই চেষ্টা করাই আজকের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন। বেলা আটটার পরই রূপলাল আর গুলমহম্মদ কাছারীর উদ্দেশ্যে বেরিয়ে গেল। ঘণ্টা দেড়েক পরে ফিরল এই সংবাদ নিয়ে যে ছপুরের দিকে আফিস খুলবে, সেই সময় লেখাপড়ার পালা শাক হবে।

ছপুয় ঠিক ছপুয়ের সময়ই উপস্থিত হল এবং কটি চর্বণের কর্তব্য সমাপ্ত করে জনা-মশ-বারো একসঙ্গে শহরে চলে গেল। ওরা ফিরে এলে বাকি আমরা সকলে বাব,—বাতে সন্ধ্যার পূর্বেই জমাখরচ করা শেষ হয় এবং সন্ধ্যার সময় আমরা বেরিয়ে পড়তে পারি।

ছপুয় গড়িয়ে গেল, এল বিকেল। হা-পিত্যোশ করে আমরা শহর পানে চেয়ে বইলাম। কেউ আর কেয়ে না। শেষে একলা গুলমহম্মদ ফিরে এসে ঘোষণা করলে যে আজ আর কিছু হবার আশা নেই। ছপুয়রা আজও অস্থগ্নিত। তবে কথা পাওয়া গেছে যে কাল সকালে অতি অবশ্য তাঁরা উপস্থিত থাকবেন এবং বখাবিহিত সরকারী কর্তব্য সম্পাদন করে আমাদের এ স্থান ত্যাগ করার অস্থমতি দেবেন। সেই সংবাদ শুনে, বারা নাম লেখাতে গিয়েছে—তাঁরা এখন শহর দেখে বেড়াচ্ছে।

তা বেশ করছে। কিন্তু এ ত মহামুশকিলেই পড়া গেল দেখছি। এই অনর্থক আটকা পড়ে থাকার কোনও মানে হয় নাকি? কাল সকালেই যে কর্তাদের দয়া হবে আর আমরা রেহাই পাব তাঁরই বা নিশ্চয়তা কোথায়। এখানে আমাদের ছ'জনের খাতিয়ে আরও ছ'জন লোক বাড়ল—স্থলান ত আছেই। মনে মনে ঠিক করলাম আরও কিছু আটা এখান থেকে জোটাতে হবে, তাঁরপর আর একখানা নুতন শাড়িও চাই। হিংসাজ পৌছে নুতন

কাপড় প'রে তবে দেবী দর্শন করতে হয় একত্রে একখানা করে নূতন কাপড় সকলেই সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছে। তা ভৈরবীর খানা ত বুড়ীকেই দিতে হল। আর একখানা না হলে সেখানে পৌঁছে করা বাবে কি ?

গুলমহম্মদকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলাম, কিছু আটা শহর থেকে কেনা যায় কিনা। করাচীতে ত র্যাশনের দৌরাণ্ডো এক হটাক বেশি পাবার উপার নেই। এখানে র্যাশন নেই, কিছু আটা হয়ত মিলতেও পারে।

বুড়ো উত্তর দিলে, “হজুর, আটা হয়ত পাওয়া যাবে, কিন্তু তা খাওয়া চলবে না। গম কিনে সকলে ঘরে ভেঙে নের। আটা এখানে বাজারে বিক্রয় না, যদি বা কোথাও মেলে তা একেবারে অখাদ্য। তার চেয়ে যদি আপনি এখানকার বানিরা মহাজনদের জানান, তবে অনেকটা আটা অমনিই মিলবে আর তা খাওয়াও বাবে।”

বললাম, “তা হয়ত মিলবে। কিন্তু করাচী থেকে আসরা যে র্যাশন নিয়ে আসছি এ ত সকলেই জানে, আবার এখানে তিকা চাইলে লোকে বলবে কি ?”

গুলমহম্মদ পাগড়ির মধ্যে হাত ঢুকিয়ে মাথা চুলকাতে লাগল। তারপর বললে, “দেখি কাল সকালে কতদূর কি করতে পারি।”

কিছুই ভাল লাগছিল না। সন্ধ্যা হয়ে এল, সেই সঙ্গে এল শহরে মশার। রাতের আহাট্টা ওরা কাল রাতের মত আজও ধর্মশালাতেই সাববে। তিনবেশী মাহুকের রক্তের ভিন্ন আশ্বাদ—মশারও মূখ বদলাচ্ছে।

ভৈরবীকে বললাম, “আজ রাতে কিছু খাব না, ছাতে উঠে শুয়ে পড়ব। তোমরা দুজনে কালকের মত ঘরের দরজা বন্ধ করে ঘুমিও। কোনও চিন্তা নেই।”

তিনি ইশারার জানালেন যে অতটা নিশ্চিত না হওয়াই উচিত। এখন উপরে গেলে দোষ নেই কিন্তু খানিক পরে সকলে ঘুমালে আমি যেন নীচে নেমে আসি। কালকের মত দরজার বাইরে আবার জন্মে একখানা কমল তিনি বিছিয়ে রাখবেন।

হাতের সিঁড়ি নেই। বন্ধির সিঁড়ির উপর ঝাড়াগে পাঁচিলের মাথা বুক পর্যন্ত উঠে। হাতে তর দিগে পাঁচিলের উপর উঠলাম। বন্ধির পূর্বদিক দিগে বুয়ে দক্ষিণ দিকের পাঁচিলের উপর দিগে গিয়ে ছাতের আলগে ধরে একটু চেঁচা করে উপরে উঠে পড়লাম। তারপর চান্দর বিছিরে আরায়ে শয়ন। সিঁড়ি না থাকার মশারা আর কষ্ট করে উপরে এল না, হ হ করে লম্বুরের হাওয়া আলগে, শরীর জুড়িয়ে গেল। চোখের পাতা জুড়ে এল।

দুই ভেঙে গেল একটা বুয় বুয় আওয়াজে। চোখ চেয়ে দেখলাম আকাশে কে যেন এক পৌচ আলকাতরা বেগে দিগে গেছে, একটি তারাও দেখা যায় না। বুক কাঁপানো আওয়াজটা আলগে বহুদূর থেকে। আলগে লম্বুর থেকে—লম্বুর গর্জাজে। কোমরে চান্দরখানা জড়িয়ে নিগে ছুটলাম ছাতের কিনারায়—এখন বস শীত নেবে পড়া যায়।

আলগের কাছে পৌছে নিচু হয়ে পাঁচিলের মাথা ঠাওয়া পেলাম না, এত অস্বকার। কি আপদ, এখন নামা যায় কেমন করে? একবার বিদ্যুৎ চমকাল—পাঁচিলের উপরটা দেখতে পেলাম। কিন্তু—ও কি! ওরা কারা ওখানে? পাঁচিলের বাইরে কটকের পাশে কে ওরা জ্বলন? আবার আকাশে ঝিলিক খেলে গেল। এবার আর চিনতে কষ্ট হল না—লালপাড় লাড়ি পরা একটি মেয়ের হাত ধরে একজন পুরুষ।

সর্বদা জলে উঠল। কি যেহারা, এতবড় ব্যাপারের পর ছোটো রাস্তাও সবুজ শইল না। ওই মেয়েটাই বা কতদূর যেইমান। পই পই করে ওকে বলে দেওয়া হয়েছিল যে রাতে দরজা খুলে বেরবার দরকার হলে যেন তৈরবীকে জাগায়। ঠিক চুপি চুপি উঠে তৈরবীকে না জাগিয়েই দরজা খুলে বেরিয়ে এসেছে। এখন যদি কেউ ধরে চুকে.....।

আর এক মুহূর্ত দেয়ী না করে আলগে ধরে বুয়ে পড়লাম। পারে পাঁচিল উঠল। লালপায়ে পা ধবে ধবে বন্ধির পর্বত এলাম, তারপর বন্ধির বুয়ে পূর্ব

দিকের পাঁচিলের উপর দিয়ে মন্দিরের সিঁড়ির উপর পৌঁছতে আর কতটুকু সময় লাগে। এখন সিঁড়ির উপর নেমে পড়লেই হয়।

কড় কড় কড়াৎ—কোথার একটা বাজ পড়ল। বিকট আওয়াজের থাকা সামলাতে পাঁচিলের উপরেই বসে পড়তে হল। যজ্ঞাঘাতের তীব্র আলোতে চোখে পড়ল কটকের পাশে ওয়া ছজন।

বসে রইলাম পাঁচিলের মাথার। শুনি না ওয়া কি বলাবলি করে। এমনও ত হতে পারে যে ছটোই আস্ত খড়িবাজ। পলার চাকু চালাবার মতলবে আছে।

কিছুই শোনা গেল না। বসে বসে খানিকটা এগিয়ে গিয়ে পাঁচিলের উপর শুয়ে পড়লাম। এইবার কিছু কিছু শোনা গেল। বা শুনলাম তা যে ভাবাতেই বলা হোক সেই অসহ্য কাকুতি কানে বাওয়ার বুকের তিতরটা পর্বত ঘোচড়াতে লাগল।

“হুঁয়ো না আমার।”

“কেন হোঁব না, কি হয়েছে তোমার? তোমার ছেড়ে কোথার বাব আমি? বাঁচব কেমন করে?”

“হুঁয়ো না বলছি, খবরদার।”

“দর কর, কুতী—দর কর। যা হয়েছে সমস্ত তুলে বাও। চল এখান থেকে পালিয়ে। যেখানে হোক দর বাঁধব—কেন তুমি অবুধ হচ্ছ?”

“বলছি, আর এগিও না—পথ ছাড়।”

“তুমি কি পাগল হলে কুতী? এরা তোমার কে? কাদের সঙ্গে তুমি যাচ্ছ? চল কালই আমরা পালাই।”

“সব দাঁড়াও বলছি বেইমান। মাইজী আগলে আমার সর্বনাশ হবে। যে চুলোর ইচ্ছা তুমি যাও, দূর হও।”

অসহ্য আর্তনাদ করে উঠল হোকরা। আবার যন্ত্রপাত হল। বিরমলকে ঠেলে কেলে দিয়ে ভিতরে দৌড় দিল কুতী।

প্রথমে একটা রকম হাওয়া পশ্চিম দিক থেকে পূর্বদিকে চলে গেল। এমনই সাংঘাতিক এক ঝাপটা যে, পাঁচিলের উপর থেকে আমাকে উড়িয়ে নিয়ে বাবার বোগাড়। প্রাণপণে পাঁচিলের মাথা আঁকড়ে পড়ে রইলাম। পরমুহূর্তেই আর একটা সেই রকমের ঝাপটা, তারপর একটার পর একটা। মুহূর্তমাত্র অপেক্ষা না করে পাঁচিলের পূর্বদিকে দেহটা ঝুলিয়ে দিলাম। তারপর দিলাম হাত ছেড়ে। সঙ্গে সঙ্গে পাঁচিলের বাইরে বালির উপর ধপ করে পড়লাম বলে। মাথার উপর প্রলয়কাণ্ড চলতে লাগল, পাঁচিলের আড়ালে বলে থেকে আমি খানিকটা রক্ষা পেলাম।

কিন্তু এরা গেল কোথা? মেয়েটা ত ভিতরে চলে গেল, বিক্রমলের হল কি? সেও কি ভিতরে গেল না কি? আর একবার পর পর তিনটে ঝিলিক দিল আকাশে। সেই আলোর দেখলাম—খাড় হেঁট করে সামনে ঝুঁকে ঝড়ের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে বিক্রমল প্রাণপণে এগিয়ে বাবার চেঁচা করছে সমুদ্রের দিকে।

উন্টো দিক থেকে প্রচণ্ড বিক্রমে হাওয়া ঘুরে এল। আরম্ভ হল মাতামাতি। পূর্বদিক থেকে হাওয়া যে মুহূর্তে ফিরল, পশ্চিমের থেকে পূর্বগামী ঝড়ের সঙ্গে হল তার সংঘর্ষ—একেবারে মহাপ্রলয় শুরু হয়ে গেল। হাওয়ার হাওয়ার বালুতে বালুতে ঝাপটাঝাপটি নিয়ে ঘূর্ণতে পরিণত হল। একটার সঙ্গে সঙ্গে আর একটা, তারপরই একটা, এইভাবে একটানা বিজ্যং চম্কাতে লাগল। চতুর্দিক আলোয় আলো। রাশি রাশি বালু পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে ঘুরতে ঘুরতে মহাপ্রলয়ে উঠে পরস্পর লড়তে লাগল। ফলে যেন ঘন-কুয়াশায় চারিদিক ঢেকে গেল। চোখ মেলে কিছু দেখা যায় না। তারই মাঝে আবার দেখলাম ধর্মশালার উত্তর দিকে ঘুরে ওধারে বাবার জন্তে চেঁচা করছে বিক্রমল।

বতদূর গলার জ্বলাল চীৎকার করে ডাকলার, “বিক্রমল!” বিক্রমল ধর্মশালার উত্তর দিকে অদৃশ্য হল

চলল কোথায় সরতে হতভাগ! এ সর? এখন বাড়িটার পশ্চিম দিকে গিয়ে পড়া যাবে সাক্ষাৎ আশ্রয়ত্যা। হাওয়াওড়ি দিয়ে পেটের ওখারে এগিয়ে গেলাম। পূর্বদিকটা পার হয়ে ধর্মশালায় উত্তরপূর্ব কোণায় এসে দেখলাম— উন্মাদ মাঠের মাঝে নেবে গড়েছে—তার গতি সমুদ্রের দিকে।

ছুটলার তার পিছু পিছু।

এইবার আরম্ভ হল লড়াই ঘূর্ণির সঙ্গে আর বালুর সঙ্গে। হাত ত্রিশ চল্লিশ সায়নে বিরমল। সেও সরিয়া হয়ে সায়নে হুঁকে সমানে এগিয়ে চলেছে। বড়ের চোটে মাটির উপর পা রাখাই দার, এক পা এগিয়ে বাওয়া ত দূরের কথা, সোজা হয়ে দাঁড়াবার উপায় আছে নাকি। কাপটার উন্টে কেলে দিতে চায়।

চড়বড় চড়বড় শব্দে বড় বড় কোঁটা তীরের মত গারে বিধতে লাগল। তারপর বা আরম্ভ হল তাকে বুট বলা চলে না। বিরাট বিরাট বালতি করে রাশি রাশি জল কারা যেন ছুঁড়ে মাঝে। জলের তোড়ে দম বন্ধ হবার উপক্রম।

সেই ঠেলাড়ে জলের ভরে বালুয়া পুনরায় ধরার বুকে আশ্রয় নিল। হাওয়াও তখন আশ্রয়কা করতে উল্লসিত পালিয়ে গেল। কিন্তু পালাবে কোথা? সেই জ্যাক জলপ্রপাত হাওয়ার পিছু পিছু ধাওয়া করল। চোখের উপর দেখলাম বড় আর তার পিছু পিছু জল ছুঁই পূর্বদিকে প্রাণপণে ছুটে বেরিয়ে গেল।...

হঠাৎ একেবারে সমস্ত কঁাকা—এত বড় কাণ্ডটা যেন তেঁকিবাড়ি। কেবল-মাত্র মাথার উপর আকাশে এখার থেকে ওখার বার বার তীব্র চোখ-ধাঁধানো আলোর বল্কানি খেলতে লাগল। তখনও সমানে আগে বিরমল আর পিছনে আরি ছুটছি।

আবার চীৎকার করে উঠলার : "বিরমল থামো—দাঁড়াও বলছি— বিরমল!"

কে কার কথা শোনে। সাধা গভিরেছে ব্যাটার। এবার নির্ধাৎ মরবে।
পিছন কিরেও তাকান না।

ভয়ানক বাগ চড়ে গেল। শেষ চেষ্টা করলাম তাকে ধরবার। প্রায়
কাছাকাছি পৌছেছি এমন সময় সে বামদিকে ঘুরে দৌড়তে লাগল।

মাথার তখন খুন চেপে গিয়েছে। দাঁতে দাঁত চেপে আরও কয়েক পা ছুটে
এক লাফে তার পিঠের উপর গিয়ে পড়লাম। দুজনেই পড়লাম বাগির উপর
শুঁজড়ে। ঠেসে ধরে মবারম গোটাকতক কিল তার পিঠে বসিয়ে দিয়ে চুলের
মুঠি ধরে টেনে তুলে দাঁড় করলাম।

হাঁপাতে হাঁপাতে মাথার কয়েকটা ঝাঁকি দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম - “কোথায়
যাচ্ছিল মরতে হারামজাদা?”

সমুদ্রের উপর আলোর ঘোশনাই বেলে গেল। বিরমল ‘হা হা হা হা’ করে
একটানা বিকট হাসতে শুরু করলে। সতরে হাতের মুঠো থেকে তার চুল ছেড়ে
সিঁলান। তার মুখের উপর, তার অলস চোখের নিকে চেয়ে দেখি—এ যে সম্পূর্ণ
উন্মাদের দৃষ্টি। ‘হা হা হা হা’ করে বিরমল হাসতেই লাগল। তারপর সে
নিজের হৃদয়ে মুখ ঢাকা দিল। কিন্তু সেই উচ্ছল হাসি থামল না।

হাসছে বিরমল। সামনে হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে আছি। ওর পিছনে
পাহাড়ের মত ঢেউ তুলে সমুদ্র আমাদের দুজনেই গ্রাস করতে ভেঙে আসছে।
আলোকাত্তরার মত কালো সেই ঢেউয়ের মাথায় লাল কেনা অঙ্ককারের মাকে
জিল জল করছে। বেন বিরাট আকৃতির দৈত্যেরা মাথায় কপার মুকুট পরে
সদন্তে এসিয়ে আসছে, এখুনি আমাদের দ’লে পিবে শুঁড়িয়ে কেলবে।

সমুদ্রের জল তখনও অনেক দূর। কিন্তু সেই নিবিড় আঁধারের মাঝে লাগর-
বেলার দাঁড়িয়ে পশ্চিম নিকে চোখ পড়তেই মনে হল ঐ যে বড় ঢেউটা ছুটে
আসছে ওটা নিশ্চয়ই আমাদের উপর এসে ভেঙে পড়বে। আর চেয়ে দেখবার
সাহস হল না। বিরমলের একটা কজি শক্ত করে ধরে তাকে টানতে টানতে
ছুটলাম ধর্মশালার নিকে।

জোরে চলবার কি আর তখন সামর্থ্য আছে। কোন স্বকরে তাকে টেনে নিয়ে চলেছি। আকাশ আবার তারার তারার ছেয়ে গিয়েছে। চতুর্বিধ শাস্ত শুরু। পিছনে গভীর গর্জনে একটার পর একটা ডেউ ডেউ পড়ছে। সেই এবড়োখেবড়ো প্রান্তরের বুকে যাত্র আমরা দুটি প্রাণী। চলেছি আন্দাজের উপর নির্ভর করে ধর্মশালার উদ্দেশে। বিরমলও আর হাসছে না। গা ছনছন করতে লাগল।

প্রথম উত্তেজনার ঝড়ের মধ্যে বিরমলের পিছু পিছু বখন ছুটছিলাম তখন খেয়ালই হয় নি কতদূর গিয়ে পড়ছি। কেবলমাত্র সময় বেধি পথ আর কুয়ো না। একবার মনে হল—তুল কবে অতদিকে যাবি না ত। তানদিকে ঠাহর করে দেখলাম, বুঝে শোনবেগীর ঘরবাড়ি। আরও বানিকটা এগিয়ে দেখতে পেলাম—গোটা তিনেক হারিকেন লঠন নিয়ে কায়া ঘন এদিকেই এগিয়ে আসছে।

চীৎকার করে ডাকলাম—“রূপলাল! তুলমহমদ!” ওখার থেকে একসঙ্গে বহু গলার স্বর ভেসে এল। আলো আর লোকজন আমাদের দিকেই আসতে লাগল। আরও কাহাকাহি পৌছে ওরা আমাদের দেখতে পেলো। দৌড়ে এনে তুলমহমদ আমাদের হুঁহাতে বুকে আঁকড়ে ধরলো।

তার আনিবর হাড়াতে হাড়াতে সকলে এনে ঘিরে কেললো। ভৈরবী আমার একখানা হাত চেপে ধরলেন। তার মুখ দেখা গেল না কিন্তু বেশ বুঝলাম তিনি খরখর করে কাঁপছেন।

জিজ্ঞাসা করলাম “কুতী—কুতী কই?” কুতী ভৈরবীর পিছনেই ছিল। সাধনে এল। বিরমলের হাতখানা তার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললাম—শক্ত করে ধরে রাখ, ছেড়ে দিলেই পাকিরে বাবে, একেবারে পাগল হয়ে গেছে।”

হঠাৎ বিরমল আবার সেই অর্থহীন বিকট হাসি হেনে উঠল ‘হা হা হা হা’। সতর্কতার হাত ছেড়ে দিয়ে কুতী পিছিয়ে গেল। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে

পোপটতাই বিকসনের কাঁথের উপর হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে এগিয়ে নিয়ে চললেন।

পূর্বের আকাশে তখন কিকে শাদা রঙ ধরতে শুরু করেছে। আমরা ফিরলাম।

ন দশ ঘণ্টা পরে জিনিসপত্র বাঁধা-ছাঁদা করে ‘জয় হিংলাজ মাইকী’ ধ্বনি দিয়ে শোনবেগী ধর্মশালা থেকে আমাদের দুই দিন দুইরাতে গৃহস্থালির ইতি করা হল। কয়েকজন আরোয়াদী তত্রলোক অনেকটা পথ সঙ্গে এলে আমাদের এগিয়ে দিয়ে গেলেন। গুলমহম্মদ এঁদের কি বোঝাল সেই জানে। আটা আরও আধ-ঘণ্টাক বৃদ্ধি হল। আরও একটি জিনিস বৃদ্ধি হল, সেটি হচ্ছে—ভাকাতের সঙ্গে লাক্ষাং হবার ভয়।

নাথ লেখাড়ে গিয়ে ঠাঁয় সঙ্গে দেখা হল তিনি এখানকার উচ্চদের শাসন-কর্তাদের একজন। সাধারণ মানুষের চেয়ে সাধারণ তিনি হাতখানেক বেশি উঁচু। চেহারা অনেকটা তাঁর তলোয়ারের মত দেখতে। ছুঁচালো দাড়ির উপর নাকের নীচেটা কামানো অন্ন গোঁফের লম্বা রেখা, তার উপর মানানসই তীক্ষ্ণ নাসিকা। নাকের উপর দিকে ছুপাশে লম্বা, বাকের বলা হয় পটলচেরা, এই মকম দুই চকু। এই লম্বা মিলিয়ে তাঁর মুখের বিশেষ করে তাঁর চোখের দুটির, একটা ধার আছে। দেখামাত্রই মনে হবে যে এই লোকটি আর তাঁর পাশে ঝোলানো দীর্ঘ বাঁকা তলোয়ারটি একই জাতের। কোনও কিছুকে বেমানাম হু-আধখানাতে পরিণত করা এঁর আর এঁর ওই অস্ত্রের কাছে একে-বারে ছেলেখেলা।

বাঁ সাহেব বললেন, কিছুদিন ধরে শহরের আশেপাশে শুগুরি রাহাজানি চলছে। আমরা যখন জিশ জনেরও বেশি একদলে চলছি তখন তারা আমাদের কাছে যেকতে সাহস করবে না, কারণ বড়দুর্ তীরা সংবাদ পেয়েছেন তাতে ছুঁচুরজনের বেশি লোক এ কার্য করেছে বলে মনে হয় না। লোকগুলো

বিশেষ, মরুত বৃক্ক লুকিয়ে বেড়াচ্ছে আর সুবোধ পেলে পথিকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে।

আমরা বিক্রমলের কাহিনী চেনে গেলাম। কি জানি এঁদের জানালে যদি আটকা পড়তে হয়।

খাঁ সাহেব ওলমহম্মদ আর মিলমহম্মদকে উপযুক্ত উপদেশ দিলেন। অতি মোলারের উপদেশ, যদি ছশমনদের দেখা মেলে তবে বেন একেবারে তাদের নিকশ করে দেওয়া হয়।

আড়মি সেলাম ঠুকে ওলমহম্মদ বললে, “তোবা তোবা, সে কথা কি আর বলতে। কুস্তারী আমাদের মুহূকের হনার নষ্ট করছে হজুর।”

হজুর প্রত্যেক কুপওয়ারালাকেও এই সংবাদ জানাতে আদেশ করলেন।

কর জমা দিবে নাম, বাপের নাম, খানা জেলা ইত্যাদি লিখিয়ে আমরা শোনবেগী ছাড়বার হজুর পেলাম।

তারপর কি আর সব্ব নয়। রাজা-খাওয়ার রাজা-খোওয়ার যেটুকু সময় লাগল। বেলা তিনটে নাগাদ ছড়ি উঠল।

শোনবেগী থেকে বেরিয়ে হিংলাজ ঘুরে পুনরায় শোনবেগী না পৌঁছনো পর্যন্ত আর আমাদের হাতের তলার মাথা দিতে হয় নি। এর পর প্রত্যাহ বেলা পড়লে রাজা আরম্ভ করে প্রায় শেষ রাজি পর্যন্ত চলে কুরোর ধারে পৌঁছে খোলা আকাশের তলার পড়ে থাকতে হয়েছে, বতকণ না উটেয়া বেয়ে-বেয়ে ঘুমিয়ে জিরিয়ে আবার চলতে শুরু করেছে। আলল কথা, এ রাজার উটের মজিই হচ্ছে একমাত্র জিনিস যার উপরে কোনও আগিল চলে না।

প্রকৃত হিংলাজের পথ এখান থেকেই আরম্ভ। গত বুধবার বৈকালে আমরা করাচী জ্যাগ করি আর আজ সোমবার শোনবেগী ছেড়ে চলেছি। লোকালয়ের সঙ্গে সখর এইবার সত্যসত্যই হুচল। সামনে শোনবেগী নামে এক শহর আছে, সেখানে পৌঁছলে লোকের মুখ দেখতে পাওয়া যায়, করাচী

থেকে বিদায় নেবার সময় এটা একটা কতবড় আশার কথা ছিল। এবার আর সেটুকুর সম্ভাবনা সামনে কোথাও না থাকার বাজাকালে মন বেশ ভারী হয়ে উঠল। একটা বালুর টিলার মাথার দাঁড়িয়ে সমস্ত চলটাই দেখতে পেলাম। সকলের পিছনে থাকার টিলার মাথার দাঁড়িয়ে সামনে সকলকেই লম্বা লম্বি দিয়ে নেমে যেতে দেখলাম। দেখলাম—মুখে পড়েছে, সকলেই বেশ মুখে পড়েছে।

মাছুষ যেখানে নেই, দেবতার টানে সেখানে অগ্রসর হওয়া অতটা সহজ নয়। মাছুষের কাছে মাছুষের না দেবতার কার আকর্ষণের শক্তি অধিক তাই চিন্তা করতে করতে দলের পিছু পিছু অগ্রসর হলাম। ফেলে-আসা পিছনের টান টানতেই লাগল পিছন থেকে। কিন্তু এখন কি আর কেবলার উপায় আছে।

আমাদের এবারের লক্ষ্য—চন্দ্রকূপ। চন্দ্রকূপ-বাবার হুঁচক মিললে তবে হিংসাজ। অর বাবা চন্দ্রকূপ।

সমুদ্রে বাসে রেখে আমরা চলেছি। কিছুক্ষণ পর পরই পিছন দিগে পোনবেগীকে দেখে নিচ্ছি। ক্রমে ধর্মশালার ছাত্ত অদৃশ্য হয়ে গেল। এখন শুধু দেখা যাচ্ছে রামসীতার বন্ধিরের ছোট্ট রক্তপতাকাটিকে। উচ্চ দণ্ডের মাথার আরও কিছুক্ষণ সেই পতাকাটি দেখা গেল। ভৈরবীকে জিজ্ঞাসা করলাম—ধর্মশালা এখনও দেখা যায় কিনা। উটের পিঠে অনেক উর্ধ্ব থাকার আরও কিছুক্ষণ তিনি দেখতে পেলেন। তারপর পোনবেগীর সঙ্গে লব্ধ হের হল।

অনেক আগে থেকেই রূপালার গীত ভেসে এসে। দলের লবীয়ে হুড়ি বাড়ে সে চলেছে। তার পিছনে পোপটলাল আছেন, তাঁর হেফাজতে হুড়ী আর ঝিকঝল। হুড়ী নিছের ছাপানো শাড়িখানি পরেছে খাঁচল কোমরে জড়িয়ে। মাথার তার ঘোমটা নেই। এ তার আর এক রূপ, কেন সে দলের সকলের ছোট বোনটি। কোন জড়তা নেই, অনাবস্তক হুড়ীর বা লজ্জার লেশ-মাত্র বালাই নেই। আনন্দের লাবণ্যের প্রাণচকল কল্যাণবরী প্রতিমাখানি।

ধিকমলের হাত ধরে চলেছে কুস্তী। মাঝে মাঝে বিকট হান্ত করা ছাড়া আর কোনও বাস্তবিক নেই ধিকমলের। কথাও বলে না, চোখও চায় না। যদি বা কখনও চোখ চায় তবে কি দেখছে কাকে দেখছে বোকা শক্ত। ক্যাল ক্যাল করে নিরর্থক বহুদূরে একভাবে চেয়ে থাকে। কুস্তী যে তার হাত ধরে নিয়ে চলেছে এও সে জানে না। কুস্তীর দৃঢ় বিশ্বাস একবার চক্রকূপ বাবার কাছে ধিকমলকে নিয়ে যেতে পারলে সব গোলমাল মিটে যাবে। যে জোঁট থাকিয়েছে ধিকমলের জীবনসূত্রে তা খুলে যাবে। অন্তত কুস্তীকে চিনতে পারবে সে।

ওদের পিছনে সকলের-খাড়া-পিঠে-বাঁধা বড় উটটার দড়ি ধরে হিলমহম্মদ চলেছে, তারপর বলের অন্ত সকলে বাড়ে-কুঁজো হাতে-লাঠি পন্ন করতে করতে অগ্রসর হচ্ছে। সর্বশেষে হিলমহম্মদ আমাদের উর্বশীর নাকের দড়ি নিজের কাঁধে ফেলে যাচ্ছে—উপরে ভৈরবী হেলতে তুলতে সুপারি দোকা চর্কণ করতে করতে টাল সামলাচ্ছেন। পিছনে সুখলালের কাঁধে হাত দিয়ে আঁচি হাঁটছি।

সমুদ্রের কিনারায় কিনারায় পথ, তা'বলে হাত বাড়ালেই জল ছোঁয়া যাবে না। জল এক মাইলের বেশি দূরে এসে আছড়ে পড়ছে। ঘণ্টা দুই চলবার পর জল আরম্ভ হল। বেশ বড় বড় গাছ। এবার মাথার উপরে ছায়া পাওয়া গেল। বাবলা আর নোনাগাছই বেশি, আবার দু'চারটে তেঁতুলগাছও আছে। আর একরকম গাছ দেখলাম অনেকটা ছাতির গাছের মত দেখতে। হিলমহম্মদ বললে তারা এ গাছকে শিপড়ী বলে।

সেই গাছপালার ভিতর দিয়ে ক্রমে আমরা উচু দিকে উঠতে লাগলাম। বেশ চড়াই আরম্ভ হল। নানা জাতের পাখী বহা শোরগোল করে মাথার উপর গাছের ডালে কিরে আসতে লাগল। পাখীদের আঁকের মত ঘুরে বেড়ানো শেষ হল।

জঙ্গলের অন্তে সমুদ্র আর দেখা যাচ্ছে না কিন্তু তার গর্জন শোনা যাচ্ছে। মাঝে মাঝে উপর থেকে জল গড়িয়ে নেমে আসছে; উপরে কোথাও বোঝ

হয় জল রয়েছে। এটা একটা ছোটখাট পাহাড় না কি ঠিক বুঝতে পারছি না। পাথর একখানাও চোখে পড়ছে না। সমানে চড়াই ভাঙছি। সন্ধ্যা পর্বত সেই ভাবে উচুতে ওঠার শেষ হল না, তবে জল ধীরে ধীরে ফাঁকা হয়ে এল। আমরা উঠতেই লাগলাম।

অবশেষে সেই চড়াইএর মাথায় উঠে খানিকটা ফাঁকা জায়গা পাওয়া গেল। সেখানে দাঁড়িয়ে বামে অনেক দূরে অনেক নিচুতে দেখা গেল সমুদ্র। আর দেখা গেল সমুদ্র বেখানে আকাশের সঙ্গে মিশেছে সেখানটার সমুদ্রের ভিতর থেকে একটা প্রকাণ্ড গোল রক্তবর্ণ ছটা আকাশের অনেক দূর পর্বত রাঙিয়ে তুলেছে।

আপনা থেকে সকলের হাত জোড় হয়ে কপালে এসে ঠেকল। সেই অনির্বচনীয় ব্যাপারটা আর ইজিতে ঘটেছিল তাঁকেই বোধ হয় আমরা প্রণাম জানালাম।

শ্রীজগদীশ্বর মুরারজী পাণ্ডে মহাশয় ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি। কাশিওয়ার্ডের জায়নগর থেকে তিনি এসেছেন। এসেছেন তীর্থদর্শনের সবটুকু পুণ্য চেষ্টে-পুটে সঙ্গে নিয়ে ফিরবেন এই সং বাসনাটুকু সঙ্গোপনে বুকে পুরে নিয়ে। এক তোলা এক রত্তি পুণ্য যদি কোনও ফাঁকে কোথাও পড়ে থাকে বা হরত তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিও এড়িয়ে যাবে এই আশঙ্কায় তিনি সর্বদাই শশব্যস্ত।

এরও পরে আর এক বিপদ আছে, আর সে বিপদের ভয় পদে পদে। কথাটা হচ্ছে একমাত্র তিনিই ব্রাহ্মণ আর বাদবাকি দলহীন আমরা কেউ ব্রাহ্মণ নই। কি কি করলে জাতি-রক্ষা হয় এবং কি কি না করলে জাতি-রক্ষা হয় না, এ সমস্ত শাস্ত্রীয় অহুশাসন শুধু তাঁর কঠিনই নয় একেবারে জিহ্বাগ্রে বিবাজ করছে। এই ধর্মের মধ্যেই জনা-ছন্ন-সাত তাঁর শিষ্যসেবক চলেছেন। সশিষ্য ছর্বাসার মত সশিষ্য পাণ্ডে-মহারাডের শাস্ত্রজ্ঞান এবং সেই জ্ঞানের

আলোর তীব্র ঝাঁচ মরুভূমির সূর্যের ভেজ আর বাসুর উত্তাপকেও সময় সময় ছাড়িয়ে যাচ্ছে।

আমার উপরে তাঁর খাটখাটা ভাল-মন্দ ছুই তবুই অতিক্রম করে এমন একটা স্থানে নেমে গেছে যে আমার অতিবড় নিশ্বাসও তাঁর সেই সমস্ত অভিমত শুনে আমার অন্তে হার হার করে উঠবে। শ্রীপাণ্ডে মহারাজ শাস্ত্রবাক্য উদ্ধার করে সকলের কাছে সর্গোত্তরে প্রমাণ করে ছেড়েছেন যে ঘোর কলিকালে আমার মত পায়ও নাকি হুঁচকারে জন্মাবে। এ কথা বহুকাল পূর্বে পুণ্যপাদ শাস্ত্রকার মহোদয়গণ লিখে রেখে গেছেন। তাঁদের লিখন পাছে মিথ্যা হয় এই ভয়েই শ্রীভগবান আমার মত মহাপাপীর সৃষ্টি করেছেন। এই যে শুভমহম্মদের হাত থেকে চা নিয়ে পান করছি, জলও প্রায় ওরাই তুলে এনে দিচ্ছে, কুঁজো ত ছুঁচ্ছেই—এ সমস্ত কর্মগুলি শুধু শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্যেই করে মরছি। শুনতে শুনতে মনমরা হবে আছি—এবং শ্রীভগবানের ইচ্ছাই পূর্ণ হোক এই প্রার্থনা করছি।

সকলের হোঁওয়া-ছুঁয়ির নাগালের বাইরে শ্রীপাণ্ডে নিজের জল নিজে আনেন—নিজের কুটি নিজেই পোড়ান। বাকি সময়টুকু চলতে কিরতে উঠতে বসতে নিজের শিষ্যসেবকদের শাস্ত্রীয় উপদেশ দান করেন। পাছে কোনও রকমে তাঁর জগবিজ্ঞ গুণীর মধ্যে পা দিয়ে ফেলি এই ভয়ে আমরা সন্মাই মনস্তিত। কিন্তু আমরা সাবধান থাকলে হবে কি—আর এক আপদ সেই গণ্ডী ডিড়িয়ে পাণ্ডে মহারাজকে পাকড়াও করলে। দেখি, মাঝেমাঝেই আমাদের কিছুক্ষণ করে বিজ্ঞান করতে হচ্ছে, বানে, এক-একবারে প্রায় অর্ধ ঘণ্টার মত। ব্যাপার কি?

পাণ্ডে মহারাজ মৃত রাস্ত থেকে বারংবার জললে যাচ্ছেন।

দূর থেকে দেখতে পেলাম তিনি কিরে এলেন। বজ্রধার রেখা তাঁর মুখে ফুটে উঠেছে। কিরে এলে পুনরায় কুঁজো খাড়ে করে হাঁটতে লাগলেন। আমার আমরায় অগ্রসর হলাম।

মুখোচ্চিত গাভীর্ষের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণলাল ছড়িওয়ালার ঘোষণা করলেন—আমাদের তীর্থযাত্রার প্রথম দর্শন, স্পর্শন এবং দান-সংকীর্ণা করবার স্থান আগত প্রায়। সামনের পাহাড়টার ওপরে পৌঁছলেই আমরা শ্রীশ্রীগুরুশিষ্যের পবিত্র স্থানে উপস্থিত হব। এই যাত্রার এই প্রথম পুণ্যকর্ম প্রায় নাপালের মধ্যে এসে গেছে এ কথা শুনে সকলেই একটু চাফা হয়ে উঠল।

কেবল পাণ্ডে মহারাজ ঘোরতর অসন্তোষ প্রকাশ করতে লাগলেন। তাঁর শাস্ত্রে নির্দেশ দেওয়া আছে যে জান করে অতুচ্চ অবস্থার দর্শনাদি পুণ্যকার্যগুলি করা বিধেয়। অথচ খেয়ে দেয়ে রাতের প্রথম প্রহর পার করে আমরা গুরুশিষ্যের স্থানে পৌঁছছি। এটা মহা অশ্রদ্ধা এবং অশাস্ত্রীয় কাণ্ডকারখানা হতে চলেছে। আমাদের উচিত ছিল—এমন সময় যাত্রা করা যাতে গুরুশিষ্যের দর্শনটা শাস্ত্রের নির্দেশানুযায়ী হয়। অর্বাচীন ছড়িওয়ালারা এখন জানতই যে সামনে গুরুশিষ্যের দর্শন রয়েছে তখন তার উচিত ছিল—বজ্রমানদের জান করিয়ে উপবাস করিয়ে নিয়ে এসে দর্শন করানো। দর্শন হলেও সবটুকু পুণ্য বন্ধ হতে না—একত্র মহাবিরক্ত হয়ে তিনি গজগজ করতে লাগলেন।

তখন পশ্চিম আকাশের শেষ প্রান্তে সেই গেকরা রঙের ছটাটা সমুদ্রের মাঝে তলিয়ে যাচ্ছে।

যেখানে দাঁড়িয়ে আমরা সূর্যাস্ত দেখবার তার ডান দিকে আর একটি বড় পাহাড় মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। সেই পাহাড়ের উপর দিয়ে এক সোজা পথ চলে গিয়েছে পাহাড়ের ওপারে। যদি ঐ পথে আরও বানিকটা কঠিন চড়াই ওঠা যায় তখন পাহাড়ের মাথায় পৌঁছে আরম্ভ হবে সোজা উৎরাই। ঐ পথে গেলে পাহাড়টা ভিতরে লাগবে বড়জোর দু'ঘণ্টা। গুরুশিষ্যের স্থানে পৌঁছতে সেই পথ সোজা এবং সংক্ষিপ্ত।

কিন্তু লটবহরহুট উট ঐ পথে উঠতেও পারবে না, নামতেও পারবে না। উট বাবে বাম দিক দিয়ে নেয়ে সমুদ্রের কিনারায়। নেয়ে গিয়ে বড় পাহাড়টাকে ঘুরে ওপারে পৌঁছতে চার ঘণ্টার খাফা। কৃষ্ণলাল প্রস্তাব করলেন—সে

ডাইনের চড়াইয়ের পথ ধরেই বাবে, তাতে ওপারে পৌঁছে খটা ছই আরাবলে আরাব করা বাবে। পথ ভুল হবার কোন সম্ভাবনা নেই। পারে চলা নক পথ একেবারে সোজা পাহাড়ের মাঝার চলে গিয়ে ওপারে নেমে গিয়েছে। আর এ পথে সে কয়েকবার এসেছে—গেছেও। হুতরাং বাবা তার সঙ্গে গিয়ে আরাবলে আরাব করবার বাসনা রাখে, তারা চলে আসতে পারে।

দেখা গেল সে বাসনা আছে সকলেরই, কিন্তু সবাই গেলে চলে কি করে উট ছেড়ে। ভৈরবী হাঁটতে পারেন না, তার উপর চড়াই ভেঙে ওঠা তাঁর পক্ষে সম্ভবই নয়, হুতরাং আরাব ধাকড়ে হল উটেদের সঙ্গে। পোপটলাল আমদের বল ছাড়লেন না কারণ বিরমলকে নিয়ে চড়াই ভাঙতে তাঁর সাহস হল না—কখন তার কি খেয়াল হবে, কি করে কবে তার ঠিক কি। গুলমহম্মদ আর মিলমহম্মদের সঙ্গে আরাব চারজন রইলার—পোপটলাল, বিরমল, কুতী আর আরি। উট দুটি আর তাদের উপর হালপত্র ও ভৈরবী, এগুলি সামলে নিয়ে আরাব ধীরে ধীরে বাবে নেমে যেতে লাগলার।

ওরা হৈ হৈ করে রূপলালের পিছন পিছন তানদিকের নক পথে অদূর হল। ঠিক রইল ওপারে পৌঁছে শুকশিত্তের স্থানে ওরা অপেক্ষা করবে বতকণ না আরাব গিয়ে পৌঁছই। তারপর বর্ণনাদি সমাপন করে আরাব একসঙ্গে চলা হবে।

আরও কিছুদূর নামবার পর আরাব একটা গলির মত নক রাস্তার গিয়ে চুকলার, হু'দিকেই পাহাড়। একটি জলের ধারা তার ভিতর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। মনে হয় জলধারাটির ক্ষেত্রেই এই পথের স্রুটি হয়েছে। ঘোর অন্ধকারে সেই নক পথ দিয়ে অতি সাবধানে পা কেলে আরাব চলতে লাগলার, বাবে নেমে যেতে লাগলার।

গলিপথটা শেষ হতে বেশি দেরী হল না, আর কিছুদূর গিয়েই বাসদিকটা পরিষ্কার হয়ে গেল। আরাব লক্ষ্য দেখা গেল। আরও এক খুঁটার উপর সরাসরি উঠাই পাওয়া গেল। অবশেষে সবতল ভূমিতে সবুজের চড়াই

আমরা নেমে এলাম। এইবার আমাদের ডানদিকে ঘুরে বড় পাহাড়টার ওপারে যেতে হবে।

ঠিক যেখানে আমাদের ডান দিকে ঘুরতে হবে সেই কোণটার একখানা বড় পাথর পাহাড়ের গা থেকে বেরিয়ে অনেক উচুতে ঝুলে আছে। তার নীচে দিয়ে রাস্তা—অনেকটা গাড়িবারান্দা-ঢাকা ফুটপাথের মত। গুলমহম্মদ বড় উটটাকে নিয়ে সামনে চলছিল—সে প্রথমে কোণটা ঘুরে গেল।

পরমুহূর্তেই টেচিয়ে উঠল—“কে, কারা ওখানে?” আমরা ধম্কে দাঁড়িয়ে পড়লাম। আবার শোনা গেল গুলমহম্মদের ঐ এক প্রশ্ন।

উর্বশীর হাড়িগাছা আমার গারে ফেলে দিয়ে দিলমহম্মদ ছুটে গেল কোণটা ঘুরে। ভাড়াভাড়ি আমরা পা চালালাম।

কোণ ঘুরতেই দেখা গেল রাস্তার উপর বড় উটটার গলার নীচে দাঁড়িয়ে গুলমহম্মদ। আরও খানিকটা সামনে ডানদিকে পাহাড়ের কোল ঘেঁষে কারা বেন বসে রয়েছে। অঙ্ককারে কতজন বোকা গেল না, ওখান থেকে একটা স্পষ্ট গোঙানি কানে এল। কে বেন মরণ-বজ্রণার আর্তনাদ করছে।

দিলমহম্মদ সেইদিকে এগিয়ে গিয়েছে। একটা ধমক দিয়ে সে জিজ্ঞাসা করলে, “উত্তর নাও বলছি, তোমরা কে?”

কোনও উত্তর নেই—কেবল সেই অসহায় আর্তনাদ ছাড়া কোনও লাড়াশক পাওয়া গেল না।

বড় উটের পিছনে গিয়ে ছোট উট খামল। আমাদের আলো ভৈরবীর খাটির পারায় বাঁধা ছিল। দেশলাইটা তাঁকে দিয়ে ওটা জ্বালাতে বললাম। তিনি আলো জ্বলে ঝুলিয়ে দিলেন—পোপটলাল সেটা ধরে নিয়ে এগিয়ে গেলেন। আমি উটের হাড়ি ধরে দাঁড়িয়ে আছি।

বড় উটের পাশ দিয়ে পোপটলাল সামনে গিয়ে পড়তেই গুলমহম্মদ প্রচণ্ড ধমক দিলে, “এগিও না, খবরদার!” সেই ধমকের সঙ্গে সঙ্গে অঙ্ককারের ভিতর থেকে একটা লোক ছিটকে উঠে বেনমহম্মদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল;

নিমেষ মধ্যে লঠনের আলোর গুলমহম্মদের টাঙ্গির কলাখানা বলক দিয়ে উঠল। বুড়ো লাকিয়ে পড়ল সামনে। পর মুহূর্তেই একটা মরুভূমি চীৎকার পাহাড়ের মধ্যে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল।

আমার ঠিক পিছনেই কুস্তী চীৎকার করে উঠল। এক ঝটকায় তার হাত থেকে নিজের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বিরমল তীব্রবেগে ছুটে গেল সেই দিকে। সমুদ্রে দেখলাম—একখানা প্রকাণ্ড ছোরা হাতে আর এক মূর্তি অন্ধকারের মধ্যে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে উঠেছে। সামনে বুকে সে একটু একটু করে এগুচ্ছে গুলমহম্মদের দিকে। গুলমহম্মদ স্থির নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

অন্ধকারের ভিতর থেকে দিলমহম্মদের গলার আওয়াজ উঠল “হুশিয়ার!” এবং তার বাক্য শেষ হবার পূর্বেই হিংস্র পশুর মত লোকটার পিঠের উপর প্রচণ্ড বেগে ঝাঁপিয়ে পড়ল বিরমল।

আমার এক ধাক্কায় সরিয়ে দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল কুস্তী—পোপটলাল একটা অদ্ভুত চীৎকার করে উঠলেন।

ককু নিখাসে দেখছি—সেই প্রকাণ্ড জোরানটার পিঠের উপর আঁকড়ে ধরে কুলছে বিরমল আর লোকটা হাত ঘুরিয়ে তাকে ছোরা মারবার জন্তে আশ্রয় চেষ্টা করছে।

কিন্তু তাদের কাছে কুস্তীর পৌছবার পূর্বেই লাকিয়ে উঠল দিলমহম্মদ। সঙ্গে সঙ্গে তার হাতের টাঙ্গির কলাখানার প্রায় সমস্তটাই সেই লোকটার বড় বড় চুলগুলা মাথাটার বসে গেল।

আর একটা ভয়ঙ্কর আর্তনাদ—সেই আর্তনাদের সঙ্গে বিরমলকে পিঠে নিয়ে লোকটা মুখ ঝুঁকড়ে পড়ল, তাদের উপর নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল কুস্তী।

চক্ষের নিমিষে সমস্তটা ঘটে গেল। আমি আর পোপটলাল কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। উটের উপর ভৈরবী ডুকরে কেঁদে উঠলেন। “হা হা হা হা” বিরমলের বিকট হাসি শোনা যেতে লাগল।

সামনে এসে দাঁড়ান দিলমহম্মদ। মাঝার পাগড়ি কোথায় চলে গিয়েছে, সর্বাঙ্গ জামা জোকা রক্তে রাঙা। তার হাতের টাঙ্গির ফলাখানাও টুকটকে লাগল। পোপটলালের হাত থেকে আলোটা নিয়ে এগিয়ে গেল সে, যেখান থেকে তখনও যুতাপথবাত্তীর অস্তিত্ব কাতরানি উঠছে, সেইদিকে।

ছুটে গেলেন পোপটলাল কুস্তী আর বিকসনের দিকে। গুলমহম্মদ এসে আবার হাত থেকে উটের দড়িগাছা নিলে। ভৈরবীকে কাঁদতে বারণ করলে। আর ভয় নেই—সব মিটে গেছে। ভৈরবী নামতে চাইলেন। দড়ি ধরে গুলমহম্মদ উটকে বসাতে লাগল।

আমি এগিয়ে গেলার দিলমহম্মদের কাছে।

পাহাড়ের পা-ধঁবে একটা লোক উণ্ডু হয়ে পড়ে বালুতে মুখ বগড়াচ্ছে, লোকটা একেবারে উলক। জামা জোকা সমস্ত টুকরো টুকরো করে ছেঁড়া জার পাশে ছড়ানো রয়েছে। আলোটা আরও কাছে নিতে দেখা গেল তার একটা পা কূলে নীল হয়ে গেছে।

আবার হাতে আলো দিয়ে দিলমহম্মদ লোকটাকে চিৎ করে দিলে। তার নাক মুখ দিয়ে কেনা বেরুচ্ছে। আরও ছ'একবার কাতর আর্ডনান করে লোকটা ধুক্কের মত বেঁকে উঠল। তারপর তার কাতরানি বন্ধ হল, চির-কালের অন্তে নমস্ত বস্ত্রগার অবলান হয়ে গেল তার।

দিলমহম্মদ বললে, “নাগে কেটেছে।”

আলো নিয়ে আমরা উটের কাছে ফিরে এলাম। কুস্তী আর বিকসনকে ধরে নিয়ে এলেন পোপটলাল।

গুলমহম্মদ ছেলের হাত থেকে আলোটা নিয়ে তার সর্বাঙ্গ ভাল করে দেখে নিলে। তারপর আলোটা নামিয়ে রেখে ছেলেকে ছ'হাতে বুকে জাপ্টে ধরে চুমার পর চুমা খেতে লাগল।

করেকটি যুহুর্তের মধ্যে এতবড় কাণ্ডটা ঘটে গেল। পাহাড়ের নীচে অন্ধকারে আত্মগোপন করে যুতু আবারের অপেক্ষার ইঁ করে বলে ছিল।

নিরুদ্ভিগ্ন চিত্তে আমরা আসছি—গোজা সেই হাঁ-করা মুখের মধ্যে প্রবেশ করতে। সবই ঠিকমত ঘটতে চলেছিল, কিন্তু বাদ সাধল এরা দু'জন—এই বৃদ্ধ পিতা আর তার নির্ভীক বৃদ্ধ পুত্র। বিদ্রোহীরা বিধা না করে লাফিয়ে পড়ল সামনে, অকল্পিত কঠোর হস্তে আঘাত হেনে বৃত্তাকে নিরাশ করলে। নিরাশ করলে বলা উচিত নয়, বরং বলা চলে বৃত্তাকে বৃত্তা উপহার দিলে। তা যদি না হত, যদি এরা মনে করত যে আমরা বিধর্মী বিদেশী, আমাদের কিছু হলে ওদের কি? বিধর্মী মালপত্র বা আমাদের সঙ্গে আছে তার ভাগ কিছু গেলে নিদারুণ অভাবের সামান্য কিছুটা ঘুচতে পারে। আরও কত কি বিবেচনা করতে পারত। ফলে এতকণে আমরা তীর্থযাত্রার পথ থেকে ছিটকে অনেকদূরের অন্ত এক পথে বাজা করতাম।

একটিমাত্র লষ্ঠনের আলোর অন্ধকারকে আরও রহস্যময় করে তুলেছে। বেন অন্ধকারের আড়ালে আরও অনেকে লুকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, এইবার দল-বেঁধে আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। অদূরে তিনটে লোক মরে পড়ে আছে। জীবন্ত বিত্তীভিকার মাঝে সেই সামান্য আলোর দেখছি আর এক দৃষ্ট—এক বৃদ্ধ পিতা পিতৃহৃদয়ের শাশ্বত অনুতথার এক ভাগ্যবান পুত্রকে দান করিয়ে দিচ্ছে। কোথার তলিরে গেল এতবড় মর্মান্তিক ঘটনাটা—কোথার উবে গেল কয়েক যুহুর্ত পূর্বের নিদারুণ উত্তেজনা। একটি স্নিগ্ধ মধুর অল্পভূতিতে শরীরের প্রতি অগুণরহাণু ধর ধর করে কাপতে লাগল। বাৎসল্য রসটি কি-জাতের রস, সন্তানের উপর মারা কি-ধরনের ব্যাপার, পিতার হৃদয়ের ব্যাকুলতা কি-পদার্থ তার চাক্ষুষ পরিচয় পেলাম। শুধু পেলাম নয়, আকর্ষ সেই রস পান করে নেশার বৃত্তি হয়ে গেলাম—সে নেশা অনিন্দের না বাথার আজ তা ঠিক করে বলতে পারব না।

বাবা ছেড়ে দিলে পর দিল্লীমহল কুস্তীর সামনে এলে দাঁড়াল। এই প্রথমবার সে কুস্তীর সঙ্গে কথা বললে। বললে, “বাই, তোমাকে বারো অপমান

করেছিল, সেই জানোয়ারদের খুনে আমি গোসল করে এসেছি। এবার তুমি এই শয়তানদের কথা মন থেকে মুছে ফেল, ওরা জাহান্নামে যাক।”

পোপটলাল একটা জলের কুঁজো নামিয়ে আনলেন। আমরা সকলে আকর্ষণ করলাম, তুফার বুকের ছাতি শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল।

বড় উটের উপর থেকে ওদের নিজেরের খোলা নামিয়ে আনল দিলমহম্মদ। খোঁয়া কাপড়-চোপড় বার করে রক্তমাখা জামা জোকা বদলে ফেললে। থিকমলকেও তার পাজামা শার্ট ছাড়ানো হল। কুস্তী তার শরীর থেকে লম্বা রক্তের দাগ মুছে দিলে; পোপটলালের একখানা ধুতি পরিয়ে কুস্তীর লগে তাকে উর্বশীর গিঠে তুলে দেওয়া হল। ভৈরবী হেঁটেই চললেন আমার চিমটেখানা বাগিয়ে ধরে।

বাজার পূর্বে গুলমহম্মদ আর পোপটলাল ওধারে গিয়ে মৃত লোক তিনটির কাছে জিনিসপত্র কি আছে দেখে এল। গোটা কতক টাকা আর বড় তিনখানা ছোরা ভিন্ন বিশেষ কিছু পাওয়া গেল না।

আমরা অগ্রসর হলাম। মাথার উপরের পাখরখানার নীচে থেকে খোলা আকাশের তলার বেরিয়ে এসে হাঁক ছেড়ে বাঁচা গেল। গুলমহম্মদ বললে, “রাত কাবার হবার আগেই জন্তু-জানোয়ার ওদের লাড়াড় করে ফেলবে।”

“কি জানোয়ার?”

দিলমহম্মদ বললে, “নেকড়ে।”

গুলমহম্মদ সাবধান করে দিলে, “ঘুশাকয়েও এসব কথা কোথাও যেন বলা না হয়।”

কুস্তীকে হুঁশিয়ার করলে দিলমহম্মদ—“বহিন, সাবধান, থিকমল যেন পড়ে না যায়।”

উপর থেকে কুস্তী জানালে—ভয় নেই, সে ঘুরিয়ে পড়েছে।

পোপটলাল বিনীতভাবে একটি বিড়ি প্রার্থনা করলেন। অনেকক্ষণ ছিলি না পাওয়ার বেচারার কষ্ট হচ্ছিল

আমরা পাহাড়ের ধার ছাড়লাম। লোহা উত্তর-পূর্ব কোণায় চলতে লাগলাম, ক্রমে আকার অস্বাভাবিক হইল।

অনেকক্ষণ পরে পোপটলাল বললেন, “সেদিনই ওরা আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ত। অনেক লোকজন বেঁচে সাহস করে নি।”

দিল্লয়হুদা বললে, “বাবা তখনই আমাকে বলেছিলেন এরা ভাকাত।”

পোপটলাল দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বললেন, “পাপের শেষ কম কি বারাদ্বয়ক।” একধার কেউ জবাব দিলে না।

শ্রীহিংলাজ গুরুশিষ্যের স্থানে। দূর থেকে কপলালের গলা শোনা গেল, “শ্রীহিংলাজ দেবী-বাণী কি—”

আমি আর পোপটলাল উত্তর দিলাম, “জয়।”

শ্রীহিংলাজও এক বিচিত্র আওয়াজ করলে। সেই গাছপালায় বসে তাদের লকলকে লটান শুনে থাকতে দেখলাম। হুঁশটা নয়—প্রায় তিন ঘণ্টার বস্ত লকলের আওয়াজে আরাম করা হয়েছে।

শ্রীশ্রীগুরুশিষ্যের স্থানে শ্রীশ্রীগুরুদেব আর শিষ্য মহাশয় হুঁজনে হুঁজনা কাল পাখরে পরিণত হয়ে পড়ে আছেন। প্রতি পাখরখানা তিন লাড়ে-তিন হাত লম্বা আর দেড় কি হুঁচাত করে চওড়া। বালির তিতর কড়টা গাড়া আছে জানি না, বালির উপর অস্বস্ত একহাত করে বেগে আছে পাখর হুঁজনা। ধারে কাছে এই ধরণের পাখর আর একখানাও দেখা গেল না। কেউ কোথাও থেকে করে এনে সেখানে পাখর হুঁজনা কেনে মেখে মেখে এ ধারণা না করে, বরং একলা এক গুরু আর এক শিষ্য হিংলাজ দর্শন করে কেবলবার সময় এখানে পড়ে কোনও কারণে পাখর হয়ে আছেন এবং যুগযুগান্ত পরে ভগবান শ্রীরাঘচন্দ্র পুনরায় আবির্ভূত হয়ে যখন হিংলাজ দর্শনে গমন করবেন তখন তাঁর শ্রীচরণ স্পর্শে এরা উদ্ধার হয়ে উঠে দাঁড়াবেন একথা বিশ্বাস করা অনেক সহজ, অনেক আরামের। তাই মেনে নিয়ে আমাদের পাড়া

শ্রীমান রূপলালের নির্দেশ মত ময় আউড়ে পাথরের উপর কুঁজোর জল দিলাম দক্ষিণা দিলাম। তা ময় হল না, আর টাকা তিনেকের মত দর্শনী পড়ল। এই আমাদের প্রথম দর্শন, জানি না পাণ্ডার তৃপ্তি হল কি না।

তখন পাণ্ডাজী আমাদের শোনালেন এক উপাখ্যান। ঐ শিষ্ট-গুরু কীর্তিকলাপ। না শুনে উপায় নেই—দর্শন করা আর উপাখ্যান শোনা দুটোই হওয়া চাই। এ সময় হচ্ছে তীর্থকর্মের অঙ্গ, সবটুকুই শেষ করা প্রয়োজন। নয়ত অকল্যাণ হবে বে।

একদা এক গুরুদেব তাঁর এক শিষ্টকে সঙ্গে নিয়ে হিংলাজ দর্শন করে ফিরছিলেন। হুজনার কাছেই দু-পাত্র জল ছিল। কি খেয়াল হল গুরুদেবের, তিনি বার বার শিষ্টের কাছ থেকে তার জলটুকু চেয়ে নিয়ে পান করতে আরম্ভ করলেন। গুরু জল চান—শিষ্ট না দিবে করে কি। শেষ পর্যন্ত গুরুদেব শিষ্টের পাত্রের জলটুকু নিঃশেষে পান করে নিশ্চিন্ত হলেন। শিষ্টের তখন তৃষ্ণার আগ্রাষ। গুরুদেব কিন্তু এক ফোটা জল তাঁর পাত্র থেকে শিষ্টকে দিলেন না। “হা জল হা জল” করতে করতে শিষ্ট বালুর উপর শুয়ে পড়ল। ভাতোও না, অভিন্ন কালেও শিষ্টের ঠোঁটে এক ফোটা জল ছোঁয়ালেন না গুরুদেব। চোখের উপর তিলে তিলে শিষ্টকে মরতে দেখলেন। বতাই তিনি এই দৃশ্য দেখতে লাগলেন ততই তাঁর গরম বাড়তে লাগল। ভয়—তাঁর নিজের জলটুকুর অস্তিত্ব। যদি কুরুর তবে তাঁরও শিষ্টের অবস্থা হবে। কিন্তু হল একেবারে সাংঘাতিক কান্ড। তাঁর পাত্রটি চৌচির হয়ে কেটে গেল। সময় জলটুকু পড়ল বালুর বুকে, সঙ্গে সঙ্গে চৌ চৌ করে সবটুকু শুবে নিলে তপ্ত বালু। এইবার গুরুদেব বাবেন কোথা? তাঁকেও শুয়ে পড়তে হল শিষ্টের পাশেই।

এই হল গুরু আর শিষ্টের উপাখ্যান। সহজ সরল অমার্জিত এই ইতিহাস শুনে পুনরায় সকলে দক্ষিণা দিলাম। উপাখ্যান শোনার দক্ষিণা আলাদা করে দেওয়াই নিয়ম, নয়ত প্রবণের কল মিলবে না। তা যা দেবার

দিলার বটে, সঙ্গে সঙ্গে এইটুকুও বুঝলাম যে এইবার সত্যসত্যই জলীয় ব্যাপারে একান্ত সাবধান হওয়া উচিত। এই নিষ্ঠুর কেছা শোনানোর আর যে-কোনও উদ্দেশ্যই থাকুক, এর দ্বারা আমাদের যে শেষবারের মত সাবধান করে দেওয়া হল এটুকু বুঝতে বাকি রইল না। রূপলাল এই বলে তার বক্তব্য সমাপ্ত করলে যে, এইজন্তেই এই ব্যাপার কেউ কাকেও জল দেবে না— এই ভীষণ প্রতিজ্ঞা করে তবে আসতে হয়।

জিজ্ঞাসা করলাম, “সামনের কুরোর ধারে পৌছতে আর কত দেরী হবে মনে কর ?”

উটওয়ালারা এবং রূপলাল তিনজনেই বললে, “ছয়টার মধ্যেই পৌছছি।”

কিন্তু জরাজীর্ণের জন্ত ঘন ঘন খামতে হচ্ছে। এক-একবারে আধঘণ্টার জন্ত বিরতি। কানেকায়েই গুরুশিষ্টের স্থান ছেড়ে প্রায় তিনঘণ্টা পড়ে আমরা কুরোর ধারে পৌছলাম। আকাশের পূর্বদিকের শেষপ্রান্তে তখন নর এককালি চাঁদ মিন মিন করে চাইছে। আজ কৃষ্ণা জ্যোতিষী বা চতুর্দশী হবে।

বিরিট এক তেঁতুল গাছের তলায় আমাদের আশ্রয় পড়ল।

যে যেখানে পারলে কবল বিছিয়ে শুয়ে পড়ল। তৈবরী তাঁর কবলখানা কাঁধে কেসে একটা জুংসই জায়গা খুঁজে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। কোথাও তাঁর পছন্দ হচ্ছে না। তেঁতুলগাছটার গুঁড়ি বেঁধে প্রথমে তিনি কবল বিছিয়েছিলেন, সেখানে উচুনিচু, কানেকায়ে উঠিয়ে নিয়ে গেলেন কবলখানা। নিয়ে বসলেন যেখানে বিরমল আর কুড়ী ছিল তার পাশে। সেখানেও কি অসুবিধা হল। গেলেন উর্বশীর কাছে। ওরা বা ঘেরে মোটবার্ট নামিরে পাশে বসে পড়ে মুখ নেড়ে আঁবর কাটছিল। আঁবরকাটা আর ঘুম দুকানই একসাথে সারে। কানেকায়ে গুলমহম্মদ হেলের সঙ্গে শুয়েছে। উর্বশীকে খানিক

আমর করে শেষ পর্বত ভৈরবী এসে দাঁড়ালেন আমার কাছে। দাঁড়িয়ে কি ভাষতে লাগলেন।

বললার "এক কাজ কর, আমার বাখার কাছে কখন বিছিয়ে শুয়ে পড়। রাত আর বেশি নেই।"

আমি ঘুমইনি এ তিনি আশা করেন নি। কখন বিছিয়ে বসলেন সেখানে, শুলেন না।

বললুম, "শোও না, তবু বতটুকু ঘুম হয়।"

উত্তর দিলেন "ঘুম কি আর চোখে আছে? ঘুনখারাপী হয়ে গেল। তিন তিনটে লোক ম'ল। রক্ত দেখে ঘুম দেশ ছেড়ে পালিয়েছে। চোখ বুজলেই আবার সেই সমস্ত দেখব।"

ঘুম আমারও আসছিল না। আসবার কথাও নয়। লোকে সংসারের জালায় অস্থির হয়ে শান্তির মুখ দেখবার আশায় তীর্থযাত্রায় পা বাড়ায়। আমরাও চলেছি হিংলাজ, উদ্দেশ্য ঐ শান্তিলাভ। জানি না শান্তিটা কি বস্তু—তবে আজ এই ক'টা দিনে যে তার ছায়াও দেখতে পাই নি, তাতে আর সন্দেহ নেই। শেষ পর্বত পৌঁছে হিংলাজ দর্শনটা ভাগ্যে ঘটবে কি না কে বলতে পারে।

এই তীর্থের পথ যে বিপথ বা কুপথ এটুকু জেনেই এ পথে নামা হয়েছে। সুতরাং পথের কষ্টটা কষ্টই নয়। হিংলাজ-দর্শনে ও কষ্টটুকু পুষিয়ে বাবে এ বিশ্বাস আছে এবং সেই কারণে বুকে সাহস বেঁধে এগিয়ে চলেছি। কিন্তু হিসাবের মধ্যে ধরা ছিল না এমনই সমস্ত ব্যাপার আমদানি হচ্ছে যে। আর তাতে ইচ্ছার হোক অনিচ্ছার হোক আমরাই সবচেয়ে বেশি জড়িয়ে পড়ছি।

এই যে ওরা, কুড়ী আর বিক্রমল। একজন শু পাগলই হয়ে গেল। কে বলতে পারে আবার কখনও ও হ'ল ফিরে পাবে কিনা। যদি এইভাবেই থাকে, তাহলে উপায়? করাচী ফিরে আমরা শু আমাদের পথ দেখব, তখন ওরা বাবে কোথায়? কুড়ী শু সংকল্প করে বেখেছে যে আমাদের লজ সে ছাড়বে

না। ভেবে হাসি গেল—জিহ্ববনে মাথা গৌলবার বানের ঠাই নেই, তাদের কাছেই আশ্রয় পেতে চায় ওরা। বে ডুবছে সে একগাছা খড়কুটা ভেসে যেতে দেখলেও তাই ধরে বাঁচতে চেষ্টা করে।

সে না হয় বা হবার হবে যখন করাচী ফিরে যাব। আপাতত সবচেয়ে বড় কথা ভালর ভালর হিংলাজ পর্যন্ত পৌঁছানো, তারপর আবার এই ভীষণ পথটুকু ফিরে আসা। এখানে বালুর উপর মরে পড়ে থাকতে যেমন নিজেরাও চাই না, তেমনি বারা সঙ্গে চলেছে তাদের মধ্যে কেউ এখানে থেকে বাবে এও কল্পনা করা অসম্ভব। বিশেষত ওরা দুজন। ওদের ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়াই এখন মৃত গরজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। পাগল হয়ে থিকমল ঝোল-ছুঙে বজ্রাণ আনা মুশকিলে কেলোছে। এখানে নিজের প্রাণ বাঁচাতেই প্রাণান্ত, তার উপর ছ' ছুটো জীবনের দায়িত্ব বয়ে বেড়ানো। এ কর্ম সহজ নয়, আর এতে শান্তি বলতে বিন্দুস্বাদ কিছু নেই। সংসারের আলা আর কাকে বলে।

ভৈরবী বললেন, “কুন্তী বলে আছে। ও হতভাগীর চোখের দুম একেবারে ঘুচে গেছে। আজ কটা দিন ওকে নিমেষের তরেও চোখের পাতা এক করতে দেখি নি।”

মাথা তুলে দেখলাম কুন্তী বলে আছে গালে হাত দিয়ে থিকমলের দিকে চেয়ে। থিকমল তার পাশে নিশ্চিন্ত নিদ্রায় মগ্ন। ওকে ধাওয়ানো শোয়ানো ঘুমপাড়ানো এমনভাবে করছে কুন্তী, যেন ও একটি শিশু। সর্বদা কুন্তীর ডর পাছে থিকমল এমন কিছু করে বলে বাতে আমরা কেউ বিরক্ত হই। আমাদের সকলের কাছেই কুন্তী অকনত, সকলের দয়ার উপর নির্ভর করে ও চলেছে থিকমলকে নিয়ে। ওর সর্বদা ডর আমরা যদি কোনও ছুতোয় ওদের ত্যাগ করি।

হায় রে—ও বেচারী জানে না এখানে এই মহা বিপত্তির মাঝে কেউ কাকেও তিলস্বাদ সহায়তা করতে পারবে না, যদি সে বকমের কোনও পরিস্থিতির

উভয় হয়। এখানে একে অপরের মুখ চাওয়া সম্ভবই নয়, সেটা উভয়ের পক্ষে চরম বিড়ম্বনা হয়ে দাঁড়াবে। এ বড় বিষয় ঠাই—

• কুন্তীকে ডাক দিলাম। উঠে এসে সে ভৈরবীর কাছে বসল। একটু শুছিয়ে নিয়ে আরম্ভ করলাম—

“দেখ—অত ভেব না তুমি। অত ভাববার কি আছে। আগে ত হিংলাজ-দর্শন হোক। তারপর মায়ের দয়া—আমাদের সকলেরই ভাল হবে। বিক্রমল সেয়ে উঠবে। আর তোমরা ত যাচ্ছ আমাদের সঙ্গে কলকাতার। সেখানে ওকে ভাল ডাক্তার দেখাতে পারা যাবে। আমাদের ত আপনার বলতে কেউ কোথাও নেই। তোমার মত একটা মেয়ে পাওয়া গেল এ আমাদের ভাগ্য বলতে হবে। আমরা যখন মরব তখন অন্তত মুখে জল দেবার জন্যে তুমি আমাদের কাছে থাকবে। এটাও মায়েরই দয়া।”

আরও হয়ত খানিক লম্বা করে বক্তৃতাটা চালিয়ে যেতাম। কিন্তু কথা আর জোগাল না। ভৈরবীর কোলে মুখ গুঁজড়ে কুন্তী কান্নার ভেঙে পড়ল। বেশ বুঝলাম, ঐ ছুটি নারী একে অন্তরে বতটা বোঝে, তার সামান্য রাজও আমি বুঝি না। সর্বশয় খুঁয়ে কি আশায় কুন্তী বিক্রমলকে সফল করে পথে নেমেছে তা পুরুষ হলে আমি কি জানব।

ভৈরবী আমাকে আর না বকে ঘুমতে বললেন। তাই করলাম। পাশ ফিরে শুলাম। ওরা বলে রইল।

একদিন সন্ধ্যার কিছু আগে বৌবাজারের এক শ্রীজীর সামনে দাঁড়িয়ে এক বক্তৃতা শুনেছিলাম। একটা উচু টুলের উপর দাঁড়িয়ে বক্তা ঈশ্বরের সর্বশক্তিমত্তা প্রমাণ করছিলেন শ্রোতাদের কাছে। তিনি বলছিলেন, “ঈশ্বর বললেন, স্বর্গকার হইতে আলোক হউক।” সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরের সেই আদেশ পালনার্থে আলো হল।

চোখ বুজে শুয়ে শুয়ে ভাবছিলাম—সেই সর্বশক্তিমান ঈশ্বর আজ যদি মদ্য করে আমাদের কাছে উপস্থিত হয়ে একটি উন্টো হুহুর জারী করতেন—“আলো না হইরা আরও কিছুকণ অন্ধকার থাকুক”, তা হলে অল্প কোথাও কারও কোনও অসুবিধা হত কিনা বলতে পারি না, তবে আমাদের এই রাজীদলটির বিশেষ উপকারই হত।

অনাবৃত আকাশের তলার পড়ে ঘুমাতে বিশেষ কিছু অসুবিধা হয় না যদি সময়টা রাজিকাল হয়। কারণ রাজির আধারই তখন আচ্ছাদনের কাজ করে। দিনের বেলায় ঘর-বাড়ি ঢালা শুধা এর বা হোক একটা কিছু তলার ঢুকে দিনের আলোটা একটু ঠেকাতে পারলে ঘুমোবার কিছু লজাবনা তবু থাকে।

কিন্তু করা বাবে কি? চোখের পাতা বন্ধ করে চাদর চাপা দিয়ে শুয়ে যইলাম। শুধারে বধাকালে নৃষদেব দেখা দিলেন এবং এগিরেও আগতে লাগলেন।

রূপলাল এসে ডেকে ওঠাল।

“একটু দাওয়াই দিন।”

“কিসের দাওয়াই? কার আবার কি হল?”

“ধয়েছে যে একজনকে। দেখছেন না পাণ্ডে-বাবা বার বার লোটা হাতে ছুটছে।”

খড়মড় করে উঠে বসলাম—“কি হয়েছে? বাড়াবাড়ি নাকি? চল দেখে আসি আগে।”

“দেখবেন কি ছাই—ও আর পৌছবে না। বতকণ পর্বত এইভাবে চলে। এই মুহূর্তে একবার ধরলে আর ছাড়ে না। বলেছিলাম ত—হু’ একজন কমবেই আমাদের মধ্যে। এবার দেখুন না কি ঝড়ার।”

বললুম, “দাওয়াই দেব না-দেখে? আগে দেখি গিরে রোগটা কি, তারপর ত দাওয়াই।”

রূপলাল বললে, “তবেই হয়েছে। আপনার দেওয়া দাওয়াই জানতে পারলে ও থাকে নাকি? আপনার হাতের দাওয়াই খেলে যদি জাত যায়। তার চেয়ে বা দেবেন, আমার হাতে দিন। আমি পাণ্ডা যাহুব, আমার জাত সহজে যায় না। আপনার সমস্ত দাওয়াই ত ঐ সাদা ওড়ো। খানিকটা নিয়ে গিয়ে খাইয়ে দিই। বলব, এ হচ্ছে হিংলাজের প্রসাদী—খেলে সব অস্থখ সারে। বিশ্বাস করে থাকে, আর যদি পরমায়ুর জোর থাকে বেঁচে থাকে।”

বাইওকেমিক ওয়ুধের গোটাকতক শিশি ছিল আমাদের সঙ্গে, রূপলাল তা জানত। এই সরলপ্রাণ ছোকরা বা হোক একটা কিছু করে দেখতে চায় যদি লোকটাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। আর তর্কাতর্কি না করে উঠে গেলাম। আমাদের পোর্টলা-পুঁটলির ভিতর থেকে ওয়ুধের শিশি কটা খুঁজে বার করে পেটের অস্থখের ওয়ুধ একটু নিয়ে দিলাম। খুশী মনে রূপলাল খাওয়াতে চলে গেল।

আর শুয়ে থাকা হল না। কুমোর খাবে গেলাম—জল চাই, মুখে চোখে দিতে হবে।

হা হতোশ্রি—এরই নাম কুমা! বালুর মাঝে কোমর পর্বত নিচু একটা গর্তের তলার আধ হাত জল। সেই জলে না ভাসছে হেন জব্য নেই, উঠের বিষ্ঠা পর্বত। তার উপর আর এক মুশকিল সেই জল তোলা। কিনারায় গিরে দাঁড়ালে পাড়ের বালি ধসে যাবে, দড়ি-বাঁধা বালতি বা লোটা ছুঁড়ে ফেললে বালি উঠে আসবে—এখন উপায়?

দাঁড়িয়ে ভাবছি, পিছন থেকে কে বললে—“হজুরের জলের প্রয়োজন নাকি?”

চমকে উঠে পিছন ফিরে দেখি—হা, দেখবার মত চেহারা বটে। সাদা, একেবারে আগাধরতক সমস্ত এত সাদা, বেন খপখপে তুলোর তৈরী একটি মূর্তি।

মাথায় একমাথা সাদা চুল, বুক ছাড়িয়ে কোমর পর্বত এসে পৌঁছেছে সাদা

নাড়ি। আর লোকি অল্পসল্প চুল নাড়ি। মোটা দশেক লোকের মাথার মুখে ভাগ করিয়ে বসিয়ে দিলেও কথোট বাকি থেকে যাবে। সেই চুল-নাড়ির মাঝখানে সামান্য যে স্থানটুকুতে কপাল চোখটুকি আর নাকটি রয়েছে তাই সাদা। তবে চুলনাড়ির মত অত সাদা নয়, সামান্য একটু লালচে আভা আছে। বিশেষ করে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে চোখের তারাত্তি বেন বহুদূর থেকে অন্তর্ভেদী দৃষ্টি কেনে ছনিয়ার সব কিছু একোড়-ভকোড় দেখে নিচ্ছে।

মাথার শাণ্ডি নেই। জামা মোকা উটকরালাদের মতই। তবে নিখুঁত পরিষ্কার। হাত দুটি পিছনে করে সেই অপরূপ মূর্তি সামান্য সামনে ঝুঁকে পুনরায় সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করলে : “হজুরের বোধ হয় জলের প্রয়োজন ?”

হতভম্ব হয়ে তার আপাদমস্তক দেখছিলাম। দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করার সঙ্কট নিয়ে পেরে বললাম—“কিন্তু তুমি কি করে ?”

সেই মূর্তি হাসল। হাসল মানে সাদা গোকনাড়ির তিতর থেকে কয়েকটি সাদা দাঁত একবার বেরিয়েই আবার লুকালো।

“আম্বন আমার সঙ্গে, জল তোলা আছে।”

চললাম। হজুরের ধার থেকে উঠে পূর্বদিকের বাসুর টিনাটার উপরে তাঁর পিছন পিছন উঠে দেখি, একটু দূরেই রানীকুড় শুকনো কাঁটার ভালপালা শুপাকার করা রয়েছে।

“ঐ গরীবের আত্মনা। হজুর যদি দয়া করে একটু কষ্ট করেন, ওখানেই জল তোলা আছে”—বলে তিনি অগ্রসর হলেন।

তাকে অনুসরণ করে আসলাম গিয়ে সেই শুকনো কাঁটার ভালপালার পাহাড়ের কাছে।

হাঁ, ঘরই বটে।

স্বহাশাসী মানব হবে কোন্ মুগে ওহার দ্বারা পরিত্যাগ করে নিজে

মৃত্যু নিজেই বাসস্থান বানাতে শুরু করে। সেই থেকে আজ পর্যন্ত মাহুদের মাথার হাজার বকরের ফন্দি-ফিকির গজিয়েছে, ফলে কোথাও হুঁশ তলা কংক্রীটের বাড়ি আকাশ ছুঁতে চলেছে, কোথাও বা গাছের ডালে মাচা বেঁধে লজ্জাপাতা দিয়ে নীড় রচনা করে লোকে মনের স্থগে সংসারধর্ম করছে। আরার এমন জায়গাও আছে যেখানে বরকের টাইএর উপর টাই সাজিয়ে বাসস্থান বানিয়ে মানবসন্তান তার মধ্যে ঢুকে আরাম করে কাঁচা সিলমাহ চিবুচ্ছে।

কিন্তু এই যে বাড়ি চোখের সামনে দেখছি এ একেবারে অবাক কাণ্ড, অভিনব ব্যবস্থা। বলা উচিত, গৃহনির্মাণ-পরিকল্পনার অচিন্তনীয় অবদান।

লম্বা লম্বা শুকনো কাঁটার ডাল রাশি রাশি জুটিয়ে এনে সেই ডালপালা বেশ করে শুছিয়ে উপরি উপরি সাজিয়ে দেওয়াল বানানো হয়েছে। চারিদিকের দেওয়ালের মাথা ঘরের ভিতর দিকে ক্রমে ঝুঁকিয়ে নিয়ে এলে পরস্পরের সঙ্গে শূন্যে ঠেকিয়ে উপরের ছাতের কাজ সারা হয়েছে। তার ফলে উপরটার মঠমন্দিরের ঢঙ এসে গেছে। যেন আমাদের বন্ধুদের কোনও পুরোনো বন্ধির।

তবে কাঁটা—আপাদমস্তক বিলকুল এর কাঁটার তৈরী। একেবারে নিখুঁত কটকপৃহ, কোনও ভেজাল নেই।

ভিতরে প্রবেশ করবার জন্যে পূর্বদিকে একটি গোলমস্ত দরজা রয়েছে। দরজার সামনেই গোটা কতক মোরগ মূর্গা কাঁচা-রান্না নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। উঁকি মেঝে ভিতরটা একবার দেখতে বড়ই লোভ হল।

কিন্তু তার পূর্বেই একটি মহিলা হুটপুট ছেলে কোলে নিয়ে বেরিয়ে এলেন সেই কাঁটার দুর্গ থেকে। পরনে তাঁর ছিট-কাপড়ের সালোয়ার, পালা কাপড়ের পাজাবী এবং তার উপর একখানি ছাতার কাপড় দিয়ে মুখ মাখা বুক আবৃত।

আমাকে যিনি সন্দেহ করে নিয়ে এলেন তিনি কি বললেন মহিলাকে নিজের ডাবার। সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁর কটকের ঘরে গিয়ে ঢুকলেন এবং পরমুহুর্তেই

যেদিকে এলেন একটা ছোট মুণ্ডহীন ছাগল হাতে ধুলিয়ে নিয়ে। সেটি আমার সামনে নামিয়ে দিয়ে ছেলে কোলে নিয়ে পুনরায় তাঁর সেই গৃহের দরজার গিয়ে দাঁড়ালেন।

“মেহরবানি করে এই জল নিয়ে বান। আশা করি এতেই আপনার গোসল হয়ে যাবে। লোকজন সকলে উঠলে জল তোলার ব্যবস্থা হবে।”

তাঁর কথায় হুঁশ ফিরে এল। এতক্ষণ ধরে হয়ে দাঁড়িয়ে হাবা-গজারামের মত হাঁ করে সব দেখছিলাম। দেখছিলাম একসঙ্গে অনেক কিছুই। এঁদের ঘর-গৃহস্থালি, ঐ টকটকে লাল বেখাওয়া বলবলে জামা গায়ে দেওয়া ঐ সুন্দর শিশুটিকে আর খাঁর কোলে ঐ শিশু রয়েছে তাঁকে। বাহ্য এবং শ্রী, ঠিক এই পরিবেশের সঙ্গে মানানসই শ্রী আর তরুণযুগ্ম সাজপোশাক, এর একটির সঙ্গে আর একটির কি আশ্চর্যজনক মিল, কোথাও ছন্দ-পতন হয়নি।

মুখ তাঁর দেখাই গেল না। ছাতার কাপড়ে নাক থেকে গলা বুক সমস্ত ঢাকা। দেখা গেল দুটি চোখ এবং ক্রুর উপর সামান্য একটু কপাল। আশ্চর্য বড়, দুখে আলতার গোলা বললে অভ্যক্তি হয় না। সেই আশ্চর্য চোখদুটি, যেন টলটল করে ভাসছে। এক লহমায় ভক্তে সেই চক্ষু দুটি আমার উপর পড়েছিল। অদ্ভুত, সত্যি অদ্ভুত সে দৃষ্টি। বুঝলাম মরুভূমিরও প্রাণ আছে। সে দৃষ্টিতে মরুভূমির প্রাণের পরশ ছিল। আমার দেহের মধ্যে তড়িৎ খেলে গেল।

তাড়াতাড়ি নিচু হয়ে জলের থলিটা তুলে নিয়ে অস্ত্রদিকে চলে গেলাম।

সেই জলে মুখ ধোয়া থেকে সকল প্রয়োজনই মিটল। মাথা পা হাত সমস্ত মুছে নিলাম। রাত ভেগে হাঁটার ক্লান্তি ও অড়তা দূর হল। তখনও সকালের ঠাণ্ডা হাওয়াটুকু বইছে, ধীরে-স্থিরে সকল কর্ম সমাধা করে বিড়র এলার আড্ডার সেই তেঁতুল গাছের তলার।

তখন চানচানি করে সকলে করে নিয়ে চলেছে হাত বিশেক লম্বা একখানি

কাঠ। এখানে এতক্ষণ বালির নীচে চাপা পড়ে ছিল। কাঠখানা কুয়োর উপর আড়াআড়ি কেলে তার উপর দাঁড়িয়ে জল তোলা হবে।

শুলমহম্মদ আমাকে প্রভাতের সোলাহ-আলেকুম জানিয়ে তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলে। সেই তুলোর তৈরী মূর্তিটির নাম শেখ বসিকদ্দিন, এখানকার কুপওয়াল।

শেখ সাহেব সামান্য অবনত হয়ে এই আর্জি পেশ করলেন যে তাঁর স্ত্রীও এসেছেন আশুরদের সঙ্গে নিয়ে যেতে। এখানে খোলা জায়গার ঔদের তকুলিক আরও বেশি হবে। যদি আমার আপত্তি না থাকে তবে ভৈরবী আর কুস্তী তাঁর গরীবখানার গিয়ে গোলল-আদি করে হুহু হয়ে সেখানেই বিশ্রাম করুন।

পিছন ফিরে দেখি সেই খোকার বা ভৈরবীর সঙ্গে আলাপ করছেন।

শুলমহম্মদের দিকে চাইলাম। সে বললে, “মাইজী ওখানেই যান। অনেক সুবিধা হবে।”

ভৈরবীকে বললাম, “ঔর সঙ্গে যেতে পার, ঐ টিলার ওপারেই ঔদের বস-বাড়ি। তবে একটু সাবধান, কাঁটা ফুটে না য়ো।”

গেলেন ভৈরবী ক্রিমতী বসিকদ্দিনের পিছু পিছু আর সুখলাল গেল তাঁর কোলা বয়ে নিয়ে। কুস্তী যেতে পারলে না, খিকমল তখনও যুমছে সে উঠলে তাকে নাওয়ানো-খানওয়ানো করবে কে। কুস্তী মুহূর্তের ভেত্রে খিকমলকে চোখের আড়াল করে না, আবার যদি কোনও দিকে লাগায় দৌড়—বিধান কি?

স্বাধীনতা আরম্ভ হল সেদিনের ব্যবস্থা করার ঘুম। ঘুমই বটে। কিছুক্ষণ পরে সারা গাছতলাটা ধোঁয়ার ছেয়ে গেল। বিশটা চুলা ধরিয়ে বিশ জায়গায় কটি পোড়ানো আরম্ভ হল।

আমাদের রান্নার জিনিসপত্র চলে যেতে লাগল শেখ বসিকদ্দিনের আস্তানার। ওখানে সুবিধা বড় স্থান পেয়ে ভৈরবী রান্নার জোগাড় করছেন।

তাঁর সুযোগ্য সহকারী শ্রীমান সুখলাল আশা-বাণী করছে, তিনিসঙ্গে বইছে—
মহা ব্যস্ত।

এক কান্কে রূপলালকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলাম পাণ্ডে মহারাজের সংবাদটা।
তখনলাম তিনি নিজামদ। রূপলালের ত খুবই আশা যে আমার ওরুধ কাজ
করছে।

বসিকদিনের সঙ্গে তাঁদের দেশ-মুহুরের গল্প জুড়ে দিলাম। তিনি
বললেন—সরকার থেকে তিনি এই কুরোর ইজারা নিয়েছেন। জমা তাঁকে
কিছুই দিতে হয়নি। তাঁর কাজ হচ্ছে কুরো পরিষ্কার রাখা এবং চারিদিকের
হালচাল সবকিছু মাঝে মাঝে সরকারকে ওয়াকিফ-হাল করা। অত্যন্ত পকাশ-
বাটটি পরিবার এই কুরোর উপর নির্ভর করে বেঁচে আছে। তারা ছাগল উট
নিরে কাঁটার ঘর বানিয়ে এই কুরোর চারিদিকে দশ-বিশ ক্রোশের মধ্যে বাস
করছে। যেখানে ছাগল উটের পেট ভরাবার মত গাছপালা পায় সেখানেই
ঘর তোলে আবার গাছপালা কুরোলে অস্ত্র চলে যায়। কিন্তু এই কুরো থেকে
যেখি দূরে যায় না।

জিজ্ঞাসা করলাম, “এর পরের কুরোটা কত দূর?” শেখ সাহেব মাইল
ক্রোশ এ সমস্তের ধার ধারেন না। বললেন, “উটের দশ-বার ঘণ্টা লাগবে।” এ
মুহুরে উটের চলার মাগই দূরত্বের পরিমাণ নির্দেশ করে। যেমন ইকিন মোটর
ইত্যাদির শক্তি বোঝাতে এতগুলো অশ্ব-শক্তির সমান বলা হয়।

আর একটি-কথা জিজ্ঞাসা করা যায় কিনা ভাবছিলাম। হঠাৎ কথার
কথার সুযোগ এসে গেল। আমার মনের মধ্যে খচ্-খচ্ করছিল একটি প্রশ্ন,
সেটি হল, এই বৃদ্ধ বয়সে তাঁর ঐ ভাবী লাভ কি করে সম্ভব হল।

শেখ সাহেব বলছিলেন তাঁদের হেশের ছাং দারিত্র্যের কথা। তাঁর সংসার
চলা মুশকিল, সবলের মধ্যে একপাল বকরী আর দুইগীগুলো। হিংলাজবাগী
বহুরে আর ক'বার আসে। কিছু কিছু বা আমলানি হয় ঐ পকাশ-বাটটি
গৃহস্থের কাছে যায়। তাঁর কুরোর জল খায়। তাদেরও অবস্থা শু মমান

শোচনীয়। বিয়ে-সাদী করে ছেলেনিলে হওয়ার আজকাল তাঁর কঠোর অবধি নেই।

বললাম, “কিছু যদি মনে না করেন তবে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। আগনাদের দেশে দেখছি একটু বেশি বয়সেই বিবাহটা করে। মানে, আগনার বয়স এখন কত হবে?”

এবার হো হো করে প্রাণ খোলা হাসি হেসে উঠলেন তিনি। বললেন, “হজুরের কি ধারণা আমার-বিবির বয়স আমার থেকে ঢের কম? সকলেই তাই মনে করে বটে। হজুর, আমার বয়স পঁয়তাল্লিশ, আমার বিবির বয়স চল্লিশ পার হয়ে গেছে। আমার সঙ্গে ওর সাদী হয়েছে এই বছর পাঁচেক। এর আগে যিনি ওর স্বামী ছিলেন তিনি বেহেস্তে চলে গেছেন—আম্মা তাঁর সাক্ষার কল্যাণ করুন। আমার বিবির বিশ বছরের এক মেয়েই আছে। তারও ছেলেনিলে হয়েছে। আমার সঙ্গে সাদী হবার পর এই প্রথম ছেলে হল।”

একেবারে চুপ করে বসে থাকতে হল। ঐ ভদ্রমহিলার বয়স চল্লিশ পার হয়ে গিয়েছে এবং তার পরেও ওর ঐ অপূর্ণ সৌন্দর্য স্বাস্থ্য স্ত্রী বজায় রয়েছে, এ কি সহজে বিশ্বাস হয়! আর তা বিশ্বাস করতে গেলে আমার দেশের কুড়িতেই-বুড়ি গৃহলক্ষীদের ডাক দিয়ে বলতে ইচ্ছা করে যে, তাঁদের উচিত এই মরুভূমির মাঝে ছুটে চলে এসে এখানেই ঘরসংসার পাতা। আমার হুজলা হুজলা বজ্রাতার বুকডরা-মধু বজ্রবৃক্ষের গাল-তোবড়ানো কোলকুঁজো হতস্ত্রী চেহারার ছবি চোখের উপর ভেসে উঠল। চলে আনুন তাঁরা এখানে, গুঁইশাক আর সজিনা ভাঁটা হয়ত মিলবে না, কিন্তু অমল আর স্মৃতির মাঝাকাত্তর যে পাওয়া যাবে না এ আমি বুক ঠুকে বলতে পারি।

একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললাম, “তা বহুত খুশি কি বাৎ। খোদা আপনার আর আপনার বিবির শরীর ভাল রাখুন। তবে আপনার চুলদাড়িটা একটু আগে আগেই ভদ্রানক রকমের পেকে গিয়েছে।”

এবার শেষ সাহেব মুচকি হেসে উত্তর দিলেন, “আজ্ঞে, মোটেই পাকেনি

আমার চুলদাড়ি। চুলদাড়ির সাহা রঙ আমাদের বংশের বিশেষ গুণ বলতে পারেন। জন্মাবার সময়ই আমরা সাদা চুল নিয়ে জন্মাই আর দাড়ি গজাবার সময়ই সাদা হয়ে গজায়। আমার বাচ্চার মাথাতেও সাদা চুল বেরিয়েছে, বোধহয় অতটা লক্ষ্য করেন নি। এই চুলদাড়ির জন্মেই এ মুহূর্তে আমরা বিখ্যাত।”

একেবারে তাকব বনে গেলাম।

এখন আমাকে বেতে হবে তপ্ত বালু ভেঙে পেটে কিছু দিতে। খাওয়া মাথায় থাকুক। কুস্তী থিকমলকে নিয়ে চলছে খাওয়াতে। তাকেই অহরোধ করলাম, “বখন থিকমলকে নিয়ে ফিরবে, তখন এনো হাতে করে আমার খাবারটা। এই তপ্ত বালুর উপর দিয়ে আমি আর যাচ্ছি না, তোমরা খেয়ে নাও গিয়ে।”

শেখ বসিরুদ্দিন আমার বিশ্রামের আয়োজন করলেন। চার খণ্ড পাথরে ডাল জুটিয়ে এনে সেগুলো পুঁতে খাটির পায়া চারটে সেই ডাল চারটির মাথায় বেধে দিলেন। একখানা পালিচা এনে বিছিয়ে দিলেন খাটির উপর। বালু, খাটির নীচে চমৎকার ঘর হয়ে গেল। উপর থেকে কাপড় কবল কুলিয়ে দিয়ে চারিদিক বন্ধ করা হল।

একটানা খণ্টা দুয়েক ঘুমিয়ে উঠলাম। উঠে দেখি বাঁধা-হাঁদা লম্বত হয়ে গেছে। সুখলাল প্রস্তুত এক গেলাস গরম চা হাতে নিয়ে। ভৈরবী উপস্থিত, ছেলে কোলে করে তিনিও। কিছু আখরোট মিছরি বাদাম তাঁর ধোকার জন্তে আলাদা করে রাখা হয়েছে। আমার চা খাওয়া আর উর্বরীর পিঠে খাটিয়া বাঁধা হলোই যাত্রা শুরু হবে।

ভৈরবী উঠলেন উটের উপর। “জর হিংলাজ” কবির সঙ্গে ছড়ি উঠল রুপলালের কাঁধে।

শেখ বসিরুদ্দিন আমার চু হাত চেপে ধরলেন। একটু ঘুরে তাঁর স্ত্রী দাড়িয়ে রইলেন ভৈরবীর দিকে চেয়ে।

উট চলল।

আজ অমাবস্তা। সন্ধ্যার পবেই আরম্ভ হল ঘোরতর নিশা। অল্প দিনের মত ধীরে-স্থগে রয়ে-জিরিয়ে রাজি এল না। সন্ধ্যার পিছনেই রাজি দাঁড়িয়ে ছিল। সন্ধ্যা ত্রুট লঘু পদক্ষেপে পার হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে মিশকালো চাদরে আপাদমস্তক আবৃত করে রাজি ছহাত মেলে সামনে এসে দাঁড়াল। পায়ের নীচে বালু, মাথার উপর আকাশ, মাঝখানের সমস্ত কাকটি জুড়ে এক নিরোট নিশ্চিত স্তব্ধতা ধম্ধম্ করতে লাগল।

অল্প দিন অসংখ্য প্রদীপ হাতে রাজির অমুচরীরা তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে আসে, আজ তারা কোথায় লুকাল কে জানে। বোধ হয় আজ আর রাজিকে পথ দেখাবার প্রয়োজন নেই বলেই তারা অমুপস্থিত। রাজি আজ চলছেও না, সামনেও এগুচ্ছে না। শুধু মুড়িমুড়ি দিয়ে চূপ করে বলে আছে আর আমর্য্য কটি প্রাণী উট দুটিকে নিয়ে সেই রূপহীন বর্ণহীন আধার-সমুদ্রে নাতার দিতে লাগলাম।

রাজির একটি নিজস্ব ভাষা আছে, তবে তা শোনবার মত কান থাকা চাই। না—শুধু কান থাকলেই হবে না শোনা, সে ভাষা শোনার জন্তে যেতে হবে সেই লম্বত স্থানে যেখানে রাজি কথা বলে। সর্বত্র ত রাজি কথা বলে না, আর যদিও বলে অল্প গোলমালে শুনতে পাওয়া যায় না সে সব কথা, খুবই চুপি চুপি বলে কিনা।

রাজির সেই স্বরের ভাষা যদি শুনতে চাও চলে যাও একখানা টাপুরে নৌকোর চেপে মেঘনার ভেসে ভেসে ভৈরবের পুল ছাড়িয়ে আরও নীচের দিকে। আপন ইচ্ছায় নৌকো ভেসে যাক—চূপ করে বলে থাক চোখ বুজে। অনেক পরে শুনতে পাবে রাজি কানের কাছে মুখ নিয়ে কিসকিসিয়ে তোমার শোনাচ্ছে তার গোপন কথা। কত বিচিত্র সে কাহিনী, তাতে কত ব্যথা, কত আনন্দ, কত রোমাঞ্চ, কত প্রহেলিকা। শুনতে শুনতে মনের জালা ছুড়িয়ে যাবে—কখন ঘুমিয়ে পড়বে জানতেও পারবে না।

কিংবা আর এক কাজ করতে পার। হাব হাস—আকাশে টাব নেই, বেশ কুরাশা করেছে। এমনি এক রাতে মনে হচ্ছে বেন নিজেকে নিজে খরতে পারছ, ছুঁতে পারছ। একখানা কখন জড়িয়ে নিষিবিলাি বেরিয়ে পড় নিজেকে নিয়ে। উদ্ধারণপুরের বড় শ্রমানেয় সামনে এসে বড় সড়কটার এখার ওখার একবার দেখে নাও কেউ কোথাও আছে কিনা। এমন সময় সেখানে কারও থাকবার কথা নয়। হয়ত দেখা যাবে ঐ ওখারে বড় পাহাড় গাছটার ডালে কাপড়-জড়ানো বড়া টাঙিয়ে রেখে গাছের গোড়ায় কয়েকটা লোক ইট দিয়ে চুলো বানিয়ে রাগা চাপিয়েছে। ছ' একটা বোতলও দেখা যাবে দূর থেকে আগুনের আলোর চকচক করতে। থাকুক ওরা ওখারে। আজ রাতে ওরা আর শ্রমানে ঢুকছে না। ওরা আসছে হয়ত পাঁচ-সাত ক্রোশ দূর থেকে বড়া নিয়ে, সকালে শ্রমানে ঢুকে দাহকর্ম শেষ করে বাড়ি ফিরবে। ওরা জানতেও পারবে না, তুমি নিশ্চিন্তে ঢুকে পড় শ্রমানের মধ্যে। সাবধানে পা কেলসে নেমে যাও গঙ্গার কিনারায়।

তান পাশে বে শেরালগুলো বড়া খাচ্ছিল তারা হয়ত খানিক খেঁকা-খেকি করে উঠবে—কখনও কাছে আসবে না। হাবরা কুকুরগুলো হয়ত চেঁচাতে চেঁচাতে পিছু পিছু আসবে, তাদের লাল চোখগুলো অন্ধকারের মধ্যে জলছে দেখা যাবে। কিছুক্ষণ পরে তারা ফিরবে নিজের নিজের কাজে। পাড়ের তালগাছটার বে শকুনগুলো ঘুমুচ্ছে তাদের মধ্যে হয়ত একটা নাকী সুরে কেঁরে উঠবে। তারপর আবার সবুজ গোলমাল খিড়িরে যাবে, আর কোনও অশান্তি নেই। তখন গঙ্গার কিনারায় একটু খুঁজলেই এক-আধখানা চেটাই বা মাহুর মিলবেই। সেখানা জলের ধার ঘেঁসে বিছিয়ে বেশ আরাম করে বস। আর গঙ্গার দিকে চেয়ে থাক। কিছু ভেব না, কোনও চিন্তার প্রয়োজন নেই। একটু পরেই চুপি চুপি পা টিপে টিপে আসবে দাড়ি। এসে ঠিক তোমার পাশটিতে বসে বসিষ্ঠ আলাপ জুড়ে যাবে। এই অম্ম-মৃত্যুর কথা, আসা-যাওয়ার কাহিনী। সে সব কথা না-জানা রহস্য। শুনেও কখনও

তোমার চোখের ঘুম বাবে গালিয়ে। তখন নিজেই নিজেকে হারিয়ে ফেলবে সেই সব না-জানা ব্যাপারগুলোর মধ্যে।

আর যদি সত্যি জানতে চাও রাজির নিজের মনের কথা, তবে বেতে হবে অস্ত্র এক জায়গায়। লামডিং-বদরপুর লাইনে হাফলং হিল নামে একটা স্টেশন আছে। ওখানে নেমে পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ যেদিকে ইচ্ছা চলে যাও পারে চলা পাহাড়ে পথ ধরে। পাহাড়ে বাঁশের তলা দিয়ে পথ গেছে এঁকে বেঁকে, একবার ওপরে উঠে একবার নীচে নেমে। চলতে থাক যতক্ষণ আকাশে আলো থাকে। চলছ ত চলছই মাঝে মাঝে ঐ দূরে পাহাড়ের গারে হু একখানা ঘর দেখা বাবে, দেখা বাবে সেই সব ঘর থেকে ধোঁয়া বেরুতে। তারপর এমন একটা জায়গায় গিয়ে পৌঁছবে যখন আর এগুবার উপায় থাকবে না। পারে চলা পথটা শেষ হয়েছে, সামনেই এক পাতালপ্রমাণ খাদ।

খাদের ওপারেই আর একটা পাহাড়, আকাশে তাঁর মাথা ঠেকেছে। তাঁর সারা শরীরে সে কি বিপুল সাজপোশাক, আর তার কত বিচিত্র বর্ণ। তাঁর মুখ দেখতে পাবে না, মাথা পিছনের দিকে হেলিয়ে মুখ তুলে দেখতে গেলে নিজেরই ষাড়ে ব্যথা লাগবে তবু দেখা বাবে না তাঁর মুখ। তিনি হয়ত তোমার স্পর্শ দেখে তখন মুখ টিপে হাসছেন। তা তিনি বা ইচ্ছা করুন খাদের ওপারে দাঁড়িয়ে, ঐখানেই একখানা জুংসই পাথর দেখে নিয়ে আরাম করে বস।

সামনে অনেক নীচে খাদের ভিতর দিয়ে নানা জাতের শব্দ করে ছুটে চলেছে এক নদী, তাকেও বাবে না দেখা। শুনতে পাওয়া বাবে সেই অগড়াটে মেয়ের অনর্গল বকবকানি। থাকুক বকতে, কিছুক্ষণ পরে ওটা লুপ্ত হয়ে যাবে। সন্ধ্যা এগিয়ে আসবে পা টিপে টিপে পাতলা ওড়নাখানি গারে জড়িয়ে।

তোমার এ হেন স্থানে একলা বসে থাকতে বেখে থমকে দাঁড়াবে। বিস্তর-ব্যাকুল চোখ দুটি তুলে ঘোমটার আড়াল থেকে অনেকদূরে থাকবে তোমার

দিকে—নির্বাক নিস্তর। তারপর লজ্জার শব্দে লাল হয়ে ধীরে ধীরে চলে যাবে গাহাড়ের আড়ালে।

আবিস্ফুট হবে রাজি, অহুচরীদের সঙ্গে নিয়ে। প্রাণীপ হাতে তারা পথ দেখিয়ে নিয়ে আসবে তাকে।

চুপ করে বলে চেয়ে চেয়ে দেখ চারিদিকে কি ঘটছে। জীবন-এতকণ দিনের আলোর ঘুমিয়ে ছিল, রাজির চরণস্পর্শে জেগে উঠল। সবই নবীন, সবই প্রাণচকল।

কাহাকাছি আসবে রাজি, শেবে তোমার পাশটিতে এসে বলে পড়বে নিবিড় হয়ে, তার কালো শাড়ির আঁচল দিয়ে তোমাকে ঢেকে নিয়ে। তখন তার কাঁধে মাথা রেখে শোন তার মনের কথা, তার অন্তরের বেদনার কাহিনী। তার কেশের নানারকম বনফুলের স্বাসে তোমার নিশ্বাস পূর্ণ হয়ে যাবে, বুক ডরে উঠবে। একান্ত করে রাজিকে পেয়ে নিজেকে খুঁজ মনে হবে। তার মনের কথায় তোমার মন কানার কানার পূর্ণ হয়ে উঠবে।

আকাশে যখন চাঁদ থাকে তখন রাজি কথা কর না। বললেও সে বক্ত গোলমেলে সব আলাপ। সে প্রগল্ভতা, সে হলছলানি না শোনাই ভাল। মাথা ধরাপ করে দেয়।

কিন্তু সেদিন সেই ঘোর অসামান্য বরষামুহুরের মাঝে আলকাতরার মত বন আধারে ভাসতে ভাসতে ডুবতে ডুবতে রাজির অস্ত্র জাতের আলাপ মর্মে গিয়ে বিধল। রাজি কানছে, শুমরে শুমরে কানছে। সে কারার কোনও মানে নেই, কোনও ভাষা নেই। সে শুধু অসহীন হতাশার চরম ব্যাকুলতা ভিন্ন আর কিছু নয়।

লম্বা দলটি অনিষ্ট হয়ে উঠেছে। সকলের গায়ের সঙ্গে গা ঠেকছে। উঠের উপর থেকে তৈরবী বললেন, “আরি বেবে হেঁটে যাব। এখানে ভাল লাগছে না।”

দিলমহম্মদ উর্বরীর গলার নীচে, আমি ভানপাশে। অন্য সকলেও উটটাকে ঘিরে চলেছে। মাত্র হাত দুই তিন উপরে ভৈরবী, তবু তাঁর একলা একলা মনে হচ্ছে।

ধিকরালের একহাত কুস্তী, একহাত পোপটলাল ধরে নিয়ে চলেছেন। মাঝে মাঝে কুস্তী হুমড়ি খেয়ে এসে আমার উপর পড়ছে, ঠিক আমার পেছনেই সে আছে কিনা। সুখলালের হাত ধরে আছি আমি এবং ধরে আছি কি না এ সংবাদটি মাঝে মাঝে ভৈরবী নিচ্ছেন। ছোট ছেলে সুখলাল, তাঁর মা ছেলেকে এই প্রথম এ পথে বেরতে দিয়েছেন এবং চুপি চুপি কয়েকটা কথা ভৈরবীকে বলেও দিয়েছেন।

সামনের বড় উটের গলার নীচে গুলমহম্মদ। অনেকক্ষণ তাঁর কোনও বাক্যলাপ শোনা যাচ্ছে না, এমন কি রূপলালের কণ্ঠও শুদ্ধ। কোনও লাড়া-শব্দ নেই, যদি বা কেউ কথা বলছে ত ফিসফিসিয়ে বলছে।

মহা মুশকিল হল ত! চীৎকার করে উঠলাম—

“হিংলাজ মাতা কি—”

সমবেত কণ্ঠে উত্তর হল “জয়!”

কিন্তু সে উত্তর বড় নির্জীব, বড় প্রাণহীন।

সামনে থেকে গুলমহম্মদ অনেক কিছু বলে যেতে লাগল ছেলেকে। দিলমহম্মদ কোনও উত্তর দিলে না, মনে হল একটা গোলমাল নিশ্চয়ই ঘটতে চলেছে। জিজ্ঞাসা করলাম দিলমহম্মদকে, কি বললে তার বাবা।

সে উত্তর দিলে, “ঠিক বোঝা যাচ্ছে না আমরা কোন্ দিকে চলেছি।”

এতক্ষণ পরে রূপলাল কথা বললে, “ভবে এখানেই থামলে হয়, আকাশে তারা উঠলে আবার চলা যাবে।”

গুলমহম্মদ উত্তর দিলে, “না, তার স্বরকার নেই। হয়ত আকাশ তুকান উঠবে, উটের উপর নির্ভর করে এগিয়ে যাওয়া চলে ভাল। আমরা মুশকিল আসান করবেন।”

ভাষণের উটকে আদর দিয়ে সাহস দিয়ে নানান কথা বলতে লাগল।

কয়েকজন একসঙ্গে বলে উঠল, হারিকেন লঠন বে-ক'টা সঙ্গে আছে সব আলিয়ে নেওয়া হোক।

বুড়া হেসে উত্তর দিলে, “জ্বলে দেখ তাতে আধার-বাড়বে বই কমবে না। আর তখন লঠনের আলোর পথ দেখাবে কে? উট চলে নাকে গন্ধ ভাঁকে। আলো জ্বাললে তখন ঐ আলোর সঙ্গে ওরা চলবে। তখন পথ দেখাতে হবে আমাদের। যতক্ষণ না আকাশে তারা ওঠে, আমরা জানব কি করে কোন দিকে বাজি।” বুড়ামাম রাঙে আকাশের তারা দেখে এরা দিক নিরূপণ করে।

না আকাশ, না পাতাল—কোনও দিকে কুলকিনারা নেই, তবুও এগিয়ে চলেছি।

এতক্ষণে গ্রীষ্মাশ্বিনের পাণ্ডে মহাশয়ের গলার আওয়াজ পাওয়া গেল। তিনি প্রাণ ভরে অপদার্থ ছড়িওয়ালটার মুণ্ডপাত করতে লাগলেন। একেবারে ভয়ানক ভয়ানক শাপ-শাপাত। মুখ বুজে শুনেছে সকলে। কে উত্তর দেবে?

শেষে তিনি কান্না জুড়ে দিলেন। তাঁর আওয়াজে নাম করে লকরণ বিলাপ। তার সঙ্গে নিজের মূর্খতার অগ্রে মর্মবেদনা। কেন তিনি এই সর্বনাশের পথে পা বাড়ালেন, কেন তিনি সকলের নিবেদন না শুনে এই ভয়ঙ্কর দেশে বেঘোরে প্রাণটা দিতে এলেন, কেন এই অজান্ত পাণ্ডাদের উপর নির্ভর করতে গেলেন। এখন তাঁর উপায় হবে কি? তাঁর যে ঘরে এই আছে, শুই আছে। এই সমস্ত কিয়দান্তি বলে বলে তাঁর কাতর কন্ডন একটামা চলতে লাগল।

আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে পাণ্ডের মহাবিপত্তির কথাটি পোপটলাল জানালেন। বছর দুই পূর্বে তাঁর স্ত্রীবিয়োগ হয়। তাঁর বড় ছেলের ছেলে-মেয়েতে সংসার ভরতি। তা হলে কি হবে—ওঁর মন বাঁধল না। আবার একটি বিবাহ করেছেন। হিংলাজ-বাতার ক্রপাতেই এই বয়সে তা সম্ভব হয়েছে বলে ওঁর বিশ্বাস। সেই জন্তে যাদের মানত পূজা দিতে চলেছেন। যাদের নবপত্নীতা বধু কাছেই একটু বেশি বেসামাল উনি হবেন বৈ কি।

শ্রী পাণ্ডুর শিয়ালেবকেরা একত্রে ধরে নিয়ে বাচ্ছিল। তারা খামল কার্পাস একত্রে পুনরায় জ্বলে বাবার প্রয়োজন হয়েছে। আমাদের সকলকেই ধাক্কাতে হল। ভৈরবীও নেমে এলেন। রূপলাল কলকেতে আগুন দিলে।

শুলকমহম্মদকে জিজ্ঞাসা করলাম, “কি বাপু, গধ ঠিক আছে ত?”

উত্তর : “খোদা কা মালুম।”

সারখান থেকে কুতী হঠাৎ বলে উঠল, “একেবারে চিরদিনের মত আমরা হারিয়ে যাই ত বেশ হয়। সবসে আচ্ছা হয়। সারা জীবন এইভাবে ঘুরে ঘুরে কাটাই। বাঁচা যায়।”

তার ভাগ্য ভাল, পাণ্ডু ছিলেন না। কথাটা তাঁর কানে গেল না।

ভৈরবী আর উটের উপর উঠলেন না। উটের উপর শুল্ক খাটিয়া থাকাত ভয়ানক নিয়মবিরুদ্ধ। উটওয়ালারা কায়মনোবাক্যে বিবাল করে যে উটের পিঠে শুল্ক আসন থাকলে তাতে জিন চড়ে বসে। আর এই মরুভূমির জিনেরা লাংঘাতিক বদ্ জাতের। সুবিধা পেলেই লোককে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মারে।

হুতরাং কুতী আর বিরুমলকে চড়িয়ে দেওয়া হল। পাণ্ডু কিরে এলে আবার আমরা অগ্রসর হলাম।

এবার আমার চাদরের খুঁট একহাতে বাগিয়ে ধরে আর এক হাতে সুখ-লালের একখানা হাত ধরে ভৈরবী হাঁটতে লাগলেন। আবার সকলেই নীরব হয়ে পড়ল।

আরও অনেকটা চলার পর উটওয়ালারা পিতাপুত্র কি-সমস্ত আলোচনা জুড়ে দিলে। সে ভাবার বিম্ববিসর্গও বুঝলাম না বটে, তবে এটুকু বুঝতে পারিও কষ্ট হল না যে, অসাব্যস্তার রাজ্যে অন্তলম্পর্নী অন্ধকারের মধ্যে আমরা হারিয়ে গিয়েছি।

হারিয়ে যাওয়া ব্যাপারটা অনেক রকমে ঘটে থাকে। একরকমের হারিয়ে যাওয়া আছে সে বড় বজার ব্যাপার। কেউ হারিয়ে গেলে তার

আত্মীয়স্বজন গাঁটের কড়ি খরচ করে সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন ছাপান :
“বাবা গোপাল, এবার ফিরে এস, তোমার ঠানদিদি বৃত্তান্তব্যাখ্যা, শেষ দেখাটা
দেখে যাও। টাকা আর প্রয়োজন হলে জানাও। ইতি তোমার শিসিমা।”
কিংবা এ ধরনের লেখাও বেয়োর, “মানিক আবার, তোমার সমস্ত
অপরাধ কমা করেছে, সবাই সব ফুলে গেছে, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হবে, ফিরে
এস।”

সন্ধ্যাবেলা রেডিওতে শোনা যায় “পাঁচ ফুট পৌনে তিন ইঞ্চি লম্বা আর
এক ফুট আড়াই ইঞ্চি বৃকের ছাতি, সুখময় ত্রণ, এক চোখ ট্যারা,
পরনে হাক প্যাণ্ট আর হাওরাই শার্ট শ্রীমান নন্দ, বয়স সাত্ত্ব একশ, গত একশ
দিন নিকরেশ। সংবাদ পেলে অল ইণ্ডিয়া রেডিও কলকাতার স্টেশন
ভিক্টোরিয়ার কাছে অথবা লালবাজারে ছুটে চলে আহ্নন।”

এ জাতের হারানোতে বলা আছে। খবরের কাগজে নাম ছাপা হল,
রেডিওতে নাম শোনা গেল। তারপর টাকা পেয়ে বাড়ি ফিরে চর্ব্যচূষ্য
আদর-আপ্যাসন ত আছেই। দেখা গেল, যে সন্ধ্যার ভক্ত গা ঢাকা দেওয়ার
প্রয়োজন হয়েছিল তাও বেমানান মিটেসিটে গেছে।

আবার বড় বড় মেলায় গিয়ে হারিয়ে যাওয়া আছে। বহু লোকজন
দোকানপাটে চারিদিক অমজমট, তার তিতর মাঝে মাঝে সকলের সকল
রকম আওরাজের উদ্দেশ্যে ঘোষণা করা হচ্ছে, “কেওড়াডলার শ্রীকামিনীবরদেব ধর,
আপনি এখনই আমাদের অফিসে চলে আহ্নন। আপনার স্ত্রী এখানে দাঁড়িয়ে
কঁদে সারা হয়ে যাচ্ছেন।” এও বড় কথ কথ। নর। মেলায়ও সকলে জানল
কেওড়াডলার শ্রীকামিনীবরদেবের নাম এবং তাঁর স্ত্রী যে তাঁর ভক্ত চোখের জল
ফেলছেন সে কথাটাও।

আবার আর এক রকমের হারানো আছে, তাতে অনেকের জিন্দে জল
এসে যায়। খানার বা আহ্নালতের দেওয়ালে লটকে দেওয়া হল একখানি
ছবি, সেই ছবির নীচে এক ঘোষণা। ঘোষণায় বলা হচ্ছে যে, বাবু ছবি ভিডি

হারিয়েছেন এবং তাঁকে পাঁচড়াও করবার মত নির্ভরযোগ্য সংবাদ দিতে পারলে সরকার এত হাজার টাকা পুরস্কার দেবেন। ঐ টাকার অকটাই ভিতে জল আনবার কারণ।

এ সমস্ত ছাড়াও এক রকমের হারানো আছে, সে একেবারে নির্ভেজাল হারানো। হারাধনবাবু এক শ পঞ্চাশ টাকার কেয়ানি। বয়স হয়েছে। বড় ছেলেরা এবার বি এ দেবে। হারাধনবাবু সাহেবকে বলে বেখেছেন, পাশ করলেই আকিসে ঢুকিয়ে দেবেন ছেলেকে। ছেলেরা পরীক্ষা দিলে ভাল ভাবেই। কল বেরবার আগের আগের দিন রাতে ছেলে ঘুমতে ঘুমতে কানতে আরম্ভ করলে, কানতে কানতে বসি। তাড়াতাড়ি ছেলের মা গেলেন আলো নিয়ে। গিরে দেখেন—শুধু বসি নয়, রক্ত বসি, হড় হড় করে কাঁচা রক্ত বেরচ্ছে, বড়ই হয় না। বাক, রাত ত কোনও রকমে কাটল।

পরের দিন আকিসে বলে হারাধনবাবু কাইল কাবার করছেন এমন সময় একটি ছোট্ট সংবাদ কানে গেল। বে অব্ বেঙ্গল ব্যাঙ্ক হঠাৎ বেলা একটার সময় বন্ধ করা করেছিল। হারাধনবাবুর আজীবনের সঞ্চয় আর তাঁর পিতার কাছ থেকে পাওয়া বা কিছু ঐ ব্যাঙ্কেই জমা ছিল। ব্যাঙ্কটি ছিল খ্রীষ্ট ১০৮ খ্রীঃমুকানন্দ বাবার আলীদানপুত, টাকাটাও হারাধন ঐ ব্যাঙ্কে তরসা করে রেখেছিলেন সেই কারণেই। হারাধনবাবু হারিয়ে গেলেন। নিজের আকিসে নিজের চেয়ারে বসে হারিয়ে গেলেন। এমন উধাও হয়ে হারিয়ে গেলেন যে ইহলোকে কেউ আর তাঁর পাত্তা পেল না।

এই ভাবের নানা প্রকার হারানো পৃথিবীতে চালু আছে। কিন্তু সেই রাতে আমাদের একদল লোকের উট ছুটি সহ হারানো হচ্ছে অল্প ব্যাধার। তার সঙ্গে কোনও কিছুর তুলনাই হয় না।

পা ফেলছি, এগিয়েও চলেছি, কিন্তু কোথা? কোন্ দিকে? কে তার উত্তর দেবে। উত্তর দিতে পারে উট, কিন্তু তারাও মাঝে মাঝে খেমে মাথা উঠু করে এখার-ওখার মুখ ঘুরিয়ে নিখাস নিচ্ছে, মানে সন্দেহ আগছে তাদের মনেও।

চারিদিক—উপর নীচ সমস্ত লেপে পুঁছে একাকার হয়ে গিয়েছে। হু হাত দূরেও কিছু দেখা যাচ্ছে না। আরও দূরে কি আছে, নামনে কিসের উপর গিড়ে পড়ব, কিসের সঙ্গে ধাক্কা খাব কেউ বলতে পারে না। যদি উন্টে দিকেই আমাদের গতি হয় তবে সাবাসাত এইভাবে চলে কোথায় কতদূরে গিয়ে পৌঁছব, কুয়ো থেকে কত দূরে গিয়ে পড়ব তারই বা ঠিক কি। আবার বধন দিনের আলোর তুল বুঝতে পারা যাবে শুধন সেই প্রথম তারে কুয়োর কাছে কিরে ঘাবার সামর্থ্য শরীরে থাকবে কি না, কিংবা সেই পর্বত কুঁজোর জলে চলবে কিনা তাই বা কে বলতে পারে। ঐ অন্ধকারের উদয়ের মধ্যে কি বে আছে আমাদের ভাগ্যে—উন্টে-পাণ্টে এই এক প্রশ্ন মনে মনে ভোলাপাড়া করতে করতে সত্যিই নিজেকে নিজে হারিয়ে কেলসায়।

মৃত্যু জিনিসটা ভাল না মন্দ, ভেতো না মিটি, এ ধরনের প্রশ্নের শানানো জবাব হয়ত দেওয়া যায়। শুনে প্রশ্নকর্তার মুখ বন্ধ হবেই তাতে আর কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু মৃত্যু যে সত্যিই কি পদার্থ তা জানবার অতৃপ্ত হৃদয় নিরুত্তি কিছুতেই হবে না। এই যে অজানা অন্ধকার জগৎটা, যার মধ্যে বাধ্য হয়ে এগিয়ে চলেছি পারে পারে, এই-ই মৃত্যু। একবার জানা হয়ে গেলে মৃত্যুর সমস্ত মহিমার ইতি হয় সেখানেই। অজানা আর অনাস্বাদিত থাকে বলেই মৃত্যুকে আমাদের এত সমীহ করে চলা, এত পাশ কাটাবার চেষ্টা। জানা হয়ে গেলে ওর মধ্যে আর কিছুই থাকে না।

ছুনিবার আকর্ষণে আমরা ধীরে ধীরে সেই অজানা অনাস্বাদিতপূর্ব মৃত্যুর জগতে প্রবেশ করতে লাগলাম।

প্রতি পদক্ষেপের সঙ্গে সারা অতীত কালটা তার সবটুকু বায়ু নিয়ে পু ছুটি জড়িয়ে ধরতে লাগল। হারিয়ে যাওয়া দিনগুলির খুঁটিনাটি ভুলহাতি-ভুলহাতি লাভ-লোকসান প্রত্যেকটি বিরাট আকারে ধারণ করে উপরে ভেসে উঠল বা এতকাল তুলিয়ে ছিল বিস্তৃতির অতল তলে। যে জীবনটাকে কেবল-

যদি একটি বড়বড় কাকি ভিন্ন অন্য কিছুই কোনও দিন মনে করতে পারি নি সেই জীবন সাতরাজার খন মানিক হয়ে এমন মহিমার মহিমাস্বিত হয়ে উঠল যে তাকে আঁকড়ে ধরে পড়ে থাকটাই চরম শান্তি বলে মনে হতে লাগল। আজ পর্বত পথ চলতে বড় ঠোঁটের খেঁচোছি, সে সব আঘাত সে সমস্ত জাতির কথা বেরানুম ভুলে গেলাম। সারা জীবনভোর না পাওয়ার স্ক্রু আক্রোশ, আর হাতে পেয়ে হারানোর অস্ত্রে বুক চাপড়ে হাহাকার, এ সমস্তই কোথায় তুলিয়ে গেল। পদ্মদীপির হাতমুখী ফুলগুলির মত চোখ জুড়িয়ে ভাসতে লাগল কণিকের অস্ত্রে পাওয়া মধুময় মণিমুক্তাগুলি। আর সবই পাক পানার মত চোখের আড়ালে ডুবে রইল। নিজে নিজেকে এ হেন কমান্ডের দৃষ্টিতে দেখলাম যে, এঁকে ছেড়ে যেতে বৃকের ভিতরটা মোচড় দিয়ে উঠল। হার জীবন।

তবুও অন্ধের মত এগিয়ে চলেছি নিয়তির করাল গ্রাসের মধ্যে।

অসংখ্য ছোটবড় 'বদি' চারিদিক থেকে মনের মধ্যে উকিরু'কি দিতে লাগল। বদি কোনও রকমে আজ পরিজ্ঞান পাওয়া যায়, বদি সামনেই হঠাৎ এমন এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটে বার কলে একটি স্থলীতল জলের কুয়া আর মাথা ঘোঁড়বার আজগুয়ান দুইই বার জুটে, বদি কোনও অপার্থিব ইঙ্গিত পাওয়া বার বার অল্পস্বরণ করে ঠিক-পথটি আমরা ধরতে পারি, বদি দ্বা হিংলাজ তাঁর কোনও এক চর-অচর্যের হাত্রে একটি প্রকাণ্ড মশাল দিয়ে পাঠিয়ে দেন বার আলোর অন্ধকারের পর্দাটা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। এই সমস্ত সম্ভাব্য অসম্ভাব্য 'বদি'র পর ভবিষ্যৎ বলতে বদি কিছু থাকে—তবে সেই ভবিষ্যতের গর্ভে আছে মধু—সুধু মধু। মধু নয়, একেবারে অমৃত, অমৃতের নদী করে বাবে সেই ভবিষ্যতে। সেই ভবিষ্যটাকে রূপে রূপে কর্ণে গর্ভে এমন অপকল্প করে পড়ে তুললাম যে তার ছটার নিম্নেই মোহিত হয়ে গেলাম। আমারই হৃষ্ট আকাশকুহলের সৌন্দর্য আর কাকিকারের দিকে চেয়ে চেয়ে আমারই বেশা চড়ে যেতে লাগল।

সেই ভবিষ্যতে স্থপা মেই, কোথ নেই, কোথ হিংসা মায়াযারি খেয়োখেরি এ সমস্ত কোনও খুঁত নেই। হীরা-মাণিক্যের ইট দ্বিগে গঁথে গঁথে সেই সোনার ভবিষ্যৎ-সৌখটিকে আকাশচুম্বী করে তুললাম। তারপর অকস্মাৎ জীবন্ত বর্তমানের সঙ্গে লাগল এক বিবর ধাক্কা, নিমেষে আমার এত সাধের সোনার ভবিষ্যৎ ধূলিসাৎ হয়ে গেল।

উটের উপরে কুন্তী চাপা গলার বলে উঠল—“উঃ, ছাড়—নাগে যে, ছিঃ।”

উন্মাদ বিকমল হি হি করে হেসে উঠল—লজ্জাহীন হাসি।

সামান্য ধস্তাধস্তির শব্দ কানে এল।

পুনরায় কুন্তী সামান্য কাতর শব্দ করলে। সঙ্গে সঙ্গে ঠাস করে একটি ছোট্ট চড়ের শব্দ কানে গেল।

আবার সেই হি হি করে হান্তধ্বনি।

বর্তমানের বুকের চাপে ভবিষ্যতের নিঃশ্বাস বন্ধ হবার উপক্রম।

হঠাৎ সামনে থেকে বৃদ্ধ গুলমহম্মদ তীক্ষ্ণকণ্ঠে চীৎকার করে উঠল—
“হঁশিয়ার, তুকান!”

নিমেষে সমস্ত দলটার গতি বৃদ্ধ হয়ে গেল। কানে এল শেঁ! শেঁ! গৌ গৌ আওরাহ। যেন একপাল বজ্রজন্তু বহু দূর থেকে ভেড়ে আসছে। আমরা গারে গারে খেঁবাখেঁবি করে দাঁড়িয়ে পড়লাম।

রূপলাল চোঁচাতে লাগল, “বলে পড়, বলে পড় সবাই, মাটি কামড়ে বলে পড়।”

দিলমহম্মদ উর্বশীকে বসাতে লাগল “হা-হেঁ-টা-টা!” উর্বশী বসতে না বসতে কুন্তী লাফিয়ে পড়ল মাটিতে তৈরবীর পাশে। নেমেই তৈরবীকে হুঁহাতে আগটে ধরলে।

মাথার উপর দিয়ে প্রচণ্ড বেগে ছুটে চলে গেল প্রকাণ্ড এক বাঘির পাহাড়।

দিলমহম্মদ একটানে বিকমলকে নাক্ষিরে আনল মাটির থেকে। সোপটলাল

তাকে চেপে ধরে বালির উপর শুয়ে পড়লেন। আমরা উপুড় হয়ে পড়ে বালিতে মুখ ডুবে দিলাম।

মহা হুলস্থূল কাণ্ড বেধে গেল আমাদের উপর। বেন হাজার হাজার মৃত্ত হস্তী মহাশূন্তে জানশূন্ত হয়ে লড়ছে। জাপটা-জাপটি আহড়া-আহড়ির শব্দ শব্দ মধ্য চরমসীমায় পৌঁছল। তার সঙ্গে এক ভয়ঙ্কর দৈত্য কড় কড় কড়া শব্দে তার বিরাট খাবার হস্তীক নখ দিয়ে নিরেট অঙ্ককারটাকে চিবতে লাগল। একই সঙ্গে চলতে লাগল সবকিছু। নিশ্বাস বন্ধ করে আমরা পড়ে রইলাম বালিতে মুখ ডুবে।

ছুটে এল কারা মহাশূন্ত থেকে জল ঢালতে ঢালতে, চলেও গেল নিমেষের মধ্যে। আবার আর একদল এল, চলেও গেল তৎক্ষণাৎ। দলে দলে বরুণ দেবের অমুচরেরা মহাবিক্রমে জল ছুঁড়তে ছুঁড়তে করলে তাড়া বারা অনর্থক কেলেঙ্কারি করছিল—ঘৃণ আর বালুর বাগটাগুলোকে। বেঁটেরে তাড়িয়ে নিয়ে চলে গেল তাদের একদিকে।

ধীরে ধীরে সকলে উঠে বসলাম। বসে প্রথমে দম নিলাম। শরীরের উপর দাঁকিত বালি জমেছিল। তার উপর জল পড়ে সে এক জমাট আন্তরণে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। আর কিছুক্ষণ ধরে এ ব্যাপার চললে একেবারে জীবন্ত সমাধি হয়ে যেত। বালি বেড়ে সবাই উঠে দাঁড়ালাম। সব ঠিক আছে, লম্বা হাতি বা ভিজেছে তাতে কোনও ক্ষতি হয় নি, বরং প্রাণ জুড়িয়ে গেছে বলা চলে।

ছুটো হারিকেন লঠন জালিয়ে মাগপজ পরীক্ষা করে দেখা হল। উটদের দাঁড় করিয়ে গুলমহম্মদ পরম আদরে তাদের গলার হাত বুলিয়ে সাবাস দিলে। আকাশে দেখা গেল—ঐ ছায়াপথ, ঐ ক্রবতারা। আমরা ঠিক পথেই এসেছি। কুরো আর বেশি দূরে নয়।

রুশলাল টেচিয়ে উঠল “হিংলাজ যাতা দেবীকি—”, প্রাণভরে সবাই মুক্তকণ্ঠে জবাব দিলে “জয়”, আবার আমরা অগ্রসর হলাম।

কুতী আর কিছুতেই থিরমলের সঙ্গে চলতে রাজি নয়। সে আবার ভৈরবীর সঙ্গে ধরলে। হিংলাজ-মাতাকে দর্শন করতে চলেছে সে, পথে কোন পাশ কোন অস্ত্রের খেন আর তাকে স্পর্শ করতে না পারে। রূপাল চাপড়ে কাঁদতে লাগল কুতী। বখেই লাহনা হয়েছে তার, আর না। এবার তাকে বাঁচতে হবে। মায়ের স্থানে পৌঁছে মায়ের দর্শন পেলে তার সমস্ত কলুষ সকল কালিয়া নিঃশেষে ধুয়ে মুছে যাবে। আবার সে কিরে পাবে আগেকার জীবন, কিরে পাবে রাজস্থানের সম্মানী ভোতদারের শান্ত পবিত্র কন্ডার নিজস্ব স্থানটুকু। সম্মান, আশ্রয়, সমাজ-জীবন, সব কিছু আবার কিরে পাবে সে মায়ের রূপার। আর তা যদি না হয় তবে চিরকালের জন্য ভৈরবীর আশ্রয়—ঐ গেরুয়া ঐ কমণ্ডলু আর ঐ সিন্দূর মাখানো ত্রিশূল। ভৈরবীর পায়ের উপর আছড়ে পড়ল সে—পড়ে মাথা খুঁড়তে লাগল। তাকে বাঁচাতেই হবে। তাকে ঐ পাশ থিরমল আবার যদি স্পর্শ করে তবে তার হিংলাজ দর্শন ভাগ্যে ঘটবে না কিছুতেই।

কুতীকে নিয়ে ভৈরবী উটের পিঠে চড়লেন। থিরমলকে নিয়ে পোপটলাল এগিয়ে গেলেন। তখনও সে সমানে কিক কিক করে হাসছে। তাকে নিয়ে সকলে যে জুড় আলোচনা করছে সে সমস্ত তার কানেই ঢুকছে না। হিতাহিতজানটুকু হারালে ঐ একমাত্র শান্তি, লোকের নিন্দা-কটাক্ষের পরোয়াও থাকে না।

তারপর ‘আর বেশি দূর নয়’ যে কুরো তার কাছে আমরা পৌঁছলাম আরও ঘণ্টা তিনেক পরে।

সেখানে একটা গাছের তলা পর্যন্ত জুটল না। কুরোর ধারেই উচু জায়গায় ভাগে ভাগে আসন পাতা হল। কুতী আর সুখলালকে নিয়ে ভৈরবী একবারে কবল বিছালেন, আমার কবল তার সামনেই পাতা হল। শুদের মাথার দিকে উট দুটিকে বসিয়ে মালপত্র তার পাশে টাল দিয়ে রাখা হল। উটের ওপায়ে রূপলাল আর পোপটলাল থিরমলকে নিয়ে শোবার ব্যবস্থা করলেন। অস্ত্র সকলে কাছাকাছি কবল বিছালে।

ঈশ্বরানন্দের তাঁর শিশুসেবকদের নিয়ে কুমার ওপারে শুঁহিরে বসলেন। সকলের থেকে আলাদা থাকাই তাঁর প্রয়োজন। একে তাঁর তীক্ষ্ণ ব্রাহ্মণ্য, জ্ঞান উপর শরীরের বা অবস্থা, তাতে বাকি রাতটুকুতে কতবার লোটা হাতে ছুটতে হবে তার ঠিক নেই।

শুলকহৃদয় লম্বা ঠিকঠাক করে এসে আমার কাছে বসল। বললে, “হুজুর কেন গোসল করে নিলেন না? বাসুর ঝড়েতে ভয়ানক তকলিক হয়েছে নিশ্চয়ই। গোসল করলে আমার পেতেন।”

বললাম, “তা শু শেতার। কিন্তু এ সময় জল কোথায় পাব?”

সে বললে, “এখানে কুরোর ধারে দাঁড়িয়ে জল তোলবার ব্যবস্থা আছে। চলুন জল উঠিয়ে দিচ্ছি।”

বুঝলাম, নিশ্চয়ই চারের প্রয়োজন হয়েছে বুড়া মাহুবাটির। বললাম, “তা চল, তার আগে বরং দিলমহম্মদকে বলে দাও—একটু চারের জল গরম করতে, যদি এ সময় কাঠকুটো কিছু জোটে।”

এই-ই চাইছিল সে। বললে, “বহুত খুব। আগুন জলবে না কেন? কি আকস্মিকের বাত। আমিই আগুন জালাচ্ছি, বাচ্চা আপনার জল তুলে দিক।” হাঁক দিয়ে ছেলেকে যোধ হর সেই হুজুমই করলে।

ভৈরবীকে বললাম, “মাথা ধুয়ে কেলতে চাও ত উঠে এস।” দড়ি বাগতি আর হাড়ি নিয়ে ভৈরবী এগিয়ে এলেন।

কুন্তী উঠে গেল চা করতে। বড় সামান্যই হোক, সকলের সেবা—সে সর্বদা প্রস্তুত। তবে আজ সে বড় গম্ভীর হয়ে পড়েছে। যে লীলাচকল তারিখি এই কদিন বজায় ছিল, রাত্তার সেই ঘটনার পর থেকে সেটুকু কোথায় মিলিয়ে গিয়েছে।

ওপারে তখন আগুন জলে উঠেছে, সে আগুন অবশ্য জলছে বড় কলকের মাধ্যমে।

এখানে কুরোর ধারে একখানা বড় কাঠ পড়ে আছে, তার উপর দাঁড়িয়ে জল

তোলা গেল। একখানা ছোট কার্টের তোড়াও আছে সেখানে। সেই তোড়াতে উঠে ছাগলে জল খায়। বাগতি করে জল তুলে হাঁড়ির মুখে গামছা বেঁধে ছেকে নেওয়া হল। জলে বড় চুর্গছ। বাক—তবুও ঠাণ্ডা জল, একরকম পান করেই এলাম আমরা।

রূপলালকে ডেকে তার আর বিক্রমলের চা নিয়ে যেতে বললাম। বিক্রমল ঘুমিয়ে পড়েছে। পোপটলাল ত চা খানই না। আমি গুলমহম্মদ আর রূপলাল আরাম-সে-আরাম করে সেই শেষ রাতে চা পান করলাম। তারপর শয়ন।

ঠাণ্ডা হাওয়ার শীত করতে লাগল। মশারাত এখানে থাকেন না। চোখ জুড়ে এল।

ঘুম ভাঙল স্বপ্ন দেখতে দেখতে। চমৎকার মিঠা হাতের হারমোনিয়াম বাজছে কোথায়। অতি দ্রুত তালের একটি সুর। স্বরের বেগে একবার উঠছে চড়া পর্দার, পরক্ষণেই নেমে বাজছে খাদে। স্বাবে স্বাবে খেমে খেমে তালে তালে আবার এগিয়ে আসছে। স্বরের বেন জাল বুনে চলেছে, সে স্বরের মুছ'নার স্বাদকতা আছে, বেশ ঘোর লেগে গেল। একটু পরে মনে হল, একি, স্বপ্ন নয় ত, সত্যিই যে বাজনা শুনিছি! চোখ চেয়ে উঠে বসলাম।

হাঁ, সত্যিই হারমোনিয়াম বাজছে, বাজাচ্ছে বিক্রমল। সবাই তাকে ঘিরে বসেছে। সে চোখ বুজে হাত চালাচ্ছে সেই ছোট হারমোনিয়ামটির উপর।

ভৈরবী তখনও নিদ্রামগ্ন, তাঁর পাশে গালে হাত দিয়ে বলে আছে কুন্তী। একদৃষ্টে সে চেয়ে আছে বিক্রমলের দিকে। মাঝখান থেকে উট ছুটি উঠে বাওয়ার আর আড়াল নেই। কুন্তীর দুই চোখ থেকে ছুটি জলের ধারা নেমেছে। গাল বেয়ে সেই অজ্ঞানারা গড়িয়ে পড়ছে তার বুকে, টেরও পাচ্ছে না কুন্তী।

ভোয়ের ঠাণ্ডা হাওয়া তখনও বইছে, একটু পরেই সূর্যদেব উঠে আসবেন। তখন সন্ধ্যাই তেতে উঠবে। পারের তলার বাসু, মাথার উপরের আকাশ এবং সঙ্গে সঙ্গে মাহবুবের মেলাদণ্ড। কিন্তু আরও একটু বিলম্ব আছে তার।

গালে হাত দিয়ে বসা অশ্রুযুগ্মী কুস্তীকে অন্য রকম দেখাচ্ছে। লাস্তময়ী এক তরুণীর আবরণে মমতাময়ী মাহবুবের মূর্তি, করুণার প্রতিমাখানি। চুপ করে বসে রইলাম, হারমোনিয়াম বেজেই চলল।

ওধারে হঠাৎ কি হল এই ভোর বেলায়! একসঙ্গে চীৎকার গালাগালি ঝগড়া সব মিলিয়ে মহা গোলমাল বেধে গেল। আমরা যেখানে শুয়ে-বসে রয়েছি সেখান থেকে ব্যাথারটা দেখা যাচ্ছে না। মাঝখানে একটা বালির টিলার আড়াল পড়েছে। অনেক গলার আওয়াজের সঙ্গে মাঝে মাঝে গুল-মহমদের গলাও শোনা যেতে লাগল। রূপলাল এবং আরও দু'চারজন উঠে গেল।

খাচলে চোখের জল মুছে কুস্তী উঠে গিয়ে দাঁড়াল থিকমলের সামনে। খামল বাজনা। মুখ তুলে কুস্তীর দিকে চেয়ে থিকমল মধুর হাসি হাসলে। স্পষ্ট দেখতে পেলাম সে হাসি সে নৃষ্টি ইন্দিতমুখর, প্রাণময়—উন্নাদের অর্থহীন প্রলাপ নয়।

কুস্তী বললে, “উঠে এস, মুখ হাত ধুয়ে নাও।”

হারমোনিয়াম ঠেলে রেখে থিকমল উঠে দাঁড়াল। চারিদিকে একবার চোখ ঘুলিয়ে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, “আমরা কোথায় বাচ্ছি?”

“কেন, তুমি কি ভুলে গেলে না কি—আমরা হিংলাজ-মাহবুবের দর্শন করতে বাচ্ছি, তোমার মনে পড়ছে না?” এই বলে কুস্তী বোধ করি যা হিংলাজের উদ্দেশ্যেই হাত জোড় করে কপালে ঠেকালে।

থিকমল মাথা হেঁট করে পারের দিকে চেয়ে তার কক চুলের ভিতর আঙুল চালাতে লাগল। কোথায় যেন খেঁই হারিয়ে কেলোছে, খুঁজছে।

কুস্তী এগিয়ে এসে তার হাত ধরলে, “চল এখন, মুখ হাত ধোবে।”

শান্ত ছেলোটের মত চলে গেল খিকমল কুড়ীর সঙ্গে। এক মোটা জল নিয়ে গেল কুড়ী।

ভৈরবী মুখের উপর থেকে চাদর সরিয়ে বললেন, “বাক, বাঁচা গেল। এবার ছেলোট হাঁশ ফিরে পাচ্ছে। মা নিশ্চয়ই মুখ তুলে চাইবেন—নয়ত মেয়েটার গতি হবে কি?”

বলেই তিনি উঠে বসলেন।

ওখানে গুগুগোলটা বেড়েই চলেছে। কার সঙ্গে কার ঝগড়া হচ্ছে আর কি নিয়েই বা লাগল ঝগড়া? ভাবছি উঠে বাব কি না।

ভৈরবী বললেন, “কোথাও একগাছা বড়কুটোও নেই এখানে। চারিদিক একেবারে খাঁ খাঁ করছে। কে জানে আজ এখানে কি করে সারাদিন থাকা হবে।”

তাই-ই হল। যোদেব তখন এত তেজ বে চোখ চাওয়া যায় না, বালিও তেতে আগুন, সূর্যদেব ঠিক মাথার উপরে এসে রক্তচক্ষু করে চেয়ে আছেন আমাদের দিকে। সেই সময় আমাদের উঠতে হল সেখান থেকে। না উঠে উপায় ছিল না।

বহু চেষ্টা করেও আগুন জালাবার মত কিছুই জুটল না। তখন আটা জলে গুলে তার সঙ্গে গুড় মিশিয়ে বে মতটা পারলে গিললে। আমাদের বরাতে কাঁচা চীনা বাদাম আর খেজুর। সবচেয়ে বড় চুখ, উর্বশী আর তার মা ত্রেক জল খেয়ে রইল। জলও তেমনি, যেমন বিস্মাদ আর দুর্গন্ধ তেমনি নোংরা। তাই হেঁকে হেঁকে কুঁজো তরতি করা হল। প্রত্যেকের কুঁজোর ভৈরবী সাম্রাজ্য করে কর্পূর দিয়ে দিলেন। আমি সহযাত্রীদের ছুটো করে পৈয়াজ নিতে অহরোধ করলাম।

এই জালানির অস্ত্রেই সকালে হাঙ্গামা বেধে গিয়েছিল এখানকার কুরো-গুজালার সঙ্গে। লোকটিকে প্রেতের মত দেখতে। লম্বা সাধারণ একটা মাল্লবের দেড়গুণ হবে তার শরীর, কিন্তু সেই দীর্ঘ শরীর শুধু একখানা শুকনো কৌচকানো চামড়া ঢাকা একটা প্রকাণ্ড ককাল ছাড়া আর কিছু নয়।

সাজপোশাক বলতে বা কিছু ওর গায়ে ঝোলানো আর মাথায় জড়ানো রয়েছে তার কোনও নার না দেওয়াই ভাল। কালি কালি লম্বা ছেঁড়া কতকগুলো স্নাকড়ার টুকরো বা এককালে হয়ত ওর পারজামাই ছিল—তাই কোমর থেকে ঝুলছে। ওই একই অবস্থার একটা কিছু গলার ঝোলানো আছে—তাতে নামনে পিছনে কিছুই ঢাকা পড়ে নি। আর মাথায় বা জড়ানো আছে তাকে স্নাকড়াও বলা চলে না। সবচেয়ে ভীষণ ওর কোটিরগত চক্ষুর দৃষ্টি। সে দৃষ্টিতে অলজ্ঞানত স্ত্রী বা বহুদূর থেকে লম্বা দিহা লক লক করে ছুটে আসছে।

মহাত্মিকের এই জীবন্ত প্রতিমূর্তি কোথা থেকে কতকগুলো কাঁটার ভালপালা জুড়িয়ে এনে একখানা কুঁড়ে বানিয়েছে। তার মধ্যে বৃকে ছোট্ট চুকতে বসে হর। সেই ভাবেই সেই কাঁটা দিয়ে বানানো গছরের মধ্যে এই লোকটি বাস করে বেঁচে আছে। কোনও গৃহস্থ ওর কুয়ারে জল নেয় না। কারও গৃহস্থরা এই কুয়ারে জ্বিলীমানায় বাস করে না। বাস করবে কি করে? তাদের উট ছাগল থাকে কি? কেউ যদি কখনও এই পথে যায় তবে উটকে খানিক জল খাওয়ায়। আর এই মনুষ্যসন্তান এখানে পড়ে আছে তার অসহীন স্ত্রী নিয়ে। একমাত্র স্ত্রী দিয়ে স্ত্রীকে নিবৃত্ত করা ভিন্ন এর আর অন্য কোনও উপায় নেই।

আমাদের মধ্যে কে গিয়ে ওর সেই কাঁটার ভালপালা ধরে টান দিয়েছিল। কি করে বুঝবে যে ওটা একটি বাসগৃহ। আর বাবে কোথা, একটা মাহুয় নেকড়ে যেখানে এল বৃকে ছোট্ট সেই কাঁটার স্তূপের নীচে থেকে। বেরিয়ে এসেই সেই লোকটির শরীর থেকে এক খাবল মাংস ছিঁড়ে নেবার জন্তে দাঁত বাঁধ করে তেড়ে এল। ভাগ্যে সেই সময় সেখানে গুলমহম্মদ গিয়ে পড়ে, নয়ত জয়েই সে বেচারী অকা পেত নিখাঁৎ।

তারপর শুরু হয় বগড়া, যার মীমাংসা কিছুতেই হল না। হবে কি-করে মীমাংসা? টাকা পরমা দিতে বাওয়া হল, সে ছুঁড়ে কেলে দিল। আটা

দিতে বাওয়া হল, আটা নিয়ে সে করবে কি? কটি বানাবে কি দিয়ে? আগুন জালাবার সরঞ্জাম কই? একমাত্র সে সঙ্কট হবে কটি গেলে। হায় কটি! পোড়া পেটের জালাবার একমাত্র পোড়া কটি ডির আর সব কিছুই তার কাছে মূল্যহীন আবর্জনা মাত্র।

সেই কটিই আমরা দিতে পারলাম না তাকে। কেউই তাকে দেয় না। কারণ কেউই কিছু বানায় না এখানে। বানাবার ক্ষেত্রে আগুন কোথায়? কি বিড়ম্বনা।

ভৈরবী দিলেন তাকে চীনাবাদাম আর খেজুর। হিংস জন্তর ডিম্বায় তৎক্ষণাৎ সে খেতে আরম্ভ করলে। তার দৃষ্টি, তার সর্বেন্দ্রিয়, তার সমস্ত সত্তা হাউ হাউ করে চিবোতে লাগল, গিলতে লাগল। সে ভুলে গেল আশ্রমের কথা, ভুলে গেল হুনিয়ার কথা। চুপি চুপি আমরা খানিক আটা লেখানে রেখে দিয়ে পালিয়ে গেলাম।

পোপটলাল দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, “ওকেও যদি সঙ্গে নেওয়া যেত।”

একটা মানুষকে ওভাবে এখানে একলা ফেলে রেখে চলে যেতে কোথায় যেন টনটন করতে লাগল। কিন্তু কি করা বাবে।

বস্তা বস্তা আটা উটের পিঠে চলেছে। আর আমরা সকলে শূন্য উদরে সেই আটার পিছন পিছন হাঁটছি। একেই বলে ভাগ্যের পরিহাল।

নিতান্ত কাবু হয়ে পড়েছেন অশ্রদ্ধ। যেজাক তাঁর ততোধিক বিগড়ে উঠেছে। গত রাত থেকেই জ্বলে গেলে তাঁর শরীর থেকে রক্ত ছাড়া আর কিছুই বেরোয় না। দু’জনের কাছে তার বেধে কোনও প্রকারে তিনি হাঁটছেন। তাঁর দিকে আর চাওয়াই যায় না। চাইলেই একটা বিল্লী আশ্রমের প্রাণটা কেঁপে ওঠে। মাঝে মাঝে তিনি একটু করে জল খাচ্ছেন। তাঁর কাপড়ের রক্তের দাগ লেগেছে, অবস্থা এতই শোচনীয়।

ভয়ানক গভীর হয়ে পড়েছেন সদাশাস্ত্রমুখ পোপটলাল প্যাটেল। তাঁর দলের একটি কোরান ছেলে, নাম তার বপিরাম, তার জ্বর উঠেছে। সে কি

সহজ স্বর—তার মুখের দিকে তাকালে মনে হচ্ছে, এখনই চোখ মুখ কেটে রক্ত ছুটেবে চারিদিকে। শরীরের সমস্ত রক্ত বেন মুখে চোখে এসে জমা হয়েছে। হাসকান করে হাঁফাচ্ছে সে। এই রোদে তাকে একরকম বয়েই নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

হাঁটছে থিরমল, হাঁটছে কুন্তী। থিরমলকে আজ আর হাত ধরে নিয়ে যেতে হচ্ছে না। খাড় গুঁজে একমনে কি চিন্তা করতে করতে সে চলেছে। মাথার উপর আগুন ঢেলে দিচ্ছে, পায়ের তলায় গনগনে আগুন, কিন্তু কোনও অক্ষেপ নেই তার, সে আগুন চিন্তায় বিভোর।

একখানা গামছা ভিজিয়ে মাথার মুখে ঢাণা দিয়েছিলেন। কয়েক পা চলতেই সেটা শুকিয়ে কাঁঠ হয়ে গেল। জল—বার বার জল পান করছে লবাই। সেই উত্তপ্ত বিশ্বায় জল ঠোট পার হয়ে গলা দিয়ে বতদূর গিয়ে নামছে ততদূর জ্বালা করছে, শীতল হওয়া ত দূরের কথা। নিখাস বেরুচ্ছে, তাও গরম আগুন। মাঝে মাঝে খানিক চোখ বন্ধ করে চলছি। চোখ খুলে রাখলেও জ্বালা করছে, বন্ধ করে রাখলেও তাই। চতুর্দিকে মা ধরিজীর মেহ থেকে উত্তপ্ত বাষ্প উঠছে আকাশে, আর আকাশটাও বেন অনেক নীচে নেমে এসেছে। বাতাস বইছে, বেশ বেগেই বইছে বাতাস। সে বাতাস নাক দিয়ে ঢুকে বুকের ভিতরে পৌঁছে সেখানটা জালিয়ে পুড়িয়ে দিচ্ছে।

একটু জল চাইলাম ভৈরবীর কাছে। তিনি শ্রবণ করিয়ে দিলেন পেরাজের কথা, “জল আর গিলবেন না, একটা পেরাজ চিবোন।”

খাচলে মাথা মুখ চোখ ঢেকে কুন্তী হাঁটছিল আমার পিছনেই। এইবার সে টলতে লাগল। ভৈরবী উর্টের উপর থেকে দেখিয়ে দিলেন তার অবস্থা। কিন্তু উর্টই চলেছে একেবারে উপবাস করে, তার পিঠে আর একজনকে নেবার কথা বলা বার কি করে?

কুন্তীকে বললাম একটা পেরাজ চিবোতে। আরিও একটার এক কামড় মিলান। প্রথম কামড়টা বখানিয়মে উর্টকট লাগল। কিন্তু চিবিয়ে দলটা

একটু গলা দিয়ে নামতে বেশ স্বস্তি পাওয়া গেল চৰ্চন করতে লাগলার কাঁচা পোয়াজ।

বুড়ি বর্ষা বাদল—আরও আহুয়ে নাম বাদল, আরও কত না সব নাম মনে পড়ছে। সবকটি কথাতেই এমন একটি বরষার ঝরে-পড়ার আমেজ পাওয়া যায় যাতে শরীর মন প্রাণ সব জুড়িয়ে যায়। শুধু জুড়িয়ে যাওয়া নয়, এলিয়ে পড়ে মন প্রাণ যখন ঐ কথাগুলি মনে মনে আওড়ানো যায়। তাই করছিলাম চোখ বুজে পোয়াজ চিবুতে চিবুতে।

হঠাৎ মনে পড়ে গেল ছ লাইন—

“প্রেমের বাদল নামল, তুমি জান না হায় তাও কি,

আজ মেঘের ডাকে তোমার মনের ময়ূরকে নাচাও কি?”

এখানেও বাদল নেমেছে। কিন্তু প্রেমের নয়। এমন কি, সাদাসিধে জলের বাদলও নয়। অনলের বাদল নেমেছে। অগ্নিবৃষ্টি হচ্ছে, মনের ময়ূরের পালক পাখা পুড়েই ছাই হয়ে গেছে অনেক আগে। বেচারী ঝলসে ঝলসে ছটকট করতে করতে মরেছে। নাচাবো কাকে?

গতরাত্রে এখানেও বাদল নেমেছিল, মেঘও ডেকেছিল, কিন্তু তাকে বাদল নামা বলা চলে না, আর সে মেঘের ডাকে ময়ূর নাচা শুধুরের কথা, প্রাণ খাঁচা-ছাড়া হবার যোগাড় হয়। বাড়লা দেশের আকাশে বাতালে, ঘাটে ঘাটে, কুঁড়েঘরের চালে, গাছপালার মাথার—ধীরে-স্থিরে বনিয়ে ওঠে বে পা এলিয়ে যাওয়া ভাবটি বর্ষা নামার সঙ্গে সঙ্গে, সে এখানে আকাশকুহর। আকাশের জলের ধারার মাহুয়ের উপর-ভিতর সমস্ত ভিত্তি নরম হয়ে গলে গলে পড়ে না এখানে। এখানকার বে বর্ষার সঙ্গে পরিচয় হল তার আবির্ভাব আর অন্তর্ধানের কাকটুকুতে জাহি জাহি ডাক ওঠে। এ বর্ষা মেয়ে নয়, এ এক বুট-পটি-সাঁটা জলী জোরান। গটমট করে এসে হড়হড় করে আপন কার্য সেয়ে ছব দাম করে চলে গেল, এর সঙ্গে কি তুলনা করা চলে বাড়লা যারের বর্ষা-মুখর রূপটিকে। এখানে কোথায় বুজে পাব বাড়লার বর্ষার সেই বাঁধনহেঁচা

স্বপ্নীককে। কোথায় খুঁজে পাব সেই জননমুখী মেয়েটিকে এই দুঃখপোড়া
মুহুর্তে।

হঠাৎ সব স্থলিবে গেল। হঠাৎ কখন বর্ষা নেমে এল, নামল আমার মনে
প্রাণে। আমার সমস্ত সত্তার। মসগুল হয়ে গেলাম—

বর্ষা নেমেছে।

বাঙলা দেশের আটপৌরে ঘরোয়া বর্ষা। জন্ম থেকেই যে বর্ষার সঙ্গে
আমাদের নাড়ীর যোগ, যে বর্ষার সঙ্গে আমার হাড় মাংস অস্থি মজ্জার একান্ত
ঘনিষ্ঠ পরিচয়, সেই বর্ষা—যে বর্ষার অঝোর ধারার মনও গলে গলে পড়ে।
একেবারে ছেলেবেলার ঠাকুরমার কোলে বসে আকাশের পানে চেয়ে যে বর্ষার
দিনে ছড়া শুনতে শুনতে স্থিরে পড়তাম “বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদের এল
বান”—সেই টাপুর টুপুর গানের বর্ষা নেমেছে আমার প্রাণের মধ্যে।

চোখ বুজে দেখছি—আকাশ জুড়ে একখানি ঘেঁষা বুলছে। বুলছে
একখানি ধোঁয়া রঙের চাঁদোয়া তাল-নারকেলের মাথা ছুঁয়ে, সেই চাঁদোয়ার
উপর থেকে কারা হড় হড় করে জল ঢালছে। কখনও কম, কখনও বেশি;
ঢালছেই জল, পড়ছেই জল।

পড়ছে জল তাল নারকেলের মাথার,—অতবড় লম্বা দেহ, ওইটুকু ছাতার
জল মানবে কেন। নারা দেহ ভিজে জল গড়িয়ে পড়ছে। চূপ করে দাঁড়িয়ে
দাঁড়িয়ে ভিজেছে ওরা। অপেক্ষা করছে জলটা একটু ধামলে হয়, অমনি মাথা
মোলাতে শুরু করবে।

পড়ছে জল আরগাছটার ঝাঁকড়া মাথার। ভিজে একেবারে জবুখবু বেচারী।
অতবড় দেহ নিয়ে কাঁহাতক ডেজা বার। মনমগ্ন হয়ে মুখ কালো করে রয়েছে।
লক্ষ লক্ষ পাতা বেয়ে ডাল বেয়ে জল নামছে মাটিতে ওর পারের গোড়ার। আহা
—কারের তলার মাটিটুকুও ভিজে গেল, মন খারাপ না হয় কার।

কাকপকীর হুঁ শব্দটি নেই। কে কোথায় বাগা ওঁড়ে গুলিয়ে বসে আছে।

একবার যদি সামান্য কণের ভর্তে জল থাকে—অমনি সবাই বেঘিরে আলবে যে তার আশ্রয় ছেড়ে। তারপর চৌচামেচি আর পাখা-ঝাড়া আরম্ভ হয়ে যাবে।

দাঁড়ায় বলে কাঁধা সেলাই করতে করতে বা একবার হাতের কান ধারিয়ে মুখ তুলে আকাশের দিকে ঝানিক চেয়ে যইলেন। তারপর বললেন, “কে বেন কুটো করে দিয়েছে আজ আকাশটার।” বলে আবার কাঁধার কোড় দিতে লাগলেন।

উঠানের ওধারে গোয়ালের গায়ে ছোট চালাটার দাঁড়িয়ে ধনী আর লক্ষী একেবারে চুপ করে আছে, জাবর কাটছে না, মুখ নাড়ছে না। ওদের চোখেও কেবের বড় ধরেছে। আত্মরে আকস্মিক অভিমাত্রি যেদের বড় ওদের চোখের জাবখানা।

ঘরের চালে পড়ছে জল, চাল বেয়ে নামছে এসে উঠানে। উঠানে মোত বইছে। পায়-চলা পথটা বেয়ে সেই মোত চলেছে খিড়কি পুকুরে। কই মাছেরা একজন ছজন করে উঠে আসছে সেই পথ ধরে। ওরা শেষ পর্যন্ত এসে একবার দেখবে এত জল কোথা থেকে গিয়ে নামছে ওদের পুকুরে।

জল উঠেছে বাঁশঝাড়ের গোড়ায়। ওখানকার বাসিন্দারা প্রাণপণে ডাকাতাকি হাকাতাকি কুড়ে দিয়েছে। মোটা গলার ‘গ্যা গো, গ্যা গো’ করছে তারিকি চালের কর্তারা। ছেলেপুলেরা ‘করর কট, করর কট’ লাগিয়েছে, ওদের গিন্নীদের বউদের আলাদা গলার আওয়াজ, দূর থেকে বেশ বোকা যায়। মহা শোরগোল হনুহুল ব্যাশার, বায় বুঝি ওদের গৃহস্থালি সব ভেঙে।

কলাগাছদের দকা রফা, একেবারে শোচনীয় অবস্থা। ইপিয়ে উঠেছে বেচারারা, অনবরত পড়ছে জল—ঝিন্ ঝিন্ ঝিন্ ঝিন্, বন্ বন্ বন্ বন্। একটু ছেন দিলে ওরা হাঁক ছেড়ে বাচে।

ওধারে উঠানের কোণার মালটার উপরে দুটো একটা বিড়ে কুল ইঁদিয়ে মধ্যেই মুখ তুলে চেয়ে চেয়ে দেখছে। বোকারা মনে করছে নজর পড়ি

হয়ে এল। লক্ষ্য হতে এখনও অনেক দেরী। আগে যুটিটা একটু কমবে, তারপর দেখা যাবে পশ্চিম দিকটা লাল হয়ে উঠেছে। পূর্ব অবন্ত তার অনেক আগেই পশ্চিমে নেমে গেছেন।

একবার চোখ চাইলাম। মুখ কিরিয়ে পশ্চিম দিকটা একবার দেখে নিলাম। আগুনের গোলার মত প্রকাণ্ড একটা মাথা হির দৃষ্টিতে আমাদের দিকে েয়ে আছে। সভরে তৎক্ষণাৎ চোখ বন্ধ করলাম। যে বর্ষা আমার দেহের প্রতি অগুণরমাণুতে অবোরে করছিল তা নিমেষে কোথার উবে গেল।

অনেকক্ষণ ধরে ডান কাঁধে আর ডান হাতটার ভার-ভার ঠেকছিল। এবার খেয়াল হল, কুস্তী আমার কহুয়ের উপর হুহাত দিয়ে আঁকড়ে ধরে একরকম ঝুলতে ঝুলতে চলেছে। নিজেই টেনে নিয়ে চলবার ওর শক্তি ছুরিয়েছে।

উর্বশীর গিঠের উপর তৈরবীর দিকে তাকিয়ে দেখলাম, সেখানে তাঁর বদলে কি একটা কালো কবল ঢাকা হেলতে ছলতে চলেছে। ঘোদের তাপ থেকে বাঁচবার উপায় আপাদমস্তক কবল মুড়ি দেওয়া।

অনেক আগে বড় উট চলেছে, মলমল সবাই তার সঙ্গে এগিয়ে গেছে। আমি কুস্তী আর দিলমহম্মদ—তিনজনে আছি উর্বশীর সঙ্গে।

দিলমহম্মদকে জিজ্ঞাসা করলাম, “আর কতক্ষণ লাগবে সামনের কুয়োর খারে পৌঁছতে?”

ও বললে—“বোধ হয় অর্ধেকটা পথ আমরা এসেছি। এখারে পথের ত কোনও নিশানা নেই। উটের বেলাজ আর মর্জির উপর নির্ভর করে সব। ওদের পেটে কুখা আছে। কুখার টানে ওরা সব থেকে সোজা পথে চলে। কিন্তু এখানে এখাবের বা অবস্থা দেখছি—তাতে চক্রকূপের ওপায়ে না পৌঁছনো পর্বত ওদের পেটে দেবার কিছু মিলবে বলে ত মনে হয় না।”

জিজ্ঞাসা করলার, “তা হলে অস্ত্র বছর এখারের অবস্থাটা অস্ত্র বছর থাকে নাকি ?”

দিলমহম্মদ বললে, “গত বছর এ মুহূর্তে একেবারে জল পড়ে নি। নরত এই মরুভূমে এ অঞ্চলে দু’ চারটে ঝোপঝাড় সব জায়গাতেই দেখা যায়। এবারে একেবারে সবকিছু শুষ্ক লাগছে। এই চন্দ্রকূপ এলাকাটা পোড়া মুহূর্ত, এখারে কেউ বাসও করে না, আসা-যাওয়াও নেই কারও। হিংলাজ-যাজীরাই শুধু আসে। চন্দ্রকূপ দর্শন না করে হিংলাজ দর্শন হয় না। এই অস্ত্রেই এ পথে আসে। নরত লোকে এই সমুদ্রের চড়ার আগবে কোন্ কাজে।”

সমুদ্র কথাটা কানে বেতে দুদিন আগে ছেড়ে আসা চোখ-জুড়ানো নীল সাগরকে মনে পড়ে গেল। বললার, “এখানটাও তাহলে সমুদ্রের চড়া। সমুদ্রের জল এখান থেকে কতদূর হবে মনে কর ?”

ও উত্তর দিলে, “কমসে কম পনেরো-ষোল কোশ সোজা পশ্চিমে চললে দরিয়ার পানি মিলবে। চন্দ্রকূপও দরিয়ার চড়ার, তবে ওখান থেকে দরিয়া অস্ত্রত ত্রিশ কোশ।”

কিছুকণ চুপ করে থেকে আবার বললে, “হিংলাজ থেকে কেবলার সময় এ পথে আর আমাদের আসতে হবে না। চন্দ্রকূপকে বামে রেখে তিন-চার কোশ দূর দিয়ে সোজা অস্ত্র পথ আছে, যে পথে লোক চলাচল করে। সে পথে কোনও তকলিফ নেই। এখন খোদার যেহেতুবানিতে চন্দ্রকূপ পৌছতে পারলে হয়।”

বললার, “কিন্তু না খেয়ে উটেরা কদিন চলবে ?”

দিলমহম্মদ বললে, “শুধু জল খেয়ে দু’ তিন দিনও ওরা চলতে পারে। তবে ভয়ানক কমেজোর হয়ে পড়বে। এমনও হয়, এই সব জায়গায় উট কেপে ওঠে। তখন ওদের সাহায্যনাও যায় না। সওয়ার উট সব একসঙ্গে বাঁধা পড়ে। দেখছেন ত কোনও দিকে কোনও সিপানা নেই। এখানে উট যদি পথ ঠিক করে না চলে তবে আর উপায় নেই। সবই মসিফ, সবই মসিফ।”

এই বলে সে নিজের কপালটা ছবার চাপড়ালে। নসিবই বটে। নসিবে না থাকলে খামকা আমরা এখানে মরতে আসব কেন? নসিবই যদি না পুড়বে তবে এভাবে উপর-ভিতর পুড়ে অঙ্গার হচ্ছে কেন? নসিবই সব, নসিবই এভাবে নাকে দড়ি বেঁধে ঘুরিয়ে দাঁড়িয়ে, আর ঘুরে ঘুরে নসিবের হুকুম যদি পালন না করি তবে আছে নসিবের হাতে চকচকে টাঙ্গি, তখন নসিব সেই টাঙ্গি দিয়ে হু আধখানা করে ছাড়বে।

সামনে বড় উটটার কাছে কি হল। ওরা সবাই থামল। ওদের কাছে পৌঁছে দেখি মণিরাম তপ্ত বালুর উপর শুয়ে পড়েছে। অরে একেবারে বেহঁশ।

তার মাথায় একখানা ভিজে গামছা জড়ানো হল। তৈরবী নামলেন। উর্বশীর উপর তাকে তুলে দিয়ে খাটিয়ার সঙ্গে বেঁধে দেওয়া হল। আমাদের যে এগিয়ে যেতেই হবে।

এগিয়ে যেতেই হবে, এগিয়ে যেতেই হবে। মরুভূমি হোক, পাহাড় হোক, জঙ্গল হোক, সারা জীবনভোর শুধু 'আগুবাড়ি' চলা। খামবার উপায় নেই। খামা মানে একেবারে চরম খামা, তার মানে শেব বিরতি।

এগিয়েই চললাম।

রূপলাল বললে "আজ আর কাল এই দুটো দিন এইভাবে চলবে। তারপর আমরা চন্দ্রকূপ এলাকায় গিয়ে পৌঁছব। সেখানে পাহাড়-পর্বতের আড়ালে—অন্তত দিনের বেলাটা—পড়ে থাকা যাবে।"

শোপটলাল জিজ্ঞাসা করলেন, "আজ রাতে যেখানে গিয়ে পৌঁছব সেখানে কি কোনও ছায়া মিলবে না, যেখানে কাল দিনের বেলাটা পড়ে থাকা যায়?"

রূপলাল জবাব দিলে, "শয়তানের ছায়া মিলতে পারে। সেই ছায়ার আশ্রয় করে বালির উপর পড়ে শুকিয়ে মরতে পারা যাবে।"

দিল্লিহন্দর বললে, "সব্লে আজ্ঞা হয় সামনের কুরোর দ্বারে পৌঁছে যতটা দূর আশ্রয় করে আশ্রয় এই রাতে চলা। তাহলে কাল যোন চড়বার আগেই

আমরা পাহাড়-মুহুরে গিয়ে পড়তে পারি। কিন্তু তা কি আর হবে, এতক্ষণ হাঁটতে পারবে কে।”

রুপলাল বললে, “হু’ দুটো রুগী সঙ্গে। একটা ছায়া না পেলে কাল দিনের বেলা ওদের রাখা বাবে কোথায়? সামনে এগিয়ে যেতেই হবে আজ রাতে।”

কুস্তী হাঁটছিল ভৈরবীর কাঁধে ভর রেখে, ভৈরবী বললেন “এ মেয়েটাকেও হারাতে হবে, ওর আর চলবার শক্তি বিন্দুমাত্র নেই।”

আর কোনও কথা কেউ বললে না। আগে ত আজকের মত সজ্জা হোক। ঐ চণ্ডাল দুইটা বিদায় হোক ওর পোড়ারমুখ নিয়ে। তখন দেখা বাবে কি করা যায়। আশুক একটা এমন রাত্রি যে রাত্রি আর কখনও পোহাবে না, কখনও পথ ছেড়ে দেবে না প্রভাতকে। তাহলে আর ঐ দুইটা কখনও আসতে পারবে না আমাদের মাথা খেতে, আমাদের রক্ত শুকতে।

অবশেষে গেলেন তিনি। গেলেন সেই নির্মম রক্তপোষক, রক্তচকু, রক্তাধর মার্তণ্ডেশ্বর। আমাদের ঘাড়ের উপরের মাথাগুলি জলশূন্য বুনা নারিকেল করে গেলেন তিনি, একেবারে শাসনশূন্য করে গেলেন কি না কে বলতে পারে। তবে গেলেন যে এই বধেই। আমরা চোখ চেয়ে বাঁচলাম।

নেমে এল সজ্জা। আমাদের এপিঠ ওপিঠ দুপিঠই ডাঙা হয়ে গেছে দেখে তার দয়া হল। নিবিড় রমতার হাত বুলিয়ে দিলে আমাদের গায়ে মাখায়। বহুকাল পরে মায়ের হাতের পরশ পেলাম। অকারণ পোড়া চোখদুটি সজল হয়ে উঠল।

ঠাণ্ডা হয়ে এল বালুর মেজাজ, তবু সহজে কি তার তেজ কমে।

সজ্জার দিদি রাত্রি এসে পৌঁছলেন অবশেষে। বড় বিলম্ব করে এলেন তিনি। আমাদের ধৈর্যের শেষ সীমা পার হয়ে গেছে অনেকক্ষণ তাঁর অপেক্ষার। সব আলা বহুশা সমস্ত দুঃখ তিনি নিষেধে হরণ করে নিলেন তাঁর নিবিড় কালো চোখের করুণার দ্বারা ঢেলে দিয়ে। কানে কানে বলতে লাগলেন “আর ভয় কি? আমি ত এসে পড়েছি, আমার আঁচলের ফলার লুকিয়ে নিয়ে জোমাদের

পার করে দিচ্ছি এই ভয়ঙ্কর মকতুবি। তুলে যাও সব জালা বস্ত্রণা, বুকে সাহস আন, মুখে হাসি ফোটাও। ভেঙে পড়লে চলবে কেন? হিংলাজ যে এখনও বহু দূর।”

হাড়িওয়ালা রূপলাল চীৎকার করে উঠল, “শ্রীহিংলাজ দেবীকি—”

আমাদের মাথো বস্ত্রদূর হুলাল উচ্চকণ্ঠে সাড়া দিলাম, “অর!”

অরাণহরের শিশুসেবকেরা আর পারে না তাদের গুরুকে বয়ে নিয়ে যেতে। আমাদের কাছ থেকেই প্রথম প্রস্তাব উঠল, ‘এবার থামতে হবে।’ একেবারে নেতিয়ে পড়েছেন অরাণহরজী। সমস্ত দেহ থেকে প্রাণের আগুনটা পালিয়ে এসে জমা হয়েছে তাঁর চক্ষু ছুটিতে। মুখ দিয়ে কথা সরছে না, কেবলমাত্র অসন্ত চক্ষু দুটি দিয়ে সবাইএর মুখের উপর তিনি তাকাচ্ছেন। বেন ইচ্ছা করলে আমরা এমন একটা কিছু করতে পারি যাতে তাঁর বস্ত্রণার লাঘব হয়, তাঁর জীবনটা রক্ষা পায়।

তাঁর চোখের সেই দৃষ্টি আজও বেন দেখতে পাই। কি অসহায় মানুষ হয়ে পড়ে বিদ্যার পূর্ব যুগে। আর কতদূর শোচনীয় অবস্থায় পড়েছিলাম আমরা সেদিন তাঁর সেই বুক দৃষ্টির দিকে চেয়ে। কিছুই করবার ছিল না আমাদের, কেবল নিজেদের পায়ের মাংস দাঁত দিয়ে ছেঁড়া ছাড়া আর কোনও উপায়ই আমরা খুঁজে পাচ্ছিলাম না। আমাদের প্রত্যেকের বাক্যরোধ হয়ে গেছে তখন। তাঁর জন্যে কিছু একটা না করতে পারার তীব্র অসুশোচনার আমরা ভিলে ভিলে দৃষ্টে মরছি। যা হবার তা হবেই এটুকু বুঝতে আর বাকি নেই কারও। এখন সকলেরই একান্ত কামনা—একটা কোথাও পৌছে তবে বেন কিছু হয়। এভাবে এখানে তাঁর দেহটাকে বেন ফেলে যেতে না হয় আমাদের। কোনও একটা আশ্রয়স্থানে পৌছে তবে বেন সেই চরম কণ্ঠটি উপস্থিত হয়।

অতঃপর করে রূপলাল বোঝাতে লাগল সকলকে, এ সময় এ আরগার কোনও

মতেই থায়া উচিত নয়। এগিয়ে চল, এগিয়ে চল সামনে কুয়ার ধারে। যে-ভাবে হোক সেখানে পৌছতেই হবে, নয়ত একবিন্দু জল না পেয়ে মরতে হবে সকলকে। মনে বিশ্বাস রেখে এগিয়ে চল সবাই। যা হিংলাজের কুয়ার ওখানে পৌছে একটা কিছু উপায় হবেই। পূর্বো একটা দিন আমরা পড়ে থাকব সেই কুয়ার ধারে। তখন পাণ্ডুজী নিশ্চয়ই সামলে উঠবেন, দয়া করে আর একটু কষ্ট করে চল নিয়ে ওঁকে সামনের কুয়ার কাছে।

কে নিয়ে যাবে পাণ্ডুজীকে বয়ে? চব্বিশ ঘণ্টা হতে চলল সকলের পেট খালি, সকলেরই প্রাণ কঠাগত। সবাই মাথা নিচু করে রইল।

কোথা থেকে থিরমল উদয় হল। এতক্ষণ তার কথা আমরা ভুলেই গিয়েছিলাম। জয়াশঙ্করের কাছে এসে সে পিঠ পেতে দাঁড়াল। বললে, “দাও ওঁকে আমার পিঠের উপর বসিয়ে একখানা চাদর দিয়ে আমার বুকের সঙ্গে বেঁধে। আমি নিয়ে বাচ্ছি পিঠে করে।”

সকলে স্তম্ভিত। এ বলে কি। জয়াশঙ্কর হাকা মাহুব নন, থিরমলের চেয়ে মাথার কিছুটা বড়ই হবেন তিনি। থিরমলও এমন কিছু পালোয়ান নয়। মাথা খারাপ আর কাকে বলে—ও বয়ে নিয়ে যাবে পাণ্ডুজীকে।

সকলকে ইতস্তত করতে দেখে থিরমল চটে উঠল। বললে, “আমি ইয়ারকি করছি না। এ ভাবে মাহুব বয়ে বেড়ানো আমার অভ্যাস আছে। প্রথম মা-বাপ যখন আমাকে ত্যাগিয়ে দেয় তখন যিনি আমাকে আশ্রয় দেন তাঁর বিমার হলে পর অনেকদিন তাঁকে পিঠে করে বয়ে নিয়ে বেড়িয়েছি। তখন শু আমি খুবই ছেলেমাহুব, আর এখন পারব না এঁকে বয়ে নিয়ে যেতে। বেঁধে দাও তোমরা, আর দেয়ী কোরো না।”

কুন্তী কি বলতে গেল থিরমলকে। কোনও কল হল না। একটা প্রচণ্ড ধমক খেয়ে কিরে এল।

শেষ পর্যন্ত তাই কথা হল। একখানা মোটা চাদর দিয়ে জয়াশঙ্করকে

বিক্রমলের পিঠে বেধে বেওয়া হল। দু'হাত দিয়ে পিছন থেকে বিক্রমলের গাটানি গুড়িয়ে ধরে ওর কোমরের দু'পাশ দিয়ে দুই পা বাড়িয়ে বলে মইলেন জালাবকর। একখানা লাঠি একজনের হাত থেকে টেনে নিলে বিক্রমল। আবার আমরা অগ্রসর হলাম।

সন্দের একেবারে সামনে গুলমহম্মদ বিড় বিড় করে বেন কোনও মন্তব্য আওড়াতে আওড়াতে চলেছে। অস্ত্র সকলেই সম্পূর্ণ নির্বাক।

তৈরবী হাঁটছেন। কুস্তীর একখানা হাত ধরে বেশ ভাল ভাবেই হাঁটছেন তিনি। সন্ধ্যার পর থেকে কুস্তীও আর কারও কাঁধে ভর রেখে হাঁটছে না।

উর্বশীর পিঠে খাটিরায় উপর মণিরায় একটু জল চাইলে। উর্বশীকে বসিয়ে তাকে জল খাওয়ানো হল। সামনের ওরা আরও এগিয়ে গেল। তা বাক, নরত বিক্রমলকে ধামতে হয়। উর্বশী তার বাকের ঠিক ধরবে গিয়ে। মণিরায়ের জর করে আসছে, তবে এখনও তার সম্পূর্ণ হাঁশ আসে নি।

তৈরবীকে হাঁটতে হচ্ছে মণিরায়ের জন্তে। মণিরায় শোপটলালের লোক, সেজন্তে শোপটলাল মহা আপসোস জুড়ে দিলেন এবং তৈরবীর কাছ থেকে ধরক ধরে তবে ধামলেন।

তৈরবী বললেন, "আপনি ধামুন ত বাবা দয়া করে। এখন ভালর ভালর সকলে পৌছতে পারলে বাঁচি। তা আরি হেঁটেই পারি আর গড়িয়ে গড়িয়ে গিয়েই পারি তাতে আরার কোনও ছুখ নেই।"

ঠিক—এখন পৌছনোটাই সবচেয়ে বড় কথা। কে হাঁটছে, কে গড়াচ্ছে, পিঠে চড়ে চলেছে কে—এ সমস্তর বিচারের এখন কুয়ল কোথায়। কোনও কবে একটা কোথাও পৌছে আজকের মত এই রাজ্যের বিরতিই হচ্ছে এখন প্রধান লক্ষ্য।

অনেকক্ষণ বহানে গ্রহান করেছেন সূর্যদেব। আমাদের উপরের আঙ্গা জুড়িয়েছে সন্ধ্যা সন্ধ্যা আরও হয়েছে আর এক তামিহা বাইরের আঙ্গন

নিভেছে, ভিতরের আগুন জলে উঠেছে। সব চেয়ে চরম সত্য যা এই দুনিয়ার, সেই আগুন হাউ হাউ করে জলে উঠেছে সকলের উল্লের মধ্যে। ক্রাচ-অক্রাচ আচার-অনাচার সব একসঙ্গে ভস্মীভূত হয় যে আগুনের টানে সেই আগুন—যা সঙ্গে নিয়েই আমরা পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হই সেই আগুন ভিতর থেকে বগছে, “মায় কুখা হুঁ।” কিছু না কিছু এখন পাঠাতেই হবে ভিতরে, নরক নিস্তার নেই।

অন্নবিস্তর সকলেই চঞ্চল হয়ে উঠেছে। অনেকে অকার ইতিমধ্যে ডাল-পালা বা পায়ে ঠেকছে তা কুড়োতে শুরু করেছে, সামনে কুরোর ধারে পৌছে রুটি পোড়ানো হবে।

শ্রীমান হুৎলালের হুপাশের দুই পকেট খেজুর দিয়ে ভৈরবী বোকাই করে দিয়েছিলেন। অনেকক্ষণ আগেই সেগুলো নিঃশেষ হয়েছে। ভৈরবীর পাশে চলতে চলতে ছেলেরা চুপি চুপি পরামর্শ জুড়ে দিলে, ওখানে পৌছে রাজে কি কি রান্না হবে।

রূপলালকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলাম, “বেখানে বাচ্ছি সেখানে রান্না করবার কাঠ পাওয়া বাবে ত?”

রূপলাল বিরক্ত হয়ে উত্তর দিলে, “কেপেছেন আপনি? কে আমাদের জন্তে সেখানে কাঠ নিয়ে বসে থাকবে? এই বাসুর রাজহু কাঠ কোথায়? আজও আটা আর শুড় জলে খেয়ে কাটাতে হবে।”

দিলরহমদ বললে, “সেই জন্তেই ত বলছি, ঘণ্টা দুই ওখানে আবার করে জল-টল ভরে নিয়ে আবার হাঁটাই ভাল। রাতে-রাতে যতদূর বাওয়া যায়...”

কুতী খিচিয়ে উঠল, “তাহলে সারা রাত একজন একজনকে পিঠে করে চলবে না কি?”

তা কখনও সম্ভব নয়। মহা অপ্রস্তুত হয়ে দিলরহমদ বার বার হুঃখ জানাতে লাগল।

তারার আলো পড়ছে বাগির উপর, কলে আরনার আলো পড়লে বা
হয় তাই হচ্ছে। অন্ধকার অনেক ফিকে হয়ে গেছে। আকাশের তারার
আলোর সম্পূর্ণ উলঙ্গ চকচকে মরুভূমিতে আঁধার জমে না। আমাদের
চারিদিকে একটা রহস্যময় আলোর জগৎ, তার মাঝে আমরা ভাসছি।
এখানে ছায়া পড়ে না। যারা কায়ারীন তাদেরও কোথাও ছায়া পড়ে না।
এখানে যদিও সশরীরে আমরা চলেছি তবুও আমাদের একবিন্দু ছায়া পড়ছে
না কোথাও। এ এক বিচিত্র আজগুবি হুনিয়া।

আরও অনেককণ কাটল। চুপচাপ সব চলেছি নিজদের পেটের ক্ষুধা
পেটে নিয়ে। হঠাৎ সামনে থেকে কে উৎকট আর্তনাদ করে উঠল, “আ-
আ-আক!”

কে যেন কার কণ্ঠনালী চেপে ধরে শাস কঁদু করে য়ারছে।

গুলমহম্মদ হায় হায় করে চেঁচিয়ে উঠল। রূপলালও কি সব বলে চোঁচাচ্ছে
ওখান থেকে।

দৌড়লাম ওদের দিকে।

কি একটা ঘিরে সবাই হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। ওদের কাছে গিয়ে পৌঁছ-
বার পূর্বেই ভিড়ের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল থিরুমলকে ধরে নিয়ে রূপলাল
আর পোপটলাল। থিরুমলের পা দুটো শূন্যে ঝুলছে, মাথাটা সামনের দিকে
ঝুঁকি রয়েছে, মুখটা এসে ঠেকেছে তার নিজের বুকে।

রূপলাল বলে উঠল, “খুন করেছে—গলা টিপে মেরে ফেলেছে একেবারে।”

থিরুমলের অসাড় দেহটা ওরা শুইয়ে দিলে আমার সামনে।

কয়েক মুহূর্ত্ত শুদ্ধিত হয়ে চেয়ে রইলাম। তারপরই দপ করে মাথার মধ্যে
আগুন জলে উঠল। ওদের থাকা ঘিরে সবিরে একলাকে গিয়ে ঢুকলাম সামনের
ভিড়ের মধ্যে। সামনে যারা পড়ল তাদের হুঁহাতে ঠেলে মাঝখানে গিয়ে

পৌছলাম। উপুড় হয়ে পড়ে আছে একজন, দৃঢ় মুষ্টিতে তার কাঁধ ধরে চিৎ করে কেললাম। আমার সর্বশরীরের তিতর দিয়ে একটা ঠাণ্ডা হিমপ্রবাহ বয়ে গেল। লোকটা মরে একেবারে কাঠ হয়ে গেছে। তার দেহটা বরফের মত ঠাণ্ডা।

শ্রীজ্ঞানেশ্বর মুরারজী পাণ্ডে মহাশয় আর নেই। তাঁর দিকে চেয়ে আমিও কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

বহুক্ষণ পূর্বেই প্রাণটা তাঁর বেরিয়ে গেছে। শেষ সময়ও দুহাতে থিকমলের গলা জড়িয়ে ধরে ছিলেন তিনি। ক্রমে তাঁর দেহ শক্ত হতে থাকে, হাতের বান্ধনও থিকমলের গলায় চেপে বসতে থাকে। শেষ পর্যন্ত যখন থিকমলের খাল বন্ধ হবার উপক্রম হয় তখন সে প্রকৃত ব্যাপারটা বুঝতে পারে। একটা মরা মানুষ নির্ভেঁর উপর গলা জড়িয়ে ধরে বসে আছে এটুকু বুঝতে পেরেই সে ভয়ে আতর্জনাদ করে ওঠে আর প্রাণপণে নিজের গলাটা ছাড়াবার চেষ্টা করে। কিন্তু মড়ার হাত ছাড়ানো অত সহজ নয়। প্রাণহীন জ্ঞানেশ্বরকে পিঠে নিয়ে থিকমল হুমড়ি খেয়ে পড়ে জ্ঞান হারায়।

টানাটানি করে জ্ঞানেশ্বরের কবল থেকে যখন থিকমলকে ওরা উদ্ধার করল তখন সেও মৃতপ্রায়।

বাক্—যে গেছে সে ত গেছেই, এখন আর একজন না গেলে হয়। থিকমলের মুখে মাথার জলের ছিটা দিচ্ছেন ভৈরবী। হাহাকার করে কাঁদছে কুন্তী, নিজের কপাল চাপড়াচ্ছে, চুল ছিঁড়ছে।

কে কাকে সাধনা দেবে, খুঁজেই বা পাবে কোথায় সাধনার ভাষা।

উটেদের পিঠ থেকে বোঝাগুলি নামিয়ে তাদের রেহাই দেওয়া হল। একটা মৃত আর একটা অর্ধ মৃতকে ধরে আমরা লেখানে বসলাম।

হিংলাজ তখনও বহুদূর।

সন্দের সব-কটা আলো জ্বালানো হল। হাত দিয়ে বালি সন্নিবে, খালি দিয়ে বালি খুঁড়ে একটা গর্ত করা হল। যে নূতন কাপড়খানি

পরে জয়াশঙ্করজী হিংলাজ দর্শন করতেন সেখানি দিগে তাঁর সর্বাঙ্গ ঢেকে দেওয়া হল। তাঁরপর সেই বালির গর্তের মাঝে তাঁকে শুইয়ে দেওয়া হল।

ব্রাহ্মণ জয়াশঙ্করজীর অস্ত্যেষ্টিক্রিয়ার উপযুক্ত শাস্ত্রীয় আচার কিছুই পালন করা হল না। হল না মন্ত্রপাঠ, হল না পিণ্ডদান। তাঁর উপযুক্ত সন্তানেরা কতদূরে, আর তিনি কোথায়! তাঁর নবপরিণীতা স্ত্রী তাঁর পথ চেয়ে রাসে আছে, তিনি ঘরে ফিরবেন মা হিংলাজের প্রসাদী নিয়ে আশীর্বাদী নিয়ে, কিরে পুনরায় গৃহসংসার কববেন পরম শাস্তিতে—সব আশা শেষ হয়ে গেল।

খুঁতখুঁতে মন ছিল জয়াশঙ্করজীর। বেখানে তিনি গিয়েছেন সেখান থেকে তাঁর অপদার্থ সহবাজীদের ক্রিয়াকলাপ দেখে হরত আরও বিরক্তই হচ্ছেন। এ সময় যা সব হওয়া উচিত ছিল তার কিছুই আমরা করতে পারলাম না। এমন কি তাঁর দেহটা আগুনের বৃকে তুলে দেওয়াও আমাদের সামর্থ্যে কুলোল না। কোনও কর্মের লেশমাত্র অঙ্গহানি ছিল তাঁর অঙ্গ, আর তাঁর শেষকৃত্যটুকু যেভাবে আমরা শেষ করলাম তার আগাগোড়াই অঙ্গহীন ব্যাপার। কিন্তু তখন তাঁকে ঐভাবে সেখানে শুইয়ে রেখে যেতে আমাদের অস্ত্রের অস্ত্রতুলে যে তীব্র মোচড় দিতে লাগল তা যদি তিনি সেখান থেকে টের পেয়ে থাকেন তবে নিশ্চয়ই আমাদের সকল অপরাধ ভুলে, তাঁর হস্তভাগ্য সহবাজীদের ব্যথায় তিনি নিজেই আকুল হয়ে উঠেছিলেন। সেই গভীর নিশীথে যে মুক মন্ত্র আমাদের হৃদয়ের মধ্যে গুমরে গুমরে উচ্চারিত হয়েছিল হরত মেগুলি শাস্ত্রমতে শুদ্ধ ছিল না, কিন্তু তার চেয়ে সজীব মন্ত্র কোনও পাজী-পুঁথিতে কোনও কালে লেখা হয় নি।

আপন আপন কুঁজো থেকে সকলে জল দিলে জয়াশঙ্করের সমাধির উপর। তাঁর নিজের কুঁজোটি পরিপূর্ণ করে রেখে দেওয়া হল তাঁর মাথার কাছে। আটা আর শুড় সকলেই কিছু কিছু করে দিলে। ভৈরবী দিলেন কিসমিস আখরোট মিছরি বাদার। সমস্ত ভোজ্য একখানা নূতন গামছায় বেঁধে বেঁধে

দেওয়া হল তাঁর ঝুঁজোর পাশে। তারপর হাত দিয়ে ঠেলে ঠেলে বালি ফেলে আমরা জমাশকরজীকে চাপা দিয়ে দিলাম।

সাক্ষী রইল আকাশ, সাক্ষী রইল বাতাস, সাক্ষী রইল ঐ উপরের তারাগুলি আর নীচের এই দিগন্তবিস্তৃত বাসুকা। আমরা আমাদের জ্ঞান বুদ্ধি বিচার মত যথাসাধ্য করে আমাদের শ্রিয়ন্তম সহযাত্রীকে ফেলে রেখে যেতে বাধ্য হচ্ছি। আমাদের আর কিই বা করবার আছে। কেউ জানে না, কেউ বলতে পারে না, সামনে এগিয়ে যেতে যেতে আমাদের মধ্যে আরও কতজনকে এ ভাবে চিরবিশ্রাম নিতে হবে, এই বালির বুকে শুয়ে পড়ে।

এবার সেই সময় উপস্থিত হল, যখন পাণ্ডেজীকে ছেড়ে আমাদের চলতে হবে। অনেকেই হুঁপিয়ে হুঁপিয়ে কাদতে লাগল। ছেলেরা হুঁসের মত হাউ মাউ করে কেঁদে উঠল গুলহুহুয়দ। শেষ সময় সে বললে, “দোস্ত, তোমাকে ফিরিয়ে দিয়ে আসতে পারলাম না তোমার সুহুকে; খোলা তোমার নিজের কোলে টেনে নিলেন। তুমি নিশ্চয়ই তাঁর মেহেরবানিতে শান্তি পাবে। কিন্তু এই আপসোস আমার আর ইহকালে যুচবে না।”

কেবলমাত্র নির্বিকার থিরমল হা হা করে হাসতে লাগল। অনেক-কণ পরে চোখ চেয়ে উঠে বসল যখন আবার, তখন থিরমল আর আমাদের চিনতেই পারলে না। হতভাগাটার মাথার মধ্যে আবার জই পাকিয়ে গেছে।

মণিরাম বললে, “এবার আরি হাঁটতে পারব।” সে আর উটের উপর কিছুতেই গেল না। আবার ভৈরবী উঠলেন উর্বশীর পিঠে। আরি চললার থিরমলকে ধরে নিয়ে। অল্প সকলে, এমন কি হুন্ডী পর্বত, তাকে ভয় করতে শুরু করেছে।

রাজি বিদার নিচ্ছে। বিদারিনী রাজি কেঁদে বিদার নিচ্ছে। আমরা কুন্ডার ধারে পৌঁছে আর কিছুমাত্র বিলম্ব না করে কোনও কিছু না বিছিয়েই

ভয়ে পড়লাম। আমার পাশে ভয়ে অকাতরে ঘুমতে লাগল থিরুমল।
খাওয়া-দাওয়ার কথা আর কারও মনের কোণেও এল না।

তান হাতখানা চোখের উপর চাপা দিয়ে চিং হয়ে ভয়ে আছি। সহজে কিছুতেই খুলছি না চোখ আজ। চোখ খুললেই ত দেখতে হবে আমার সর্গৌরবে সমুপস্থিত হয়েছেন সূর্যদেব, কিংবা উঠি-উঠি করছেন পূব দিকে। তার চেয়ে চোখ বুজে বতটা সময় পার করে দেওয়া যায়। নিত্য ঠিক সময় ঠিক জায়গায় হাজরি দেওয়া কর্মটি থেকে অন্তত একটি দিন কি করে সূর্যদেবকে কারাই করানো যায়—চোখ বুজে শুয়ে তার একটা উপায় ঠাওয়ারতে লাগলাম।

মনে পড়ে গেল ঋষদেব করেকটি শ্লোক। অতি যারাত্মক জাতের সংকৃত ময়। ত্রায়া সূর্যদেবকে আগত জানাচ্ছেন—

বিজ্রাড্ বৃহৎ স্তূতঃ রাজ সাতমং ধর্মানিবোধকণে সত্যমপিংতং।

অমিজহা বৃত্রহা দন্বাহং তমং জ্যোতির্জজে অহুরহা সপত্নহা।

ঋষেদ, ১০ মণ্ডল, ১৭০ স্তূত

সূর্যদেবের শুশ্রূষা করছেন ত্রায়া। বলছেন—সূর্যস্বরূপ আলোকময় পদার্থের উদয় হইতেছে। ইহা প্রকাণ্ড, অতি দীপ্তিশালী, উত্তমরূপে সংস্থাপিত। ইহার মত অন্নদান কেহ করে না, ইহা আকাশের অবলম্বনের উপর বখাযোগ্য-রূপে সংস্থাপিত হইয়া আকাশকে আলস্র করিয়া আছে। ইহা শত্রুনিধন করে, বৃত্রকে বধ করে, দন্বাদিগের প্রধান নিধনকারী, অহুরদিগের বধকারী, বিপক্ষ-দিগের সংহারকারী।

তারপর আরও অনেক কঠোর কঠোর শ্লোকে আবাহনের পালা লাজ করে ত্রায়া শুধু আদৃত করণেই সবিভা দেবতার—

বিধানিদেব সাবতচ্চ বিতানি পরাশ্রব। বত্বত্রঃ তন্ন আহব।

ঋষেদ ৫ মণ্ডল, ৯২ স্তূত

—হে দেব সখিতা, তুমি আমাদের সমস্ত দুর্ভাগ্য দূর কর এবং বাহা কল্যাণকর তাহা আমাদের অভিমুখে প্রেরণ কর।

এ সমস্ত ব্যাপার বহুকাল পূর্বে ঘটেছিল। সে যে কতকাল হয়ে গেল তার হিসেব দেওয়াও যায় না। ঋষি হানকিল লেখা হয় নি। তারপর কালে কালে সবই গেছে পালটে, এসেছে আমাদের এই কাল। ঋষি দ্বারা লিখেছিলেন তাঁদের বয়সে এখন অগ্ন জুড়ে আমরা রয়েছি, হুনিয়ার সমস্ত কিছু বদলেছে, সঙ্গে সঙ্গে আদিত্যদেবের স্বভাবচরিত্রেরও যে ঘোরতর পরিবর্তন হয়েছে এ কথা বলাই বাহুল্য। ব্রহ্মা বলেছিলেন—তুমি আমাদের দুর্ভাগ্য দূর কর এবং বাহা কল্যাণকর তাহা আমাদের অভিমুখে প্রেরণ কর।

হার, তখন তিনি কল্পনাও করতে পারেন নি যে একমাত্র আলিয়ে পুড়িয়ে থাক করা তির ভবিষ্যতে আর কোনও সামর্থ্যই থাকবে না। স্থিতিশীল হোক। আর এই সংকল্পটি সুস্পষ্ট করার জন্যে তাঁকে আবাহন করে ডেকে আনবারও প্রয়োজন হবে না কারও। বখাসময়ে বখাস্থানে উদয় হয়ে সমানে তিনি অনল উৎস্রাব করিতে থাকবেন। আবাহন বিসর্জন এ সব কোনও কিছুই ধার ধারবেন না তিনি। বিসর্জন বিসর্জনের মত আউড়ে বা অস্ত কোন উপায়েই তাঁকে তাঁর এই প্রাত্যহিক ভ্রমাবহ কর্তব্য পালন করা থেকে তিলমাত্র নড়ানো যাবে না।

সৃষ্টিকর্তাকে যদি আমাদের সঙ্গে হিংলাজের পথে পড়ে থাকতে হত তাহলে নিশ্চয়ই তিনি আবুল আকেশ জুড়ে দিতেন একটা ঐ নির্দয় মার্তও-দেবকে খোশামুদী করেছিলেন বলে। খোশামুদী করার কল কি ভীষণ—তাঁর হৃদে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডখানাকে একেবারে পুড়িয়ে ছাই না করে কিছুতেই ছাড়বে না তপন দেবতা। আদর করে আবাহন করার দায় বোল আনা দিবে তবে ছাড়বে।

হাতের লাঠিগুলো বালির মধ্যে পুঁতে কাপড় কখন সব টাঙানো হচ্ছে। হোক—সকলে শেব-চেঁটা করে দেখুক যদি বাঁচবার কোনও একটা উপায় কেউ খার করতে পারে রাখা থেকে। এইভাবে কাপড় কখন খাটিকে কোনও

উপকারই কেহবে না। এটুকু বেশ সুখি এবং সস্তা সকলেও যে না বুঝে তা নয়। কিছুতেই এখানে রাখা যাবে না তাহলে যোগ্য। এই সব টাঙিয়ে হস্ত রাখার উপর একটু ছায়া মিলবে কিন্তু বালির যোগ থেকে বাঁচবার উপায় কি? একটু পরেই এমন তাতা তাতবে বালি যে খান মিলে সকে সকে বই হয়ে ফুটে উঠবে চড়বড় করে। তখন? তখন আরো বাব কোথায়? হিসের উপর পা রাখব? অ্যান্ড কই নাহলেই উননের উপর ফুটন্ত তেলের কড়াতে ছেড়ে দিয়ে তার উপর ছাড়া খুলে ধরলে যদি সেই নাহুলোর দহানির কিছুটা রাখব হস্ত সস্তাবনা থাকে তবে এভাবে এখানে কাপড় কখন টাঙিয়ে আমাদেরও যত্নের উপায় হতে পারে। হস্তরাং এই কাপড় কখন টাঙানোর ব্যাপারে সত্যবার প্রকৃতি হল না। একবারে চূপ করে বলে চোখ মেলে লম্বা দেখতে লাগলাম।

সকলেই ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। কেউ কাঠ খুঁজছে কটি পোড়ানোর জন্য, কেউ চারিদিক ঘুরে দেখছে কাছে-পিঠে কোথাও কোনও বকর ছায়া আছে কি না, কেউ কুয়ার মধ্যে নেমে বালি খুঁজছে জলের আশার। বাকি সকলে হাঁড়োচ্ছে কাপড় কখন।

এখানকার কুয়ো বলে যে গর্তটাকে দেখানো হল তাতে জল দাঁড়ায় না। গর্তটির মধ্যে নেমে থালা দিয়ে বালি সরিয়ে অসীর খৈর ধরে অপেক্ষা করতে হবে। একটু একটু করে জল জমবে, সকে সকে সেই জলটুকু তুলে নিয়ে কুয়ো ভরতি করা চাই। নরত কুর কুর করে চারিদিকের বালি পড়ে আশার জলটুকু অসৃত হয়ে যাবে। জলওলা বা এই কুয়ার বন্ধক কাকেও খুঁজে পাওয়া পেল না এখানে কোথাও।

সন্ধ্যা পর্বন্ত খালিপেটে এই কুয়ার ধারে পড়ে বাকি আমাদের লম্বাটের লিখন। হিসের কোয়া হাটবার সাহস করারও আগে নেই। বা হু হোক, এখানে পড়ে থেকেই হোক। সস্তা জলের ধারে স্ত পড়ে আছি—এইটুকুই কি কম সাহস।

সকাল থেকে সকলের কুঁজো ভরতেই আদিভা ভগবান মাথার উপর এসে পৌঁছে গেলেন। তারপর উঠেদের জল খাওয়ানোর পালা। চরাবার জন্তে ওদের কোথাও নিয়ে যাওয়া হল না। বাবে কোথায়? বালি বালি বালি, উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম—বতদূর দৃষ্টি বার—ঝকঝকে তকতকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন শুভ্র পবিত্র বালি চকচকে অগুনত দীপ্ত বার করে আমাদের চূর্ণশা বেধে মহাকুর্ভিতে হাসছে। উট দুটো ঠার বলে গাল নাড়তে লাগল, যেন অদৃষ্ট কোনও খাত চৰ্ণ করে চলেছে।

শেষে ওদের জল খাওয়ানো হল। সময় লাগল দু বন্টার ওপর। গুল-মহম্মদ আর তার ছেলে খালার করে একটু একটু জল তুলে প্রথমে ওদের দুটো ছাগলের চামড়ার খলে বোকাই করলে। শেষে উঠের মুখের সামনে বালতি বসিয়ে ধীরে ধীরে জল ঢেলে দিলে। আগে উর্বশী তারপর তার মা বালতিতে মুখ জুবড়ে জল শুবতে লাগল। ব্যস—ঐ পর্যন্ত, আর দাঁতে কাটবার কুটোটি জুটল না।

আমরা অবশ্য সকলেই দাঁতে কিছু কাটলাম। আবার সেই চীনাবাদাম আর সেই খেজুরের পিণ্ডি—সকল লবণ ও কাঁচা পেঁয়াজ। এক বস্তা বাদাম আর এক বস্তা খেজুরের কতটুকুই বা খরচ হয়েছে এ পর্যন্ত। অক্লেশে লবাইকে এক এক মুঠো দিলেন ভৈরবী। কিন্তু কাঁচা চীনাবাদাম চিবনো কি চাটখানি কথা। ভাজা বা পোড়ানো অনারাসে চিবনোও যায় আর তা গিলে পেটেও রাখা যায়। তবুও বা হোক কিছু উদরস্থ হল। তারপর জল দিয়ে উঠের বাকি জারগাটুকু বোকাই করা গেল। আঁটা জলে গুলে গুলে মিশিয়ে আজ আর কেউ খেলে না। দু একজন জলে আঁটা আর গুলে গুলেও মুখ দিতে পারলে না। উঠেদের মুখের সামনে নাথিয়ে দিয়ে এল। ওরাও মুখ হোঁয়ালে না। থাকে কি—ওদের চোখেও জ্বাস ফুটে উঠেছে।

ঠিক জ্বাস না হলেও সকলেরই চোখে মুখে একটা কালো ছায়া পড়েছে। জ্বাশকর গেছেন, সন্ধ্যা নিয়ে গেছেন আমাদের ঘনের বলটুকু। তীর্থপর্যটনের

উত্তম উৎসাহ কোথায় মিলিয়ে গিয়েছে, মনে দেহে কোথাও তার ছিটেকোটাও এখন খুঁজলে মিলবে না। ভাল কথা ভাল ভাবে ভাবাও যাচ্ছে না। বার বার নজর গিয়ে পড়ছে মণিরামের দিকে।

রোদ চড়বার সঙ্গে সঙ্গে মণিরামের অরও চড়তে লাগল। তাকে খাটিয়ার উপর শুইয়ে খাটিয়ার পায়াগুলোর সঙ্গে চারটে লাঠি বেঁধে উপরে একখানা কয়ল খাটানো হল। অস্তুত নীচের তাপ থেকে ত রক্ষা পাক। প্রথমে কিছুক্ষণ ছটফট করলে মণিরাম, তারপর নির্ভীক হয়ে পড়ে রইল।

কাঁচা বাদাম খেজুর আর পেট-ভরে জল খেয়ে ছুতিন জন বসি করতে শুরু করলে। বিরামলকে এক ফোঁটা জলও গেলানো গেল না। ওর মুখ দেখে মনে হচ্ছে যে ও ভরানক একটা চিন্তায় পড়েছে।

তখন সেই মারাত্মক লগ্নটি উপস্থিত হল। ভগবান ভাস্কর ধীরে স্বপ্নে এগিয়ে এসে আমাদের মাথার উপর গাঁট হয়ে বসলেন। বসে মনে মনে বললেন—“দেখি এবার তোরা বাস কোথা!”

সকলের সব রকম আলাপ-আলোচনা বন্ধ হয়ে গেল। কারও মুখে আর টু শব্দটি নেই। কেউ ওঠে কেউ বসে—কেউ একবার এ কাপড়ের আড়ালে আবার ও কয়লের নীচে গিয়ে দাঁড়ায়। কেউ বা খানিক লাফিয়ে লাফিয়ে হেঁটে বেড়ায়। হ হ করে ঝড় বইতে লাগল। রাশি রাশি তপ্ত বালি সাঁই সাঁই করে উড়ে পশ্চিম থেকে পূবে পালাচ্ছে। সকলকেই মাথা মুখ সর্বাঙ্গ কাপড় কয়ল দিয়ে ঢেকে ফেলতে হল। এখন আর অল্প কোনও ভাবনা চিন্তা মাথায় নেই—কেবল এক চিন্তা, পা রাখবার মত একটু স্থান চাই জননী ধরিত্রীর উপর। নয়ত শূন্য ভেসে থাকা বায় এমন কিছু একটা উপায় হওয়া এখনই প্রয়োজন। এখানে এখন শূন্য ভেসে থাকাও সম্ভব নয়। নীচে থেকে বালির তাপ উঠে পুড়িয়ে মারবে। তা যদি না হত তাহলে অস্তুত একটা পাখীকেও এখানকার আকাশে উড়তে দেখা যেত। সেই সকাল থেকে একটা কাকপক্ষীও

চোখে পড়ে নি। সমস্ত আকাশখানা জুড়ে একটা অলস অগ্নিপিত্ত ভেসে বেড়াচ্ছে, আর কোনও কিছুই স্থান নেই সেখানে।

গ্রীষ্মকালে বাংলাদেশে প্রাণ আইটাই করে। সেখানে সে রকমের কিছু করে না। প্রাণ মন আত্মা শরীর, এক কথায় মানুষের সমস্ত সত্তা, অলসে থাকে সেখানে। সে অলুনি ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। মাথার খুলি থেকে পায়ের তলা পর্যন্ত কোথাও কোনও সাড়ই থাকে না। বাইরেটা অলসে ভিতরটাও অলসে—মনে হচ্ছে বেন ভিতরে দাউ দাউ করে চিতার আগুন অলসে। সেই আগুনের শিথ বেকছে নাক মুখ দিয়ে, চোখ দিয়েও।

এক একটি মুহূর্ত মনে হতে লাগল আত্ম এক একটি দিন। নাক মুখ চোখ কান সমস্ত কথলে ঢাকা, তার মধ্যে শুনে শুনে শাস টানছি, কেলছি। যখন শাস টানছি তখন অনলের হলকা ভিতরে গিরে ঢুকছে, ঢুকে ভিতরটা ঝলসে দিচ্ছে। কিছুক্ষণ দম বন্ধ করে থেকে আবার যখন শাস টানছি তখন চোখ ঠেলে প্রাণটা বেরিয়ে আসবার যোগাড় করছে—কিছুতেই বতি নেই।

আমার মাথার উপরে রূপলাল একখানা কখল টাঙিয়ে দিয়ে গেছে। আর বা কিছু কাপড় চাদর ছিল সঙ্গে সব বিছিয়ে তার উপর চেপে বসে আছি, সেগুলো এত ভেঙে উঠল যে ভয় হল দশ করে জলে না ওঠে। ডাইনে বাঁয়ে সামনে পিছনে ওপরে নীচে শত শত চিতা দাউ দাউ করে জলছে। পরিজ্ঞান কোথায় ?

শুনেছি—সতীদাহের সময় ঘেরোটিকে চিতার উপর বাঁশ দিয়ে চেপে ধরে থাকে হত। সতীদাহ প্রথাটিকে মন্দ বলতে আমারও কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু ঐ বাঁশ দিয়ে চেপে ধরা কাজটিকে আমি সমর্থন না করে পারি না। যারা ঐ ভাবে চেপে ধরে থাকত ঘেরোটিকে, তাদের আমি কোনও মতেই নিষ্ঠুর বলতে পারব না। বরং বলব তারা একান্ত দয়ালু বশেই ঐ কর্মটি করত। তা না হলে স্ব ইচ্ছায় মুহূর্তে অলস চিতার উপর বসে

আগাগোড়া ধীরে হচ্ছে পোড়ার সাধ্য হত না কারও, তা বামিত্তি বতই থাকুক না কেন মনে প্রাণে ঠাণা। একান্ত দরার যশেই বউটির আত্মীয়জন তাকে ঐ ভাবে চিতার উপর বাঁশ দিয়ে চেপে ধরে থাকতেন। সতীর মনের জোরের আর বামিত্তির বহর দেখে খন্ড খন্ড পড়ে যেত। নয়ত শতকরা একশজন সতীই আগুন জলে উঠলে পর চিতার উপর থেকে লাফিয়ে পড়ে দৌড় মারতেন এ কথা হালফ করেই বলা চলে।

কিন্তু আমাদের জলন্ত বালির বুকে বাঁশ দিয়ে চেপে ধরবে কে দয়া করে? এক উপায়, হাত পা দড়িদড়া দিয়ে বেঁধে চূপ করে পড়ে থাকা। কিন্তু কে কাকে বাঁধে? শেষে অতিষ্ঠ হয়ে উঠে দাঁড়ানাম। তারপর মুখের উপর থেকে চাদর কখন সামান্য সরিয়ে একবার দেখে নিলাম কে কোথায় কি করছে।

আমার বাঁ ধারে ঐ ওপাশে গোটাকতক কখন দিয়ে একটা গোল মত মিচু তাঁবু খাড়া করা হয়েছে। তার ভিতর থেকে অনর্গল ধোঁয়া বেরুচ্ছে। এগিয়ে গিয়ে মিচু হয়ে মাথাটা তার ভিতর গলিয়ে দেখি ওরা সব ঠাসাঠাসি করে গোল হয়ে বসেছে—আর হাতে হাতে কিরছে লম্বা কলকে। জানি না আজ ওদের শেষ দশা কি হবে। হরত বা খানিক পরে খাড়ের উপর থেকে মাথাগুলো ছুঁম দাম করে ছিটকে বেরিয়ে বাবে লকলের।

তাড়াতাড়ি নিজের মাথাটা টেনে বার করে নিয়ে হাঁক ছেড়ে বাঁচলাম। বাইরে প্রচণ্ড তাপ আর কবলের তাঁবুর ভিতর ঐ উৎকট ধোঁয়া। তার মধ্যে আশ্রয় করে বসে টানের পর টান লম্বা কলকের। নির্ধাৎ বুকের জোর না থাকলে বাহুব ও কাজ পারে কি করে! আর, খালি পেটে করবেই বা কি, অন্তত ধোঁয়া দিয়ে ত কিছুটা ভরতি হবে পেটের।

লাফাতে লাফাতে গেলার মণিরামের কাছে। অন চার পাঁচ বলে আছে ওর খাটিয়া ঘিরে। মণিরামের কপালে জলপটি দিয়ে অনবরত ভিজিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এই আগুনের হালকার জলপটি কতটুকু উপকারে

আগবে। হাঁসফাঁস করে হাঁকাচ্ছে ছোকরা। গারে হাত না দিয়েই বেশ বোকা যায় অরের প্রতাপ।

ওদের ওখানে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। কি করা যায় এখন? কিছুই মাথায় এল না। একটা জুতসই সাহসের কথাও শোনাতে পারলাম না মণিরামকে। রক্তবর্ণ চক্ষুটি মেলে সে একবার আমার মুখের দিকে তাকাল। নিজের মনকে বোকাবার চেষ্টা করলাম যে একটা কিছু ভাবব কাণ্ড ঘটবেই বাতে এ ব্যাড়া রক্ষা পাবে ছোকরা। আর কি করব?

সরে পড়লাম ওদের কাছ থেকে। একটু দূরে উঁট দুটো বসে রয়েছে। কোনও আচ্ছাদন নেই ওদের উপর। পাশেই আটার বস্তার হেলান দিয়ে গুলমহম্মদ আর তার ছেলে বসে আছে। ওদের আচ্ছাদন হচ্ছে মাথার পাগড়ির কালতুলনীয় অংশটুকু। তাই দিয়েই ওরা মুখ ঢেকেছে।

ওদের পাশ দিয়ে বাবার সময় কুস্তীর আর ভৈরবীর সংবাদ পেলাম। গুলমহম্মদ আঙুল দিয়ে কুরোটা দেখিয়ে দিলে।

সেই দিকেই চললাম। দেখেই অগ্নি—কোথায় কি ভাবে আছে তারা। কুরোর ধারে পৌঁছে দেখি—কই, কোথাও ত কাকেও দেখা যায় না। গেল কোথায় তারা? আরও এগিয়ে দেখতে পেলাম—কুরোর ভিতর লাড়ি চান্দর কবল দিয়ে বেশ একটি চমৎকার ছোট্ট তাঁবু বানানো হয়েছে। তাঁবুর একটা দিক অল্প একটু খোলা। সেখান দিয়ে উকি বেরে দেখি ভৈরবী কুস্তী আর মুখলাল একটি নেহাৎ প্রয়োজনীয় কর্মে ব্যস্ত। ওদের গারে মাথার কাঁধা কবল জড়াতে হয় নি। একরকম শান্তিতেই আছে ওরা। চীনাবানায় না আখরোট কি একটা জিনিস ভাঙছে আর চিবুচ্ছে।

আমাকে দেখতে পেয়ে, ~~অসহ্যভাবে~~ কুরোর নেবে তাঁবুতে ঢোকবার অন্তে ভৈরবী চোঁচামেচি শুরু করে দিলেন। কুরোর তলার বালির নীচেই জল, সেই জলেই ওরা বসে পেয়েছে। কিন্তু আমার তখন সেখানে নামা সম্ভব নয়। পাড়ের বালি তেতে আগুন আর শুকিয়ে কুরুর হয়ে হয়েছে। নামতে গেলে

রাশীকৃত বালি আমার সঙ্গেই নেমে যাবে পাড় থাকে। তখন ওদের ঐ ভাবুর দশা হবে কি? তারপর আমার উপরে উঠে আসব কেমন করে? ঐ পাড় বেয়ে হড়কে নেমে যাওয়া হয়ত সম্ভব কিন্তু এখন উঠে আসা ওখান থেকে সম্পূর্ণ অসম্ভব—সবাক্কে ফোঁকা পড়ে যাবে। ওদের কাছেই বা এখন থাকি কি করে? দলছুট সবাই জলে পুড়ে মরছে আর আমি কোন্ মুখে এখন ঘেয়েদের কাছে আরামে বসে থাকি।

হেঁকে বললাম “ওখানে এখন আমার যাওয়া অসম্ভব, ভয়ঙ্কর জ্বর মণিরামের। দেখানেই এখন বাড়ি আমি। যদি ঠাণ্ডা জল থাকে তা হাও এক ঘটি ধরে বাই।”

জলটা ঠাণ্ডাই ছিল। নীচে থেকে হুথলাল লোটাটা বাড়িয়ে দিলে। হাত বাড়িয়ে ধরে নিয়ে ঢকঢক করে গলায় ঢেলে চলে এলাম। থাকুক ওরা আরাম করে ওখানে।

খাঁ খাঁ করছে চারিদিক। অগ্নিবৃষ্টি হচ্ছে আকাশ থেকে। হিল হিল করে উত্তাপ উঠছে বালির বুকে থেকে। চোখ মেলে থাকলে স্পষ্ট মনে হয় বেন বর্ণহীন আঙুন লক লক করে লাকিয়ে উঠছে আকাশ পানে। সাধা নেই আকাশের দিকে চোখ ভুলে চাইবার, প্রয়োজনও নেই তার। চোই বুজেই বেশ মালুম হচ্ছে যে মাত্র হাত দুই পশ্চিমে ঢলেছেন সূর্য। ভয় হল—কাপড় কখনো লাউ লাউ করে আঙুন ধরে যাবে না ত!

মণিরামের কাছে কিরে এসে তার মাথার দিকে খাটিয়ার এক কোণার বললাম। ওর নাক মুখ চোখ সমস্ত জ্বলে উঠেছে। একজনকে এক কুঁজো জল আনতে বললাম। সেই জল ধীরে ধীরে ঢালতে লাগলাম মণিরামের মাথায়।

এক কুঁজো দু কুঁজো করে আট কুঁজো জল ঢালা হল। ফলে মণিরামের খাল প্রখাস স্বাভাবিক ভাবে বইতে লাগল। মনে হল মাথায় যে যত উঠেছিল তা এবার নামছে।



খালি কুঁজোগুলো ভরতি করবার জন্যে ভৈরবীর কাছে পাঠিয়ে দিলার। বসে বসে চৰ্চণক্রিয়ার সঙ্গে কুঁজোগুলোও ভরতি করুক ওরা। ওদের তাঁবুর মধ্যেই জল—বালি সবালেই মিলবে।

পোপটলাল এলেন, এসে খাটির পাশে বালির উপর বসে পড়লেন। অনেকেই এল এবং চলে গেল। কি করবে, কেউ কোথাও স্থির হয়ে তিষ্ঠতে পারছে না।

রক্তচক্ষু করে পোপটলাই মণিরামের দিকে চেয়ে বসে রইলেন—একেবারে নির্বাক নিম্পন্দ। সকলেই প্রায় তাই, কারও মুখে রা নেই। কেবল শোনা যাচ্ছে মণিরামের শ্বাসের আওয়াজ। তখনও সমানে জল ঢালছি তার মাথার।

বেলা গড়িয়ে চলল। রোদ না কমলেও সময় ঠেকে রইল না। দিন শেষ হয়ে এল। তখনও হুঁশ ফিরে পাবার কোনও লক্ষণ দেখা যায় না রূপীর। রূপলালকে ডেকে বললাম, “সকলকে বল এক এক কুঁজো জল আনতে। আরও জল ঢালব মণিরামের মাথার।”

আবার খালাস করে ছেঁচে ছেঁচে কুরো থেকে জল তুলতে কারও বিশ্বাসই আপত্তি নেই, যতই দিকদারি লাগুক না কেন। ছুটল সবাই কুঁজো নিয়ে।

শুলমহম্মদ এসে দাঁড়াল। বেকবাব সময় হয়ে এল আমাদের। কি করবে সে, উটেদের পিঠে মালপত্র বাঁধবে কি?

বললাম “আরও একটু সবুজ কর। রোদ পড়ুক আরও। নয়ত বেকবাব কি করে একে নিয়ে? আরও জল ঢালা হোক এর মাথার। তারপর কুঁজো গুলো ভরতি করে নিয়ে ফেরেনো যাবে।”

পাগড়ির মধ্যে আঙুল চালিয়ে বুফো মাথার উকুন খুঁজতে লাগল।

লাফাতে লাফাতে শ্রীমান হুখলাল উপস্থিত। জরুরী সংবাদ এনেছে একটি। আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে কিস কিস করে বললে সেই গুহু কথাটি। একটি প্রাণ-জুড়ানো সংবাদ। কুরোর মধ্যে বালি সবাতে সবাতে একখান

তখনো কাঠ ছিলে গেছে। বাবাজী তাই জানতে এসেছে যে এখান থেকে বাবার আগে চায়ের জল পয়স করবে কি না। ঐটুকু কাঠে চায়ের জলই শুধু পয়স হতে পারে।

ঈমানকে সম্মতি দিয়ে কেবল পাঠান। বললার, “বেশ অনেকটা জল চড়াওগে। অনেকেই চা খাবে। আর মণিরামের জন্যে এক মোটা জলে মিছরি দিয়ে নিয়ে এস।”

চা খাবার কথাটি গুলমহম্মদকে জানিয়ে বললার—“দেখ গিয়ে ওখানে, আগুন জ্বালাতে গিয়ে সর্বস্ব না পুড়িয়ে কেলে ওয়া।”

বুড়ো মহাপুত্রী। চা হচ্ছে—এটি তার কাছে সবচেয়ে বড় হুনংবাদ।

আবার জল ঢালা শুরু হল মণিরামের মাথার। অনেককণ পরে সে চোখ বেলে চাইলে। ধরাধরি করে তাকে উঠিয়ে বসিয়ে দিলার। উঠে বলে মণিরাম ধীরে ধীরে মিছরির সরবৎ গিলতে লাগল।

খাটিয়া ছেড়ে নেমে এলার। পোপটলাল প্যাটেল উঠে এলেন, এসে আমার সামনে দাঁড়িয়ে আমার হু-হাত জাপটে ধরলেন। কোনও কথা নেই তাঁর মুখে—বেশ বুঝলাম কি তাঁর মনের কথা, কি তিনি বোঝাতে চান।

হাত টেনে নিয়ে বেরিয়ে গেলার। কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সময় নয় এখন। কোনও রকমে শৈতুক প্রাপটুকু খড়ে থাকতে থাকতেই সবাইকে নিয়ে কিরতে পারলে বাঁচি এই সাক্ষাৎ সমালয় থেকে। তখন বোকা বাবে ঐ সব কৃতজ্ঞতা ধন্তবাদ ইত্যাদি ভাল ভাল জিনিসের মাহাত্ম্য। সে সময় সব কিছুই বিবতুল্য বোধ হচ্ছে।

কাপড়-কমলগুলো খুলে মোটোয়াট উটের নিচে রাখা আরম্ভ হল। কুঁকোঙলি আবার তরতি করতে করতেই চা হয়ে গেল। তাত রাঁধবার ভেতরিতে করে হু ভেতটি চা বানিয়েছে কুঁকী। পোপটলালও একটু চা পান করলেন। হাতে হাতে প্রদান হয়ে গেল, “দারুণ গ্রীষ্মে চা একমাত্র শীতল পানীয়।”

খাটিয়ার উপর মণিরাম বাবে। ভৈরবীর সঙ্গে এক অভিনব ব্যবস্থা। তিনি বাবেন উর্বশীর মায়ের পিঠে মালপত্রের উপর চড়ে। গুলমহম্মদ তাঁকে বুঝিয়েছে—এতে কোনও মুশকিল নেই। মুশকিল আর কি—তাদের দেশের আওরতরা ত ঐ ভাবে উঠে চড়ে হামেশা ঘোরাফেরা করে। ভৈরবীও ভৈরী। কিন্তু সামান্য একটু বাড়তি মুশকিল দেখা গেছে তখন। তা হচ্ছে, টাল সামলাবার সঙ্গে দু-হাত দিয়ে ধরবেন কি ?

সে মুশকিলেরও আসান হয়ে গেল। উঠের পিঠে আটার বস্তাগুলো ত একগাছা মোটা কাছি দিয়ে কবে বাঁধা হয়ই, সেই কাছি দু-হাতে ধরে থাকলেই হল। কিছু না ধরেই ত বেশ স্বচ্ছন্দে ও-দেশের মেয়েরা একরকম ঘুমতে ঘুমতেই উঠের পিঠের উপর বসে চলে যান। সুতরাং ভাববার কিছুই নেই।

বুঝি খাটিয়ে গুলমহম্মদ বড় উটটার পিঠের মাঝখানে একটু সমতল স্থান বানাল। আটার বস্তাগুলো দু-ভাগ করে উঠের দু পাশে লাড়িয়ে বেঁধে ভৈরবীর সঙ্গে আরামের স্থান বানাতে সে কিছুমাত্র কষ্টের করলে না। তার উপর কখন বিছানো হল। এইবার চড়বার পালা। একবার চড়ে বসতে পারলে তখন আর পায় কে ভৈরবীকে। বালির উপর দিয়ে যে হাঁটতে হবে না এইটিই সবচেয়ে বড় কথা।

উর্বশীর মা বসে আছে। তার পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন ভৈরবী। দাঁড়িয়ে মুখ তুলে দেখলেন কতটা উঁচুতে চড়তে হবে। উর্বশী বসে থাকলে তার পিঠে বাঁধা খাটিয়ার পাড় নাগাল পাওয়া যায়। তাই ধরে কোনও রকমে ঝুলতে ঝুলতে উঠে পড়েন তিনি খাটিয়ার ওপর। কিন্তু এখন—

উর্বশীর মা'র পিঠের উপর চড়া সহজ কথা নয়। উর্ধ্বমুখ করে ওপর দিকে তাকিয়ে ভৈরবী মতলব ঠাওয়াতে লাগলেন।

বুড়ো গুলমহম্মদ নিজের হাঁটুতে দু-হাত দিয়ে পিঠ পেতে দাঁড়াল। ওর পিঠে দাঁড়িয়ে উঠের খাড়ে চড়তে হবে।

ভৈরবী নারাজ।

কুন্তী এগিয়ে গেল। বললে, “উঠে দাঁড়ান আমার কাছে, তারপর উপরে উঠে পড়ুন।” কুন্তী চিঁড়ে-চেন্টা হয়ে যাবে—ভৈরবী ঘাড় নাড়লেন।

শেষে—কি করি—সবাই অপেক্ষা করছে তাঁর উটে চড়ার জন্যে—এগিয়ে গেলাম।

“ধর দড়ি বাগিয়ে—ঠেলে তুলে দিচ্ছি।”

তাই হল। দড়ি ধরতেই পেছন থেকে ঠেলে তুলে দিলাম। হাঁচোড়-পাঁচোড় করে কোনও রকমে তিনি চড়ে বসলেন নিজের আসনে। এইবার উর্বশীর বা উঠে দাঁড়াবে।

“হঁশিয়ার, হঁশিয়ার।”

ওরা বাপ-বেটা দুজন উটের হুপাশে সাবধান হয়ে দাঁড়াল।

“হ—হট—হৈ—হট—হট।” সামনের পেছনের চারখানা পায়ের আঁটখানা তাঁজ খুলে খুলে উট উঠে দাঁড়াচ্ছে। উপরে ভৈরবী দড়ি ধরে একবার এ কোণে একবার ও কোণে হুমড়ি খেয়ে পড়তে পড়তে টাল সামলাচ্ছেন। নীচে দাঁড়িয়ে দেখতে পাচ্ছি তাঁর শরীরের সমস্ত রক্ত মুখে এসে জমছে। যাক—এইবার চলা শুরু হবে।

“জয় শ্রী হিংলাজ বাতাকী—”

“জয়!”

কিছু ও কি! পেছন ফিরে কে আবার বসে বইল ওখানে? কে ও?

ধিরমল।

কি আবার হল ওর? কাছে গিয়ে ডাকলাম, “ধিরমল!”—কোনও সাড়াশব্দ নেই। চোখ বুজে বসে আছে। এইমাত্র ত চা খেয়ে এল। এর মধ্যে আবার হল কি?

একটা হাত ধরে টান দিলাম—“ধিরমল, ওঠ—আমরা যাচ্ছি যে।”

কোনও উত্তর দিলে না ধিরমল। হাতখানা ছাড়িয়ে নেবার জন্যে টানাটানি করতে লাগল। পোপটলাল এসে তার আর একটা হাত ধরলেন।

“কি হয়েছে তোমার ? ওঠ।”

ধিকমল বললে, সে আর বাবে না। এখান থেকেই কিববে করাচী। উত্তর শুনে একেবারে হতভম্ব। ওর দু-হাত ধরে আমরা দু-জন দাঁড়িয়ে আছি। কি বলব ? এখন কি করা উচিত ভেবে পাচ্ছি না। এ অবস্থায় পড়তে হবে বলে কেউই ভৈরী ছিলাম না। তখন কুস্তী এগিয়ে এসে কাছে। ধিকমলের সামনে দাঁড়িয়ে একান্ত মিনতি করে বললে, “ওঠ—আমরা যাচ্ছি বে।”

কয়েক মুহূর্ত ধিকমল কুস্তীর মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল। তারপর—আমাদের হাত থেকে নিজের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়াল।

চক্ষের নিমেষে ঘটে গেল এক তাকব কাণ্ড। ধিকমল ধপ করে কুস্তীর একখানা হাত ধরে ফেললে এবং পরমুহূর্তেই কুস্তীকে টানতে টানতে নিয়ে ছুটল। কি যে হল বা কি হচ্ছে এ সব আমাদের মাঝার চোকবার আগেই অনেকটা দূরে টেনে নিয়ে গেল কুস্তীকে। তার হাত ছাড়াবার অন্তে প্রাণপণে চেঁচা করতে করতে পরিজ্ঞাহি টেঁচাতে লাগল কুস্তী।

সবাই আমরা ধ হরে দাঁড়িয়েই আছি। উটের উপর থেকে ভৈরবী চীৎকার করে উঠলেন, “ধর—ধর—ধর ওদের। নিয়ে গেল বে।”

দৌড়ে গেল অনেক, ঘিরে ধরল ওদের। তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে গেলাম সেখানে। কুস্তীকে ধিকমল কিছুতেই ছাড়বে না। এখনই তাকে নিয়ে কিরে বাবে করাচী। আমরা আপত্তি করবার কে ?

কাছে গিয়ে ধিকমলকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম, “বেশ ত—আমরাও ত কিরে বাব করাচী—একলা তুমি কিববে কেমন করে—মানে, তুমি—”

আর এগোল না আমার কথা। কাকে বোঝাবার চেষ্টা করছি আর কেই বা শুনেছে আমার কথা। কারও কোনও কথা ও শুনে না। চোখ পাকিয়ে বললে, এখনই কিরে বাবে সে তার কুস্তীকে নিয়ে। তখনও

কুস্তী চেঁচা করছে হাতখানা ওর মুঠো থেকে ছাড়াবার জন্যে। কিন্তু সে মুঠো কি সহজে ছাড়ানো যায়।

এ ত এক মহা-বিপদ ঘটল দেখছি! এই পাগলকে এখন রাজি করানো যায় কি করে? অকূল সমুদ্রে পড়লাম।

রূপলাল সামনে এসে দাঁড়াল। থিরুমলের দুই কাঁধের উপর দু-হাত রেখে সে বললে, “ঠিক—বন্ধু, ঠিক। চল আমরা ফিরে যাই করাচী। আর কিছুতেই সামনে এগোনো নয়। চল—এখনই আমরা করাচী ফিরে বাব।”

সামান্য একটু সময়—রূপলালের চোখের উপর নিজের চোখের দৃষ্টি স্থিরভাবে রেখে থিরুমল কুস্তীর হাত ছেড়ে দিলে। তারপর—দু-হাত দিয়ে জাপটে ধরলে রূপলালকে। এখন সে মহানুখী—তার চোখে-মুখে আনন্দ উথলে উঠছে। বন্ধু রূপলালও ফিরে যাবে তাদের সঙ্গে, এর চেয়ে বড় কথা আর কি আছে।

ছাড়া পেয়ে কুস্তী পেছন ফিরে দৌড়। দৌড়ে গিয়ে লুকাল ভৈরবীর উটের পাশে। থিরুমলের কাঁধে হাত রেখে রূপলাল ওকে ঘুরিয়ে নিয়ে এসে অমোদের সকলের অনেকটা আগে চলল। গুলমহম্মদ পেছন থেকে হেঁকে হেঁকে ডাইনে বায়ে বলে রূপলালকে চালাতে লাগল। আমরা দলবদ্ধ সবাই উট দুটিকে নিয়ে ওদের পেছন পেছন চললাম।

চন্দ্রকূপ। চন্দ্রকূপ পৌছতে আর রাজ্য দুদিন বাকি।

নেমে গেলেন পশ্চিমদিকে সূর্যদেব। আমাদের শেখবাবের মত শাসিয়ে গেলেন, “দাঁড়া, কাল আবার ঘুরে আসি। তখন তোদের ভাল করে দেখে নেব।” মনে হল একান্ত অনিচ্ছার তাঁকে বিদায় নিতে হচ্ছে। যেতে হচ্ছে কারণ তাঁর চেয়ে বহুগুণে শক্তিশালী কার অদৃশ্য হস্ত তাঁকে জোর করে টেনে নামিয়ে নিয়ে গেল আমাদের দৃষ্টির আড়ালে। জানি না আজ ঠাকুরের বরাতে কি ঘটবে সেই অতি-শক্তিশালীর হাতে। বাক্যে—

আপাতত আমাদের নিকৃতি মিলল ওঁর হাত থেকে। এইই যথেষ্ট। পরম কৃতজ্ঞ অন্তরে দু'হাত জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে সেই অদৃষ্ট হস্তের মালিককে প্রণাম জানালাম। একান্ত দুঃখ—একান্ত অসহায়—এই কজন মনুষ্যসন্তানের অন্তরের অন্তস্তল থেকে কৃতজ্ঞতার যে প্রকার্য্য সেই সর্বনিরস্তার উদ্দেশে নিবেদিত হল তা যথাস্থানে পৌঁছল কি না কে জানে। আমরা কিন্তু শান্তি পেলাম।

কিন্তু সে কতক্ষণের জন্তে ?

শান্তি বস্তুটি ঠিক কি জাতের পদার্থ তার হৃদ-হৃদিস কি কেউ কখনও দিতে পেরেছে ! কি হলে বা কি করলে শান্তি লাভ হয় এইজন্তে সকলে ব্যতিব্যস্ত। এইটি যদি ঠিক এই রকমের না হয়ে ঐ রকমের হত, হাতে না পাওয়া বস্তুটি যদি যোল আনা বখলে এসে যেত, কিংবা ছনিয়ার তামার ঘটনাগুলি যদি হুবহু আমার মনের মত করে ঘটত, তবেই না নির্জলা শান্তি ভোগ করা যেত। এই জাতের উচ্চাশা বৃকে নিয়ে শান্তি বস্তুটিকে হাতের মুঠোর পাবার জন্তে ছনিরাসুহু সকলে এতই উৎকট উদ্গ্রীব যে তার ফলে ঠিক বিপরীতটি ঘটে বসেছে। শান্তি-লাভার্থে বা -স্থাপনার্থে হানাহানি কানড়াকানড়ি এমন চরম সীমার পৌঁছে গেছে যে প্রকৃত শান্তি কি জিনিস এবং তার স্থায়িত্বই বা কতটুকু এ সমস্ত চিন্তা-ভাবনা আমরা মন থেকে ঝেঁটিয়ে বিদেয় করেছি।

বর্তমানে যে অবস্থার পড়ে আছি এটি থেকে উদ্ধার পেলেই স্থানান্তিত শান্তিলাভ—এই ধরনের চিন্তার অটপ্রহর সবাই হাকুপাকু করে মরছি। যে মুহূর্তে পরের দশাটিতে পৌঁছনো গেল অমনি আবার আরম্ভ হল হানকাসানি—কি করে এটি থেকেও অচিরাত উদ্ধার পাওয়া যায়। অবিরত এইই চলেছে। বর্তমান নিয়ে কেউ ভুট নয়, ভবিষ্যৎ নিয়ে বত মাথাব্যথা। এই ছুরারোগ্য ব্যাধিটির হাত থেকে মুক্তি পাওয়াকেই শান্তি বলা চলে কি না—কে জানে।

কিন্তু এই ব্যাধি থেকে মুক্তি পাওয়া কি সহজ কথা ? আশা করায়ই যদি

কিছুই না রইল তাহলে বেঁচে থাকার সুখটা কোথায়! মন নামক পদার্থটি বতকণ আছে ততকণ ভবিষ্যৎ নিয়ে জল্পনা-কল্পনা করা যাবে কোথায়? আশা-আকাঙ্ক্ষাকে মাথতে হলে মনকেও পুড়িয়ে ছাই করে ফেলতে হবে। কোনও উপায়ে যদি এই কর্মটিকে একবার সমাধা করে ফেলা যায়—তাহলে শুধু শান্তি কেন—বাক্য বলে আপদের শাস্তি—তাই হয়ে যাবে।

কিন্তু সেই মনের নাগাল পেলে ত। সে কাজটি আরও ভয়ানক শক্ত ব্যাপার।

এখানে খালিপেটে আর কতকণ আমরা মনকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে রাখি? যে-কোনও রকমের একটা পেটে পোরায় মত জিনিস দিয়ে পেটটা যদি বোঝাই থাকে তখন ধমক দিয়ে চোখ রাড়িয়ে মনকে দাবিয়ে রাখা হয়ত সম্ভব—“ছি, ছাংলার মত এদিক-ওদিক তাকাতে নেই।”

কিন্তু এ যে একেবারে পেটের মধ্যে ঘটছে কিনা ব্যাপারটা। বাইরের কোনও কাণ্ড ত নয় যে, মনকে চোখ বুজে থাকতে বলব। এ যে একান্ত ঘরোয়া ব্যাপার। নিজের ঘরের ভিতর যদি অবিরাম কান্নাকাটি চলতে থাকে—“ওগো দাও, আমার কিছু দাও গো”, তখন সবকিছু গোলমাল হয়ে যায় যে। তখন কে কাকে দাবায় আর কি বলেই বা দাবায়?

গ্রাসাচ্ছাদনের আচ্ছাদনটুকু না হয় বাদই দিলাম কিন্তু গ্রাসটুকু পর্বত বাদ পড়লে নিজেরই গ্রাসের মধ্যে ঢোকবার যোগাড় হয়ে দাঁড়ায়।

যা হোক একটা গ্রাসের ব্যবস্থাটুকুও যদি কামের থাকে, তখন চোখ-রাভানো সবাই সহ করে—তা ভিতরের মনই হোক আর ঘরের পরিবারই হোক। যেখানে সেটুকুও জোটে না সেখানে মুখের উপর জবাব সুনতে হয়, “ভাত দেবার কেউ নয়, কিল মায়বার গোসাঁই।” এই মোটা কথাটা তুলিয়ে না বুঝে মনকে চোখ ঠারলে হবে কি। জুধাকে কি গোঁজামিল খাইয়ে ভুট করা যায়।

এক উপায় হচ্ছে জুংলিগাসা জর করা। শোনা যায় একত্রে নাকি নানারকমের

বৌগিক পন্থাও বাংলানো আছে। জানি না সেই সব পন্থাগুলি অব্যর্থ কি না। তা যদি হয় তবে জেলায় জেলায় গ্রামে গ্রামে স্কুল-কলেজ খুলে সকলকে ঐ বিজ্ঞান পোষক করে ছেড়ে দেওয়া উচিত। তা হলে পৃথিবীর পনেরো-আনা গুণগোল বার চুকে। যাদের পেটের দায় নেই তাদের শাস্তির কথা বোঝানো সহজ, আর তা হৃদয়ঙ্গম করে তারা নির্লিপ্ত নিরাসক্ত চিত্তে জনতে শাস্তি স্থাপনের কাজে আত্মনিয়োগও করতে পারে। কিন্তু যতক্ষণ তা না হচ্ছে ততক্ষণ শাস্তির মেয়াদ একান্তই এতটুকু মাত্র।

কিছুক্ষণ আগে সূর্য অস্ত যাওয়ার দরুন হাঁক ছেড়ে বাঁচা বহু দুঃখে পাওয়া শাস্তি ক্রমে ক্রমে মিইয়ে এল। তখন সর্বত্র বা হয়ে থাকে তাই শুরু হল। খালি পেটে একে অন্নের ছুতো খুঁজবেই। লেগে গেল ঝগড়াঝাঁটি।

এইই নিয়ম। দুনিয়ার সর্বত্র ছোটবড় যত ঝগড়া-বিবাদ বেধেছে বা বাধব বাধব করছে, তলিয়ে খুঁজলে দেখা যাবে সবকটির মূলেই ঐ একটি হেতু। ক্ষুধা—শাশ্বত সর্বজনীন সার্বত্রিক ক্ষুধা। ছোট ছোট অক্ষরের তুচ্ছ কথাটি, কিন্তু কি অপরিণীম শক্তি যে লুকিয়ে আছে ওর মধ্যে। জ্ঞাননীতি ধর্মাদর্ম সবকিছু ওটির মধ্যে পড়ে নিমেষে ছাই হয়ে যায়। মানুষের মনগড়া আইন কোন্ ছায়—পেটের ক্ষুধা বিধাতার বিধানকেও হার মানায়। ঐ একটি মাত্র জিনিস সঙ্গে নিয়ে জীব ধরিজীব বুকে পদার্পণ করে। যে ক’দিন এখানে টিকে থাকে, ওই ভয়ঙ্কর যোগটি সঙ্গে নিয়েই চলে-ফিরে বেড়ায়।

মস্তবড় ভীর্ণ দর্শন করে মস্তবড় পুণ্যের বিরাট বোঝাটা ঘাড়ে করে কিরকম এখান থেকে এই আশায় চলেছি মনের জোরে। কিন্তু পেটের ক্ষুধা পেটে মধ্যে ধস্তাধস্তি শুরু করে দিলে মনের সঙ্গে। মন হার মানল—সেই ভিতরের ধস্তাধস্তিটাই বাইরে এসে দাঁড়াল—যাকে সামনে পাবে তাকেই ছোবল মারে। আরম্ভ হল খিটিখিটি।

গোকুলদাস ভাট—ঝাড়া সাড়ে পাঁচ হাত লম্বা মানুষ। আমাদের দলে সেই সকলের চেয়ে মানুষ উঁচু। আগাগোড়াই লক্ষ্য করা গেছে যে চিরঞ্জীলাল

নামে একটি বেঁটে ছোয়ান ছোকরা। গোকুলদাসের কুঁজো আর ছোলাটা বয়ে নিয়ে চলেছে, আর দু'পাশে লম্বা দু'হাত তুলিয়ে নিব'ল্‌গাট গোকুলদাস মাথা উচু করে সকলের আগে আগে এগিয়ে চলেছে। আমরা সবাই মনে করতাম যে ঐ ছোকরা গোকুলদাসের একান্ত অঙ্গনত আপনার লোক। সেই গোকুলদাসে আর চিরঞ্জীলালে লেগে গেলে তুমুল কাণ্ড।

চিরঞ্জীলাল তার বেঁটে বেঁটে হাত পা ছুঁড়ে বলছে—“আমি কি তোমার কেনা চাকর না কি যে, আগাগোড়া তোমার কুঁজো আর ছোলা বয়ে নিয়ে যেতে হবে আমাকে ?”

গোকুলদাসের মুখ অনেক উচুতে। সেখান থেকে এল এক বিরাট দাবড়ি—“চুপ করে থাক্‌ বেইমান। না নিবি আমার কুঁজো ত বড় বয়েই গেল। কিন্তু আমার সেই জিনিসটা কোথায় তাই বল, নব্বত টুঁটি টিপে একেবারে শেষ করে দেব।” বলে বোধ হয় সত্যি সত্যিই টুঁটি টিপে শেষ করবার জন্তে তেড়ে এল। অল্প সকলে মাঝে পড়ে অতটা আর হাতে দিলে না।

কিন্তু কি সেই জিনিসটি যার জন্তে টুঁটি টিপতে যাওয়া ? কি এমন ভয়ঙ্কর মূল্যবান পদার্থ সেটি যার জন্তে খুনোখুনি হবার উপক্রম ? ওদের ছদ্মনের কেউ কিছুতেই বলবে না সেই মহামূল্যবান বস্তুটির নাম। শেষে রাগের মাথায় চিরঞ্জীলালই ফাস করে দিলে ভিতরের কথাটি। বললে—“ওই লম্বা বদমাশটা সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছিল একটা বাগিশ। সেটার ভিতর ছিল তুলার বদলে চূর্ণা ঘোঝাই করা। সকলকে সুকিয়ে ও মাঝে মাঝে সেই চূর্ণা খেত। নিজের খেয়ে কবে সবটা সাবাড় করেছে। এখন বলে যে আমি নাকি খেয়ে ফেলেছি সবস্তুটা।”

চূর্ণা আবার কি জিনিস যে বাবা—যার জন্তে এই মহামারী কাণ্ড !

পোপটলাল বুঝিয়ে দিলেন—আটার জল না দিয়ে যদি বেশি করে বি দিয়ে ভাজা যায়—তার পর তার সঙ্গে চিনি মিশিয়ে নেওয়া হয়, তাহলে যে পদার্থ তৈরী হয় তাহার নামই চূর্ণা। সেই উপায়েই খাদ্য বহুদিন নষ্ট হয় না।

হিসেবী গোকুলদাস বাড়ি থেকেই আশ্রয় করতে পেরেছিল যে, পথে খাওয়া জুটবে না। তাই ওই ভিনিসি হুহুর কাথিওয়াড় থেকে সঙ্গে করে এনেছিল। সেই মহামূল্য খাদ্যদ্রব্য তার সঙ্গে আছে এ কথা সকলে না জানতে পারে এই ছিল তার অভিপ্রায়। জানাখানি হলে ভেতন-ভেতন অবস্থার ভাগ না দিবে উপায় থাকবে না এই কারণেই এত সাবধানতা। বিশ্বাস করে বসেছিল সে একমাত্র চিরঞ্জীকে। একজনকে অন্তত না বলে উপায় নেই। বইতে হবে, লাগলাতে হবে। শুধু বলা নয়, ভাগও দিচ্ছিল সহানে চিরঞ্জীলালকে। হঠাৎ সেটার সবটুকু উখাও হয়ে যাওয়ার এই গণ্ডগোল।

বিবর চটে গিয়ে শেবটা গুর হয়ে গেল গোকুলদাস। সবটুকু চেটেপুটে শেষ করেছে চিরঞ্জী এ শোকও বরং সহ্য করা যায় কিন্তু কথাটা সকলের কাছে ফাঁস করে দিবে কি লজ্জাতেই কেলে দিলে সে বেচারাকে। তাটের উচু মাথা হেঁট হয়ে গেল।

এত হৃৎকণ্ঠের মধ্যেও এই ব্যাপারে লবাই বেশ মজা উপভোগ করলে। কিছুকণ অন্তমনস্ক হয়ে হাঁটা গেল। এখানে রাতও বত বাড়ে কুখ্যাত তত বাড়ে—পথ যেন আর কুরার না। বারবার গুলমহম্মদকে লবাই বিরক্ত করেছে, “কতটা পথ আর বাকি আছে?” উত্তর দিতে দিতে বুড়োর মেজাজ গেল বিগড়ে। একে ওই বয়স, তার উপর খালি পেট—কতকণ আর মেজাজ ঠিক থাকে।

কয়েকটা চড়া চড়া কথার আদান-প্রদান হয়ে গেল।

সর্বাগ্রে চলেছে রূপলাল আর খিরমল, তারপর বড় উট, বার উপরে কৈরবী, নামনে গুলমহম্মদ। অন্ত সকলে সেই সঙ্গে চলেছে। তারপর ছোট উটের উপর হণিয়ার, সঙ্গে পোপটলাল আর দিলমহম্মদ। কুতী আর আরি বড় উটের সঙ্গে হাঁটছিল। ক্রমেই কুতী গিহিরে পড়তে লাগল। তার শরীরের কামখ্য

কুঁপিয়ে এসেছে। অস্তিম চেষ্টার নিজের শরীরটাকে কোনও মতে টেনে নিয়ে চলেছে সে। উপর থেকে তার অবস্থা দেখে ভৈরবী আমাকে সাবধান করলেন, “মেয়েটার উপর নজর রাখুন—ওর অবস্থা মণ্ডোন হয়ে উঠছে—এইবার পড়বে।”

তাই করলাম, তার কলে ক্রমে আমিও পিছিয়ে পড়তে লাগলাম। বতাই উৎসাহ দিই, কুঁতী ততই পিছিয়ে পড়ে। ছোট উটটাও আমাদের ছাড়িয়ে এগিয়ে গেল। অনেক আগে বড় উটের পিঠে একটা কালো পদার্থ হুলতে হুলতে চলেছে। অন্ধকারের মধ্যে সেদিকে নজর রাখছি। মাঝে মাঝে তাড়া দিছি কুঁতীকে। শেষে নিরুপায় হয়ে হাত বাড়িয়ে দিলাম।

“ধর আমার হাত, তাহলে জোরে চলতে পারবে।”

কুঁতী ছ’হাত দিয়ে আমার হাতটা চেপে ধরলে। তার জলন্ত চক্ষু দুটি অন্ধকারে আমার চোখের উপর স্থির ভাবে রেখে কি দেখল,—তারপর কান্নার ভেঙে পড়ল।

কি ব্যাপার। এর আবার হল কি? দাঁড়াতে হল বাধ্য হয়ে। কান্না আর খামতেই চার না। আমার হাতখানা ওর নিজের মুখের ওপর চেপে ধরে কুঁপিয়ে কুঁপিয়ে কান্ডাতে লাগল কুঁতী। যেন কান্না চাপতে গিয়ে নিজেই এবার কেটে পড়বে। বত জিজ্ঞাসা করি—“কি—হল কি?”—তত কান্না বাড়ে। এ ত মহা মূণকিলে পড়া গেল দেখছি। ওখানে ওরা সব আরও এগিয়ে যাচ্ছে। চেষ্টারে ওদের খামতে বলব না কি।

শেষে নিজেকে একটু সামলে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে কঙ্ককণ্ঠে কুঁতী জিজ্ঞাসা করলে—“কি হবে আমার?” এ আবার কোন ধরনের প্রশ্ন? সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলাম—“তার মানে?”

কুঁতী কিছুকণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর আবার তার কান্না উথলে উঠল। সেই সঙ্গে সে এক গান্না প্রশ্ন করে বলল।

“কি হবে আমার? কি হবে আমার আর বেঁচে থেকে? আমি আর

পারি না—আর আমি কোথাও যাব না। আমাকে এখানেই কেলে রেখে যাও তোমরা। আমি...আমি...আমি..."

বলতে বলতে সন্ধ্যাই সে সেইখানে শুয়ে পড়তে গেল। যেন আর খাড়া থাকার শক্তিটুকু পর্যন্ত নেই তার শরীরে। বসে পড়ার আগেই তার হাত ধরে টেনে খাড়া করে দিলাম। কুস্তী একটু সামলে নিলে। নিয়ে আমার হাত থেকে ওর নিজের হাতখানা ছাড়াবার জন্তে মোচড়তে লাগল। কারা মিশিয়ে আমার একরাশ প্রশ্ন—

"কেন তুমি আমার বাঁচাতে গেলে? কেন তখন আমার মরতে দাওনি? কে তোমার বলেছিল আমার বাঁচাতে? আমি বলি কি কতি হত তোমার? কেন? কেন? কেন? কেন? কেন?"

তার একখানা হাত জোর করে ধরে আছি—সেই ধরা হাতখানার উপর সে কপাল ঠুকতে লাগল সজোরে।

"এখন তুমি কিছুই জান না, কিছুই বুঝতে চাও না তুমি। তোমাকে কিছু বলা আর পাথরে মাথা ধোঁড়া ছুইই সমান। কেন তুমি আমার টেনে নিয়ে চলেছ? ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও আমার—শান্তিতে মরতে দাও এখানে।"

একটা যে কিছু বলব তারই বা কুসংস্কারে কই? কি করি? এটাও কেনে উঠল না কি?

সামনে চেয়ে দেখলাম। অনেক দূরে সবাই চলে গেছে। মনে হল যেন ওরা ঘেমেছে। ভৈরবী রয়েছে খোলা উটের পিঠে। নজর করে দেখবার চেষ্টা করলাম। এতদূর থেকে অস্বাভাবিক স্টাইল কিছুই বোঝা গেল না। কিন্তু মনে হল বড় উটটা বসে পড়েছে।

কি হল আমার ওদের? একটা সম্ভব আর আশঙ্কাজনক ঘটনা ঘটে উঠল। পড়ল নাকি উটের উপর থেকে? কুস্তীর হাতে একটা কাঁকানি দিয়ে তাকে ধমক দিলাম।

"পাগলামি কোরো না—চলে এস পা চালিয়ে।"

জোর করে সে তার হাত ছাড়িয়ে নেবেই। “না, কিছুতেই আর বাব না আমি—বাব না তোমাদের সঙ্গে আর। তুমি আমাকে কের ওর হাতেই দিয়ে দেবে। তোমার কাছে আমি কিছুই নই—এক কানাকড়ি আমার দায় নেই তোমার কাছে। যেদিকে খুশি আমি এখান থেকেই চলে বাব। আমার হুঁসি ছেড়ে দাও—আমি...”

আর ওর কথায় কান দিলাম না। হিড় হিড় করে টানতে টানতে নিয়ে ছুটলাম।

উট থেকে নেমে পড়েছেন ভৈরবী। বাধ্য হয়ে তাঁকে নামতে হয়েছে। মোটা কাছি গ্রাণপণে ধরে টাল সামলাতে তাঁর হুহাতের চেটোর ফোসকা পড়েছে। উট থেকে নেমে আমাদের না দেখতে পেয়ে তাঁর চক্ চড়কগাছ। এমন সময় খাড়া করে দিলাম কুড়ীকে তাঁর সামনে।

“ধর তোমার কুড়ীকে। ওর মাথাটাও বোধ হয় বেগড়াল এবার।”

“মাথা কি হবে। শরীর আর বাছার বইছে না।” বলে পরম ঘেহে ভৈরবী তাকে জড়িয়ে ধরলেন।

উকীকে বসিয়ে মণিরামকেও নামানো হল। তার অর ছেড়ে গেছে। ভৈরবী শ্রীমান রুখলালকে বললেন সেই ঝোলাটাও নামিয়ে আনতে। সবাই উদ্গ্রীব হয়ে উঠলাম—কোন্ ঝোলা—কি আছে সেই ঝোলার?

ঝোলা এলে তার ভিতর থেকে বেরতে লাগল—পোড়ানো চীনাবাদাম, ছাড়ানো পেরাজ, খেজুর কিসমিস মিছরি। অক্ষুণ্ণ ভাণ্ডার। আজ সারা হুপুয় সেই কুরোর মধ্যে বসে এই সব পোছানো হয়েছে। আমরা গোল হয়ে বসে পড়লাম। ভৈরবী সকলের কোলে মূঠো মূঠো দিবে গেলেন ভাগ করে। কয় কয় করে উঠল সবাই। রুখলালের পাশে বসে বিরমল পরমানন্দে চৰ্চণ করতে লাগল। কোনও গোলমাল নেই। গোহুলদাস প্রথমে কিছুই নেবে না, পোপটলালের খমক খেয়ে পেয়ে নিলে। শুধু কিসমিস আর মিছরি পেলে মণিরাম। বাছার তাকে দেওয়া হয় না। জল খেয়ে সে আর খাটরার

চড়তে রাজি হল না। সে এবার সকলের সঙ্গে আঙুলে আঙুলে হেঁটে যেতে পারবে। ভৈরবী কিছুতেই শুনলেন না—অগত্যা আবার ঘণিরামকেই খাটিয়ার উপর উঠতে হল।

কুস্তীর কাঁধে হাত রেখে ভৈরবী হাঁটতে লাগলেন। সকলেরই কেঁদাঝ একটু ঠাণ্ডা হল। বুড়ো গুলমহম্মদের মুখের ভাবটাও একটু যেন নরম হল।

স্বয়ংগ বুঝে বিনীতভাবে এবার আমিহী বুড়াকে জিজ্ঞাসা করলার, “কি শেখ সাহেব, আমরা কি এখনও অর্ধেক পথও পার হই নি?”

মুখ তুলে দূরের আকাশের দিকে তাকিয়ে একটু দাড়িতে হাত বুলিয়ে বার দুই মাথা নেড়ে শেখ সাহেব আন্দাজ করে উত্তর দিলেন—“খোদা মেহেরবান—আর ঘণ্টা তিনেকের মধ্যেই আমরা সামনের কুরোর ধারে পৌঁছব।” বলে উৎসাহের সাথে আলাপ জুড়ে দিলেন।

আমরা অগ্রসর হলাম।

মেহেরবান খোদার অপার মেহেরবানিতে বেশ মশগুল হয়ে হাঁটছি আর ভাবছি।

ভাবছি অনেক কিছু। তলিয়ে দেখছি—ভীর মেহেরবানির আর মজির দৌড় কতখানি।

কথার কথার আমরা বলে ফেলি, ‘প্রভু, তোমারি ইচ্ছা, সবই তোমার কৃপা।’ এই কৃপাময়ের কৃপার বেড়ে কতটুকু কুলার তাই ভাবছি।

সবমিলে সব বেশ সচল অবস্থা, যেটি যেমন হওয়া উচিত তেমনই হচ্ছে, যেটি হওয়া বাঞ্ছনীয় নয় তা কখনও তুলেও হচ্ছে না। যে কাজে হাত দেওয়া থাক তা এমন স্বচ্ছন্দে অক্লেশে সমাধা হয়ে যাচ্ছে যেন আগে থেকেই কার্যটি সমাপ্ত করা ছিল। কোথাও কিছু আটকাচ্ছে না। কার্যবস্ত্রটি চট করে হাতের মুঠোর এসে চুকছে, আর যেগুলি হাত কসকে গেলে বুক চড়চড় করে ওঠে সেগুলি কিছুতেই হাত কসকাজে না। ঠিক এইরকমটি যদি চাল

থাকে আগাগোড়া, তবেই না পরম স্থিতিতরে বলা যায়, “সবই তাঁর দয়া, সবই তাঁর ইচ্ছা।”

আর তা যদি না হয়—তখন ?

যদি একটার পর একটা পড়বড় শুরু হয়ে যায়, সবই যদি বেহুতো বাজতে থাকে—কোনও দিকে হাত বাড়ালেই হাতে কোসকা পড়বার উপক্রম হয়, হেসে কথা কইতে গেলে সবাই দাঁত বার করে ভেংচার, পদে পদে ঠোকর খেতে খেতে পা হয় ক্ষতবিক্ষত—তখন ?

তখন আর মেহেরবানির কথা, দয়া কৃপা করুণা এই সমস্ত মিষ্টি মিষ্টি বস্তুগুলি মনের কোণেও আসে না। নিজের গোড়া নসিবের দোহাই পাড়া ছাড়া আর কিছুতেই সাধনা পাবার কোনও উপায় থাকে না তখন। লম্বা লম্বা নিঃশ্বাস জোরে জোরে বেরিয়ে আসে তখন কলিজা খালি করে। নিজের কপালে করাঘাত করে ‘নিয়তি—সবই নিয়তির খেলা’ বলা ভিন্ন আর কিছুই বেরোর না তখন মুখ দিয়ে।

তাই ভাবছি আর হাঁটছি।

কোনটির ক্ষমতা বেশি—করুণাময়ের করুণা ? না নিয়তির কুটিল পরিহাস ? বরাতের কের, না ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা ? বিধির বিধান, না ভাগ্যের বিড়ম্বনা ? কোনটি সত্য ? কার উপর নির্ভর করে সমস্ত তার ছেড়ে দিয়ে হাত পা ঝেড়ে চূপ করে বসে থাকা যায় ?

একটা কিছু অবলম্বন চাই ত। নরত এই যে অবিরাম ডুবছি আর ভাসছি, ভাসছি আর ডুবছি, এর থেকে পরিজ্ঞান পাব কি করে ? কি সে অবলম্বন যাকে আঁকড়ে ধরে থাকলে ডুবতে হবে না, ভাসতে হবে না—ভাগ্য, বরাত, বিধির বিধান, করুণাময়ের করুণা, খোদার মেহেরবানি—এর একটিকেও পয়োরা না করে অচঞ্চল বুক জুলিয়ে চলাকেরা করা যাবে ; বুক ছড়ছড় করবে না, হাত ধরধর কাঁপবে না, চোখ-চলচল, পা-টলটল, বন-বুকপুক এ সমস্ত কিছুবই ধার ধারতে হবে না ?

সেই আঁকড়ে ধরার মত অবলম্বনটির তলাসেই ত ছুটে বরছি। এই যে চলেছি এগিয়ে আরও সামনে, এরও ওই এক উদ্দেশ্য। ঐ অবলম্বনটিকে তলাস করে বার করা, পাকড়াও করা, তারপর বুকের মধ্যে সেটিকে পুবে নিয়ে ফিরে আসা—বাস্, তা হলেই মোক্ষ লাভ, বাক্য বলে একেবারে কেলা ফতে।

কেলা ফতে করতে চলেছি। ভাইনে বায়ে কোনওমিকে নজর দেবার এখন ফুরসৎ কই। আর এখনই জুটছে বত সব আপদ-বালাই, পা জড়িয়ে ধরে কাঁদছে।

কামা, আর সেই চিরকালের পুরনো প্রশ্ন, “আমার কি হবে?”

কি হবে তা আমি জানব কেমন করে? জানতে বাবই বা কেন? আর জানলেই বা বলতে বাব কোন্‌ ছাংখে? কি এমন গরজ আমার?

তোমার হবে কি? এর চেয়ে ঢের বড় প্রশ্ন—আমার নিজের কি হবে? সে প্রশ্নের ঘীমাংসা কে করে? আজ পর্যন্ত কত দরজার কতবার মাথা খুঁড়লাম, কত পায়ে চোখের জল ঢাললাম, কত আত্মহুড় খাঁটলাম, কত ছোট্টা ছুটলাম, ফল কি পেয়েছি? কোথাও উত্তর মিলল না ঐ প্রশ্নের যে “আমার কি হবে?” কেউ এর উত্তর দিলে না, সবাই মুখ ফিরিয়ে নিলে। মুখের উপর কপাট বন্ধ করে দিলে বা মুখ টিপে হাসতে লাগল।

আমাকে প্রশ্ন করতে এলেছে, “আমার হবে কি?” বা খুনি যেমন খুনি হোক—তাতে আমার কি? আমার কতটুকু কতিবুজি? বত সব উড়ো আপদ! যেতে দাও, যেতে দাও—বত সব বাজে কেসাদ।

পাল থেকে ভৈরবী একটি খাকা দিলেন—চমকে উঠলাম। “কি বকছেন গৌ গৌ করে, হাঁটতে হাঁটতে অগ্নি দেখছেন না কি?”

“নাঃ, কিছু নয়,” বলে একটি বিড়ি ধরালাম।

বিড়িটি ধরিয়ে মুখ তুলে চেয়ে দেখি দিগন্তে আকাশচুম্বী এক নিকব-কালো প্রাচীর চোখের দৃষ্টি আড়াল করে দাঁড়িয়ে আছে। যেন ঐখানেই পৃথিবীর শেষ হয়ে গেছে।

পাথরের ভল্লার বালি কখন যে বড় বড় পাথরের চাকড়ে পরিণত হয়েছে, খেয়াল করি নি। পদে পদে বুধ বুধে পড়তে পড়তে সামলে নিচ্ছি। মাথার উপর বহু উঁচুতে তারাগুলি এখনও দগ দগ করে জলছে, কিন্তু নীচে তত্বতকে ঝকঝকে বালি না থাকার ওদেয় আলো আর কোনও কাজেই লাগছে না। কিলের উপর প্রতিকলিত হয়ে তারার আলো অন্ধকার ঘোচাবে এখানে। ক্রমেই যুটযুটে মাথারের মধ্যে আমরা প্রবেশ করতে লাগলাম।

উঁচুনিচু নরু অসমান পথে সাবধানে পা ফেলে আমরা এগোচ্ছি সামনের উট দুটির উপর নজর রেখে। ছোট-বড় ধারালো-ভোঁতা নানা আকারের পাথর সর্বত্র ছড়ানো। তাও চোখে কিছু ঠাণ্ড হচ্ছে না। হোঁচট ধেরে বার বার হুমড়ি ধেরে পড়তে পড়তে হাতে পারে বা সব ঠেকছে তাতেই মালুম হচ্ছে যে, যেখান দিগে আমরা চলেছি তাকে পথ বা বিপথ কিছুই বলা চলে না।

মাথার উপরের আকাশ ক্রমশ ছোট হয়ে আসতে লাগল। সামনের কালো দৈত্যটা ক্রমেই আরো বিরাট আকার ধারণ করল। আমাদের ডাইনে বাঁয়ে তার প্রকাণ্ড ডানাতুটো ক্রমেই ছড়িয়ে পড়তে লাগল। তখন একটা বজার খেলা আরম্ভ হল। আমরা বত এগোই সেই দৈত্যটাও তত পিছোয়। এইভাবে পিছু হটতে হটতে সে তার অন্ধকার রহস্যময় গর্ভের মধ্যে আমাদের টেনে নিয়ে যেতে লাগল। বেন এক জাহ্নবীর প্রভাবে একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমরা এগিরে যেতে বাধ্য হচ্ছি।

সামনে থেকে জলমহম্মদ বলে উঠল, “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ!” সেই সঙ্গে পুত্র দিলমহম্মদ গলা মিশিয়ে দিলে, “মহম্মদুর রহমুল্লাহ!” আমরা ধামলাম।

উট দুটিকে ঘিরে ঝাড়িয়ে চারিদিকের নিবিড় অন্ধকারের দিকে চেয়ে, ভয় বা ভয়না—এর কোনটিরই বোধ হল না। শুধু দেহে আর মনে একটা ধরধরে অস্বস্তি-বোধ পাথরের মত চেপে বসল।

এই ভাবটা কাটাবার অস্তেই বোধ হয় কে চীৎকার করে উঠল, “জয় হিংলাজ মাতাকি—”

“জর !”

আরম্ভ হয়ে গেল, “জর জর জর জর—!” চতুর্দিকের আঁধারের মধ্যে গা ঢাকা দিয়ে দাঁড়িয়ে শত শত অশরীরী “জর জর—” করতে লাগল। ক্রমে ক্রমে সেই ধ্বনি উপরের দিকে উঠতে উঠতে পাহাড়ের মাথার উঠে তবে থামল। আমরা আরও স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

তখন সকলেই ব্যস্ত হয়ে উঠল আলো জালতে, কাঠ খুঁজতে, জল আনতে।

কুয়ো কই? জল কোথায়?

উট ছুটিকে বসিয়ে মালপত্র নামানো হচ্ছে। মণিরাম নেমে এসে সামনে দাঁড়াল। গারে হাত দিয়ে দেখলাম জর তার সতিাই ছেড়ে গেছে।

রূপলাল পণ্ডিত বিক্রমলকে সঙ্গে করে সামনে এসে দাঁড়ালেন। তারপর লাড়খরে ঘোষণা করলেন পণ্ডিতজী যে, আগামী কাল শেষ রাত পর্যন্ত আমাদের ছুটি। এখান থেকে কাল সন্ধ্যাবেলায় রওানা হয়ে পরশু বিকালের দিকে আমরা পৌঁছব চন্দ্রকূপ। সেখানে পরশু-রাতটা কাটিয়ে ভোরবেলা চন্দ্রকূপ-বাবার দর্শন করে তবে আবার রওানা, তখন আর পথে কোথাও কোমণ্ড তকলিক নেই।

শুনে সেইখানেই বলে পড়লাম। শুধু বলে পড়া নয়, একেবারে গা এলিয়ে দিলাম। বাক, এতক্ষণে নিরুত্তি মিলল পুরো চক্ৰিশ ঘণ্টার মত। নিশ্চিত।

কিন্তু নিশ্চিত হবার কি কো আছে। ভৈরবী উপস্থিত—পিছনে কখন যাড়ে কুড়ী।

“কোথায় পাতব কখন?”

মুখে এল, “বে চুলোর খুনি।” কিন্তু তা ত আর বলা চলে না। হুতরাং হোঁক মিলে কথাটিকে আবার পেটের মধ্যে চালান করে দিয়ে বেশ ঘোলায়েন করে বললাম, “দেখনা কোথায় সুবিধা হয়।” বলে হাত বাড়িয়ে একখানা পাথর টেনে নিয়ে মাথার নীচে দিয়ে ওপাশ কিয়ে উলাম।

জানি এই পাহাড়ের গর্ভে এই আধারে অন্য কোথাও সুবিধা হবে না তাঁর। খোলা-মেলা জায়গার তারার আলোতে আলোটা জায়গা পছন্দ করতে বাধ্যত না। কিন্তু আজ আর অন্য কোনও চুলোর বাবার সাহস নেই।

সেইখানে দাঁড়িয়েই একবার চারিদিকে দেখে নিলেন ভৈরবী। কখনওলো ঘাড়ে করে কুস্তী পিছনে দাঁড়িয়ে আছে। শেষে তাকে হকুম হল সেইখানেই কখন পাততে। তাই হল এবং সঙ্গে সঙ্গে সটান শুয়ে পড়ে একটি লম্বা “আ—!” উচ্চারণ করলেন তিনি।

কুস্তীকেও তাঁর পাশে শুয়ে পড়বার আদেশ হল। “কাজ নেই আর এই শেষ রাতে রান্নাবান্নার হালান্না করে। বস্টা দুই আর রাত আছে বড়জোর। এইটুকু সময় পড়িয়ে নিয়ে কাল সকালে রান্নার ব্যবস্থা করা বাবে। কি বলেন?”

কি আর বলব। কিছু না বলাই বুদ্ধিমানের কাজ, চোখ বুজে শুয়ে রইলাম।

ওধারে পটাপট শুকনো ডালপালা পুড়ছে। চটাপট শব্দ উঠছে হাতে করে আটা চাপড়ানোর। পোড়া রুটির গন্ধ ভেসে আসছে।

এলেন পোপটভাই। একান্ত কুষ্ঠিতভাবে নিবেদন করলেন যে, তিনি যহন্তে এই শেষ রাতে রুটি বানাচ্ছেন আমাদের অঙ্গে। সেগুলি ভোজন করে তবে আমাদের সুমুতে হবে। এইটুকু কষ্ট আজ আমাদের করতেই হবে, নয়ত তিনি ছাড়বেন না।

তাঁর ঠিক পিছনেই দাঁড়িয়ে ছিল অক্লান্ত উৎসাহের আধার আমাদের শ্রীমান সুখলাল, তারও একটি সংবাদ আছে। সে চায়ের জল চড়িয়ে দিচ্ছে। চা আনল বলে।

ওদের দুজনের পিছনে উপস্থিত শেখ সাহেব। ওরা চলে গেলে বুড়ো মাথার পাগড়িটা খুলে আমার পাশে কেলে থপ্ করে তার উপর বসে পড়ল। বুড়োমাকড়, শরীর আর কত বয়।

তারও একটি জরুরী আরজি আছে, নয়ত এ সময় সে বিরক্ত করতে আসত না।

বললাম, “তবে আর একটু কষ্ট করে আরজিটা পেশ করে কেল।”

বৎসামাস্ত ব্যাপার। গুলমহম্মদের বক্তব্য হচ্ছে এই—দু দুটো দিন উট দুটো দাঁতে কুটো কাটতে পার নি। এখনই তার ছেলে চলেছে উট নিয়ে চরাতে। সন্ধ্যার আগে সে ফিরবে না। সকলেই আগুন জ্বলে কুটি পোড়াচ্ছে। তার অবস্থা আর কুটি চাইবার হক নেই। কারণ সে ত আগুনেই তাদের প্রাণ্য সমস্ত আটাটা নিয়ে নিয়েছে। তবু যদি প্রত্যেকে একখানা করে কুটি তাকে ধরবার করে তবে বড়ই উপকার হয়, এখনই দিলমহম্মর উট নিয়ে রওানা হতে পারে। নয়ত কুটি বানিয়ে নিয়ে বেহতে গেলে অনেক দেরি হয়ে যাবে। এ কয়দিন ত আর ওদের কুটি বানাতে হয় নি, তার বেটা কুস্তী-মারীর কপাতেই কাজ চলে গেছে।

বুললাম যে আমাদের গুরে পড়তে দেখে অন্ত কোনও উপায় না করতে পেরে বুড়ো শেষে আমাদের কাছেই আসতে বাধ্য হয়েছে।

বললাম, “বেশ ত, নাও গিয়ে সকলের কাছ থেকে একখানা করে কুটি চেয়ে।”

একটি দীর্ঘশ্বাস কলে বুড়ো উত্তর দিলে, সে চেষ্টা সে ইতিমধ্যেই করেছে। কলে সকলেই বিরক্ত হয়েছে। কেউ কেউ তাকে আইন দেখিয়েছে। একখানা কুটি পাওয়াই আইন। আর খইছার তারার আটা হিসাব করে নিয়ে নিয়েছে তারা। এখন আবার কুটি চাইতে আসে কোন্ মুখে?

তুনে কুস্তী খড়কড়িয়ে উঠে পড়ল। দুদিন উপবাসের পর না খেয়ে একটা লোক চলে যাচ্ছে আর সে আরাম করে গুরে থাকবে! কাঁঠ কই? চারটি লকড়ি এনে দাও তাকে। পাঁচ মিনিটের মধ্যে খানা বানিয়ে দেবে সে।

গোলমাল শুনে পোপটতাই আবার ছুটে এলেন। তাঁর হুহাতে আটা মাখা। সমস্ত তুনে কুস্তীকে উঠতে বাধ্য করলেন, বললেন, “কই, গুলমহম্মর ত

আমার কাছে বার নি, ওদের দু জনের কটি ওখানেই বানানো হচ্ছে,—হল বলে, আর পাঁচ মিনিট—”

বুড়ো বললে, “তোবা তোবা!” সে কি একেবারে বেশরম, ওখানে মহাস্ত মহারাজের খানা বানানো হচ্ছে, ওখানে আগে থেকে সে বার কি করে! তার চেয়ে চারটি বাদাম আর খেজুর যদি তাকে খররাত করি আমরা তাহলেই হাঁড়িমা চুকে বার।

রূপলাল এসে দাঁড়াল। হাতে একগাদা কটি—খোঁয়া বেরুচ্ছে। বললে, “আনলাম সকলের কাছে থেকে একখানা করে কটি কেড়ে নিয়ে, এতেই আমার দোস্তর সন্ধ্যা পর্যন্ত চলে যাবে। এখন তোকা হয় খানিকটা শুড় পেলে।”

শুড়, লঙ্কার চাটনি, পেঁয়াজ বার করে দেওয়া হল। দুটো লোটোর গলায় গামছা দিয়ে হুহাতে ধরে সুখলাল উপস্থিত। গেল চুকে গুগোল। চা কটি ধরে আর সারাদিনের কটি বেঁধে নিয়ে দিলমহম্মদ উট সহ বেরিয়ে গেল। তখনও শুকতারা বিদায় নেয়নি।

আমরা খেতে বসলাম। পোপটভাইএর বাড়ি থেকে আনা খাঁটি ঘি মাখানো পাতলা পাতলা গরম কটি—রহুনের চাটনি সহযোগে আকর্ষ বোঝাই করে হিংলাজের জয়ধ্বনি দিয়ে যখন আমরা আবার শরন করলাম, তখন পাহাড়ের মাথার উপরের আখার পাতলা হয়ে আগছে, তবে নীচে তখনও বেশ জমার্ট অন্ধকার।

কিছুক্ষণ পরেই পাহাড়ের চূড়া থেকে একটা একাও পাখী তার বিরাট হুই ডানা মেলে নেমে এল। সেই ডানার তলায় আমরা সকলে ঢাকা পড়লাম। সে পাখীটির নাম নিভ্রা, অপর নাম সর্বসম্ভাপহারিনী, বার বুকের তলায় আশ্রয় পেয়ে সন্ত-পুত্রহারা জননী পুত্রশোকের জ্বালা ভুলে নাক ডাকার।

নাক আমাদের ডেকেছিল কিনা তা সঠিক বলব কি করে। কেউই ও কারুর নাক ডাকার নাকী থাকবার দরুন ভেগে ছিলার না।

নাক ডাকা বন্ধ হবার পর আবার বন্ধ চক্ৰ মেলে চাইলাম, তখন—

‘চক্ৰ আমার তুফা, ওগো, তুফা আমার বন্ধ জুড়ে’

গান জুড়ে দেবার বাসনা থাকলেও সামর্থ্য কুলোম না। শেষ রাতে আকর্ষকটি গেলার কলে গলা শুকিয়ে এমনই কাঠ হয়ে গিয়েছিল যে, “ভৈরবী, একটু জল।” এটুকুও গলা দিয়ে বার হইল না। বহুকষ্টে উঠে বসে ভৈরবীকে ডাকতে গিয়ে হঠাৎ যে দৃশ্য চোখে পড়ল তাতে চক্কর নিম্নেবে চক্কর তুফা আর বন্ধের তুফা দুইই উধাও হয়ে উবে গেল।

হা করে চেয়ে রইলাম।

কালো পাথরের পাহাড়, গাছপালা কোপ-জঙ্গল কিছু নেই। পাথরের পর পাথর দিয়ে উচু করতে করতে সেটার মাথাটা আকাশের গারে ঠেকানো হয়েছে। কোনও ছাঁদ নেই ছিঁচি নেই। যুগ যুগ ধরে কারা যেন এই রাস্তাঘাট পাথর অস্ত্র কোথাও থেকে বয়ে এনে এনে এখানে জমা করেছে। আর বারা এই কর্ম করেছে সেই অমিতবলশালী মহাবীরদেরই এক উপযুক্ত বংশধর ঐ পাথরের স্তূপের মধ্য থেকে বেরিয়ে এসে উপরে দাঁড়িয়ে নীচের সবকিছু হস্তিময় হস্তটিকে নিরীক্ষণ করেছে।

ঐ পাহাড়ের পটভূমিকার মাহুঘটিকে এমন চমৎকার মানিয়েছে যে, একটির থেকে আর-একটিকে আলাদা করে চিন্তা করা যায় না।

সাধারণ মাহুঘ তাকে কিছুতেই বলা চলে না। বলা উচিত একটি নন্দনবর্ত। লোকটির দৈর্ঘ্য যদি হয় সাড়ে পাঁচফুট, গ্রন্থ হবে অন্তত সাড়ে চার ফুট। এমন চার-চৌকো মাহুঘ জীবনে আর কখনও সাক্ষ্য পড়ে মি। চৌকল কথাটি যদি কারও নামের আগে জুড়ে দিতে হয়, তবে এইই হচ্ছে একমাত্র উপযুক্ত পদ্য।

লোকটির পরীয়ে সের নেই, তুঁড়িও নেই। শাড় পর্দান কিছু নেই। হাড়-মাথের গড়া সেই বিয়েট পিঙ্কের হুপারে অত্যধিক বাঁচো যে ছুটি খিঁচিল

আটকানো রয়েছে, ওই ওর হাত। অস্তুত দশ-পনেরো জনের ভাত বেঁধে খাওয়া চলে এমনি মাগের একটা পোড়া তিলেল হাড়ি ওর দেহের উপর বসানো। আর সেই তিলেলের গায়ে আটকানো রয়েছে এক খ্যাখড়া নাক। নাকের দু পাশে দুই চক্ষু, বা দিগে সে আমাদের উপর নজর নিক্ষেপ করছে। চক্ষুদুটির দিকে চেয়ে চট করে ঝারিকের দোকানের চার আনা দামের পান্তুয়ার কথা মনে পড়ে গেল। সব চেয়ে বেখাপ হচ্ছে তার মাথার উপরের টুপিটি। সেই বিশাল মস্তকের ঠিক মাঝখানটতে উণ্ড করে বসানো রয়েছে—ইকি বেড়েক উচু, চারিদিকে জাফরি কাটা একটি কাপড়ের বাটি। কি উপায়ে বে সোটি ওখানে আটকে রয়েছে কে জানে।

সেই নরপর্বত অঙ্গ কিছুক্ষণ অচল রইলেন। তাঁর পান্তুয়া-প্রতিম চোখ-দুটি থেকে নীচে শোয়া খুমস্ত মাহুগুলির উপর দুটি অদৃশ ঘোলাটে জ্যোতি গড়িয়ে গড়িয়ে ঘুরতে লাগল। শেষে তিনি লচল হলেন। তারপর সেই লচল বপুখানি তরতর করে নেমে আসতে লাগল একটা পাথর থেকে আর একটা পাথরের উপর টপাটপ লাকাতে লাকাতে অক্লেশে, অনায়াসে, অবলীলাক্রমে—বাকে বলে লঘুপদবিক্ষেপে। অতবড় একটা বস্তুকে এমন হালকা ভাবে চালিয়ে নিয়ে আসতে কি প্রচণ্ড শক্তির প্রয়োজন তাই চিন্তা করে হাঁ করে চেয়ে রইলাম।

একমাত্র আরিই উঠে বসে আছি—আর সকলেই ঘুমে অচেতন। সে ত এগিয়েই আসছে। এসে পড়ল বলে আমাদের উপর। চীৎকার করে সকলকে জাগাবার জেতে হাঁ করলাম, গলা দিগে আওয়াজ বেকল না। উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করলাম—পারলাম না—হাত পা অসাড়। নিরুপায় হয়ে চোখ বুজলাম।

“সালাম আলেকুম!” একটি বহর আট্টেকের কিশোরীর গলার স্বর। চমকে চোখ চাইলাম। সামনে দাঁড়িয়ে তিনি। পাহাড়টা তাঁর আড়ালে লুকিয়েছে। তাঁর পক্ষে বতটা সজদ ততটা সামনের দিকে হেঁট হয়ে আবার বললেন, “সালাম

আলেকুম।" বিলম্বিত একটি ছোটমেরের দিষ্ট কর্তব্যনি। বহুচেষ্টার উচ্চারণ করলার
"আলেকুম সালাম।" নিজের গলার আওয়াজ নিজেই শুনেতে পেলাম না।

তিনি হাসলেন। খড়ে প্রাণ ফিরে এল।

আলাপ পরিচয় হল। নাম তাঁর শেরদিল। ছশমন খাঁ নাম হলও আমার
আপত্তি করার কিছু ছিল না। ভ্রমলোক এখানকার কুরান রক্ষক। এই
পাহাড়ের এক চমৎকার গুহার সপরিবারে বসবাস করেন। আরও উত্তরে
পাহাড়ের পিছন দিকে তাঁর ক্ষেত খামার ছাগল উট সবশুই আছে। বড় বড়
ছেলে আছে তাঁর, তারাই সে সব দেখাশুনা করে। এখানে তিনি এই খোদার
খিদমৎগারি নিয়েই শেবজীবনটা গুজরান করছেন।

কথা বলছিলেন তিনি তাঁর দুখানি বেঁটে বেঁটে হাত সজোরে আমার
নাকের সামনে নাড়তে নাড়তে। অনর্গল বলে যাচ্ছিলেন তাঁর বা খুশি সেই
ছেলেমানুষী গলার। আর আমি কোনও মতে হা না ইত্যাদি দিই আলাপটা
চালু রাখছিলাম—আমার নিজের পায়ের গোছের চেয়ে ডের সুপুই তাঁর হাতের
কজি দুখানির উপর নজর রেখে, বারবার এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখছিলাম
আর ছটফট করছিলাম গুলমহম্মদের জন্তে, এসবর সে আবার গেল কোথায়?

শেরদিল তখন আমাকে বোঝাচ্ছেন যে এখানে বিন্দুমাত্র কোনও
ভকলিকের কোনও সম্ভাবনা নেই। কাঠ জল সবশুই বজুদ। আর তাঁর বড়
খিদমৎগার উপস্থিত থাকতে কোনও ভয়েরও কারণ নেই। অনায়াসে আমরা
দিন দুই আশ্রয় করতে পারি তাঁর আশ্রয়ে।

"আল হামদোলিল্লাহ।"

পিছন ফিরে দেখি গুলমহম্মদ উপস্থিত। স্বস্তির নিশ্বাস কেলে বাঁচলাম।

গুমা ছকনে ছকনকে আঁকড়ে বসলে। বোখহর উত্তরে উত্তরের দাঁড়ি-
গোঁকের জমলে বার বার চুসনও দিলে করেকটা। হুড়বুড় করে ছকনে একদিকে
অনর্গল বা সুখে এল বলতে লাগল। সেই কথা শোরগোলে সকলের খুব জেতে

গেল, যে বার বিছানার উঠে বলে শুভিত বিশ্বয়ে সেই আপটাকাপটি বেধতে লাগল হাঁ করে।

অবশেষে ওদের শরীরের আর মনের উৎসাহ-এটা আহলাদটা একটু কিম্বিয়ে এলে পর ওরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হল। তখন গুলমহম্মদ যত ভূমিকা সহ আরম্ভ করলে তাঁর পরিচয় দিতে। নাম তাঁর শেরদিলই বটে। কারণ দিলটা এঁর বিলকুল শেরের মতই। তাঁর নামে এ মুন্সুকের সকলেরই দিল কেঁপে ওঠে। বহু বহু বেয়াতুফ বেয়াদব এঁর হাতে শায়িতা হয়েছে। আবার এঁর দয়ারও অন্ত নেই। লোকের বিপদে-আপদে নিজের বুক ইনি পেতে দেন, তখন আর শত্রু-মিত্র বাছবিচার নেই। এঁকে যে এখানে এখন পাওয়া বাবে এ হচ্ছে আশাতীত ব্যাপার। চাকর-বাকর দিয়েই ইনি এই কুয়া বন্ধার কার্খটি চালিয়ে নেন, এবার যে স্বয়ং উপস্থিত আছেন এ একমাত্র জোর নসিবের বল বলতে হবে।

আমরাও একবাক্যে সে কথা বলতে কহুর করলাম না। বৎস রূপলাল তার পণ্ডিতি পরিত্যাগ করে শেরদিলের পিছন পিছন ঘুরতে লাগল। তিনি ঘুরে ঘুরে তখির-তদারক করতে লাগলেন। দলে ছু-ছুটো আওরাত আছে দেখে গুলমহম্মদকে অহুরোধ করলেন এখনই তাঁর গুহার উঠে গিয়ে তাঁর বিবিকে সংবাদটা জানাতে। গুলমহম্মদ তৎক্ষণাৎ উঠে গেল। তারপর তিনি আমাদের সকলকে উঠিয়ে নিরে গেলেন আরও খানিকটা উপরে একটা পদ্রিকার-পরিচ্ছন্ন সমতল আরগার। সেই স্থানটির চারিদিকে খাড়া পাহাড় উঠে গেছে। স্থানটি ছায়াশীতল।

একটি সরু গলির মত পথ বেয়ে বেশ অনেকটা উপরে উঠে তারপর কেন খানিকটা নীচে নেমে আমরা সেখানে পৌঁছলাম। পৌঁছে চারিদিক চেয়ে দেখতে দেখতে হঠাৎ ধুরাল হল—একি—এলাহ আমরা কোন্ পথ দিয়ে ?

চারিদিকে খাড়া পাহাড়, সব একরকম দেখতে। কোন্ পথ দিয়ে যে এসে পৌঁছলাম তার আর কোনও চিহ্ন নেই। যে কাকটি দিয়ে নেমে এলাম এইমাত্র, সেটি বেমানুষ লোপ পেয়ে গেল।

সকলেই দাঁড়িয়ে পরস্পর মুখ চাওরা-চাওনি করছি, এ আবার কোনও ফাদে পড়লাম না ত রে বাবা !

আমাদের সকলের আগে শেরদিল মহাশয় এখানকার স্থল-স্থবিধাগুলির ফিরিস্তি দিতে দিতে এগিয়ে চলেছেন। এখানে দিনভোর বোদ লাগবে না, উড়ন্ত বালির জলন্ত কাপট্যও ভয় নেই, জল একেবারে হাতের কাছে। কাজেই তাঁর এই স্থানটিকে বেহেস্ত বললে বাড়িয়ে বলা হয় না।

বাড়িয়ে কমিয়ে বলাবলির কথা তখন আমাদের মাথার উঠেছে। মশরীবে বেহেস্তে ঢুকে পড়ে তখন মাথার মধ্যে দুমদাম হাতুড়ির দ্বা পড়ছে, কি করে কোন্ ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে পড়ে এই বেহেস্ত থেকে উদ্ধার পাওয়া যায় !

কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে পিছন ফিরে আমাদের সকলকে তরু হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে শেরদিল হাঁ হয়ে গেলেন। শেষ সকলের মুখের উপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে হা হা করে হেসে উঠলেন তাঁর সেই ছেলেমানুষী গলায়। তারপর ফিরে এলেন আমাদের কাছে। কিন্তু থামলেন না আমাদের সামনে। আমাদের পাশ কাটিয়ে তরতর করে উঠে গেলেন পাহাড়ের পা বেয়ে। আমরা দলবদ্ধ সকলে ফিরে দাঁড়িয়ে চেয়ে দেখছি তাঁর সেই বহুদল পর্বতারোহণ। উঠতে উঠতে টুপ করে অদৃশ্য হয়ে গেল তাঁর সেই বপুখানি। কেবল কানে বাজতে লাগল তাঁর হাসির প্রতিধ্বনি।

একেবারে চমুহুঁর।

কয়েকটি মুহূর্ত গড়িয়ে গেল, সকলের দৃষ্টি পাহাড়ের গায়েব সেই স্থানটির উপর যেখানে শেরদিল মিলিয়ে গেলেন। তারপর দৌড়ল রূপলাল সেই পথে, যে পথে এইমাত্র শেরদিল উঠে গেছেন। উঠতে উঠতে ঠিক সেই স্থানটিতে পৌঁছে সেও কস করে আমাদের এতজোড়া চকুর সামনে একেবারে উবে গেল। জুন ওখানটার পৌঁছনো মাত্র পাহাড়টা টপ করে গিলে ফেললে ভাবে।

তাজব কাণ্ড।

রুদ্ধ নিশ্বাসে সকলে সেইদিকেই চেয়ে আছি। চোখের পলক পড়ছে না, বুকের ধুক্ ধুক্ শব্দ নিজের কানে শোনা যাচ্ছে।

হঠাৎ আবার সেই অপূর্ব মধুর হাসি, হা হা হা হা। পরমুহূর্তে শেরদিল রূপলালকে ধরে নিয়ে ঠিক সেইখানটি থেকে বেরিয়ে নীচে নেমে আসতে লাগলেন।

শেষে যখন বোঝা গেল যে ঐটেই পথ, ঐপথেই আমরা নেমে এসেছি—সন্ধ্যায় এতটুকু হয়ে যাওয়া ভিন্ন আর উপায় কি।

পণ্ডিত রূপলাল কিন্তু অপ্রতিভ হবার পাত্র নয়। নেমে এসেই দলপতি-অনোচিত এক হাঁকার দিলে—“চলে এস জন্মদি আমার সঙ্গে কুঁজো নিয়ে, যার যার জলের দরকার।” যেন কুয়োটা কোথায় এইটুকু জানবার জন্তেই সে ছুটে গিয়েছিল শেরদিলের পিছু পিছু।

যাক। আবার আরম্ভ হল ঘর-গৃহস্থালি সাজানো সামনের সারাদিনটা আর অর্ধেক রাত্রির জন্তে।

হানটি প্রায় গোলাকার আর বেশ চাঁচাছোলা। অন্তত পাঁচশো লোক আরামে শুয়ে থাকতে পারে। মনে হল যেন মস্ত একটা কুয়োর তলার শুকনো তকতকে বালির উপর আমরা নেমে পড়েছি।

শেরদিল সকলকে নির্দেশ দিলেন পাহাড়ের কোল-ঘেঁষে কয়ল পাততে ; আমাকে নিয়ে চললেন একেবারে উত্তর প্রান্তে।

সেখানে পড়ে ছিল একখানা হাত পাঁচ-ছয় লম্বা আর হাত তিনেক চওড়া কালো পাথর, উপরটা একেবারে সমান না হলেও শোওয়া বসা চলতে পারে। তার উপরই পড়ল আমার কয়ল, আর সেই কয়লের উপর আমাকে বসিয়ে শেরদিল তৃপ্তির সঙ্গে বললেন, “ইয়াঃ!” বলে কোমরের দুপাশে দুহাত রেখে অল্পক্ষণ চেয়ে রইলেন আমার দিকে। তারপর চলে গেলেন অন্য সকলের সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা করতে।

সেই হাত-দেড়েক উচু পাখা-সিংহাসনের উপর চেপে বসে চক্ষু মুদিত করে আমিও মনে মনে একবার না বলে পারলাম না, “ইয়াঃ!” এ হেন স্থানে এ হেন আসনে বসে মন আর মেজাজ দুইই বাগ মানতে চাইল না, উড়তে লাগল খেয়ালের আকাশে।

তৎক্ষণাৎ দৃশ্য-পরিবর্তন হল।

সেই দৃশ্যে আমি স্বয়ং হলাম এক হুঁদা পাহাড়ী মহাসদার আর আমার সঙ্গী-সাথীরা আমার উপযুক্ত সাগরেদ। বড় রকমের একটা সুটপাট হুসম্পন্ন করে আমরা সবেমাত্র আড্ডায় ফিরেছি। দলপতির সম্মানিত উচ্চাসনটি লঞ্চ করে বসে চারিদিকে সাগরেদদের কার্যকলাপ অবলোকন করছি। আমার সম্মান বাঁচিয়ে ওরা দূরে দূরে গোল হয়ে বসেছে। সামনের ফাঁকা জায়গায় এখনই নাচ আরম্ভ হবে।

আরম্ভ হল নৃত্য।

বন বন করে ঘুরতে ঘুরতে কোথা থেকে উদয় হল একটি নর্তকী। প্রকাণ্ড ঘেঘের ঘাঘরা তার পরনে। ঘাঘরার নীচের দিকে আধহাত সোনালী জরির কাজ। গায়ে আঁটা লাল রঙের কাঁচুলি। বুকের নীচ থেকে নাভি পর্যন্ত অনাবৃত। কোমর এত সরু যে হাতের মুঠোর ধরা যায়।

প্রচণ্ড বেগে সে ঘুরছে। ঘুরছে আর তার ঘাঘরার জরির কারুকার্য অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ছে, তাতে তার হাঁটু পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। অতি দ্রুত তালে বাজছে বাজনা, তার সঙ্গে মিশেছে তার পায়ের ঘুড়ুরের শব্দ। সমস্ত মিলে মিশে একসঙ্গে এমন এক অদ্ভুত ধ্বনির তরঙ্গ তুলেছে যে দর্শকদের শরীরের রক্তের মধ্যে প্রবল আলোড়ন উঠেছে। সকলের চোখে-মুখে উত্তেজনার ছাপ ফুটে উঠেছে। মেয়েটি নৃত্যের তালে তালে ঘুরতে ঘুরতে আমার দিকেই এগিয়ে আসতে লাগল। ঠিক আমার সামনেই বারকতক ঘুরপাক খেয়ে সে থামল আর সেই মুহূর্তেই তেহাই পড়ল ঢোলে। একেবারে সব স্তব্ধ।...

চোখ বেলে চাইলাম। সামনে ঝাড়িয়ে স-কুন্তী ভৈরবী। ছুজনের একজনও বাঘরা পড়ে না, সাদা-সাপটা শাড়ি মাত্র সার।

মেজাজটা খিঁচড়ে গেল। অমন একটা মুখরোচক ব্যাপারের শেষটুকু আর দেখা হল না। অদৃষ্টটাই এমনি বটে।

ভৈরবীর সেই এক প্রশ্ন—‘কোথায় পাতব কখন?’ এবার মুখে এল, ‘জাহান্নামে।’ ঢোক গিলে কেমনাম, কেলে আসন ছেড়ে নেমে এলাম। হাত নিশপিশ করছিল একখানা চাবুকের জন্তে, এ হেন অবস্থায় এ হেন বে-আদবির দরুন দস্যুসর্দার হিসেবে চাবুক চালানোই আমার একমাত্র কর্তব্য। কিন্তু চাবুক কোথায়? ঠিক সময় ঠিক জায়গাটিতে যেটির প্রয়োজন সেটি ত থাকবে না কিছুতেই। কি করি, ওদের দিকে রক্তচক্ষু হেনে একটা লোটা হাতে নিয়ে লোজা চলে গেলাম সেই দিকে যেখান দিয়ে একটু আগে শেরদিল আর রূপলাল নেমে এসেছে।

মন মেজাজ ঠাণ্ডা করে আবার যখন ফিরে এলাম ঘণ্টা খানেক পরে, তখন আরও ছুজন লোক বেড়েছে দলে। গুলশহম্মদ ফিরে এসেছে শেরদিল-গৃাহনী আর তাঁর চাকরানীকে সঙ্গে নিয়ে। আমার আসনের অনেকটা দূরে ডান দিকে পাহাড়ের কোল-ঘেঁষে গুঁরা সংসার পাতছেন। বিলি-ব্যবস্থা করেছেন শেরের পত্নী তাঁর চাকরানীর উপর হুকুম চালিয়ে। বাঁ দিকে বসেছে বড় কলকের বৈঠক, শেরদিলকে মাকখানে নিয়ে। ওখানটার ধোঁয়ার ধোঁয়াকার।

নিজের উচ্চাসনের উপর শুছিরে বসলাম এসে।

এবার একটু চা হলে হত। গেল কোথায় স্রীমান স্রুথলাল?

বাঁ হাতে নাকে আঁচল চাপা দিয়ে ডান হাতে একটা কালো তাঁড় নিয়ে কুন্তী উপস্থিত। তাঁড়টা আমার সামনে নামিয়ে উপরকার ঢাকাটা দিলে খুলে।

ওরে বাপু, একেবারে দর আটকে আসবার যোগাড়! “কি ওটা, সরাও সরাও।”

তাড়াতাড়ি ঢাকাটা ভাঁড়ের মুখে ঢাণা দিয়ে কিছু দূরে ওটাকে সরিয়ে রাখলে কুস্তী, তারপর নাকের উপর থেকে আঁচল সরিয়ে হেসেই খুন।

জিজ্ঞাসা করলাম, “ওই ভাঁড়টার কি? মারা পড়ছিলাম যে এখনই!”

হাসি সামলে কুস্তী বললে, “বকরীর ঘি।”

বললাম, “বকরীর ঘি এখানে এল কোথেকে? খুলনার কবরেক মশায় ছাগলাত ঘৃত বানাতে জানেন, সে পদার্থ এত দূরে পৌঁছল কি করে?”

কুস্তী বললে, “আমাদের জন্তে ভেট এনেছেন শেরের গৃহিণী। ও খেলে শরীরের জ্বালা জুড়াবে, তাগদ্ বাড়াবে, মেজাজ শরীফ থাকবে, পেটের গোলমাল...”

বললাম, “থাম থাম, আর বলতে হবে না। আমি সমস্ত জানি—বাত সারবে, গোদ পালাবে, গলগণ্ড ফেসে গিয়ে চুপসে যাবে, টেকো মাথায় চুল গজাবে, নড়নড়ে দাঁত শক্ত হয়ে খাসির হাড় চিবাবে—এ সমস্ত আমার মুখস্ত আছে, কিন্তু ওই ছাগলাত ঘৃত এদেশের এরাও বানাতে জানে তা ত জানতাম না।”

কুস্তীর হাসি ততক্ষণে উবে গেছে, চোখ দুটো বড় বড় করে জিজ্ঞাসা করলে, “কেন, বকরীর ঘি বানানো শক্ত কি? গোন্ধের হুখ থেকে যে ভাবে ঘি হয় এ ঘিও ছাগলের হুখ থেকে সেই ভাবেই বানিয়েছে।”

এবার আমার চক্ষু ছানাবড়া হবার পালা। এতকাল শুনে আসছি—ছাগলে কি না খায়, পাগলে কি না বলে। আজ স্বচক্ষে দেখবার সৌভাগ্য হল যে ‘কি না খেয়ে’ ছাগলে যে হুখ দেয়—তা থেকে ঘৃত বানানো যায়।

কিন্তু ঘৃত বস্তুটি—শুনেছি দেবভোগ্য।

হায়, কে বলে দেবে সে দেবতার নামটি কি—যার ভোগে লাগবে এই ঘৃত, যার প্রতি বিন্দুটিই এতদূর মারাত্মক রকমের ঝাঁটি যে গন্ধ শুঁকেই আমার মত সামান্ত জীবের প্রাণ গিয়েছিল আর কি।

কুস্তীকে বললাম—“এখনই ফেরৎ দাও ওই সাংঘাতিক জিনিস, নরক মলমুহুর্ত সকলের একটা বিপদ ঘটবে।”

হু আঙুল চওড়া ছোট কপালটিকে বতদূর সম্ভব কুঁচকে ভয়ানক চিন্তায় পড়ে গেল কুস্তী।

“তা কি করে দেওয়া যায়, তাহলে বে ওঁদের অপমান করা হবে!”

অপমান করা হবে? আমিও তুরু কুঁচকে কুস্তীর মুখের দিকে চেয়ে বইলাম।

আর যা কিছুই করা যাক, এখানে বসে শেরদিল যাতে অপমান বোধ করবেন এমন কিছু করার কথা মনেও আনা যায় না।

হুধের মত সাদা আস্ত একখান কাপড় দিয়ে তৈরী পাজামা পরিহিতা—শ্রীমতী শেরদিলকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে এলেন ভৈরবী। হাত দশেক দূর থেকেই শ্রীমতী হু তিনবার নত হয়ে আপন কপালে হাত ঠেকালেন।

উঠে দাঁড়াতে হল।

একমাত্র দুটি চোখ আর সাদা তুরু জোড়া ছাড়া, মাথা মুখ নাক গলা বুক একেবারে কোমর পর্যন্ত তাঁর ঢাকা একখানি মিশমিশে কালো দিকের চাদর দিয়ে। কপালে ছোঁয়াবার সময় একখানি হাতের বেটুকু দেখা গেল তাতে বোঝা গেল যে অস্ত্রত বাটের কোঠা তাঁর পেরিয়ে গেছে। তা না হলে চামড়া অত কৌচকায় না।

তাঁকে এখানে আসতে দেখে স্বামী শেরদিলও কলকের বৈঠক ছেড়ে উঠে এলেন। এসে আদবকায়দা মাক্কিক পরিচয় করিয়ে দিলেন।

তখন সেই কালো কাপড়ের ভিতর থেকে কি কতকগুলো বাক্য-স্রোত গড়গড় করে বেরিয়ে আসতে লাগল।

শেরদিল তাঁর তরঙ্গমা করে বুঝিয়ে দিলেন যে আমাদের আগমনে তাঁর স্ত্রী কি খুশীই হয়েছেন! ‘নানী কি হজ’ যাত্রায় অতদূর থেকে আগরং এসেছেন। বিশেষত জীবনে ত কখনও তিনি কলকাতার আগরং দেখেন নি। এ তাঁর একান্ত নসিবের জোর যে কলকাতার আগরং দেখতে গেলেন।

প্রমাদ গনলাম।

খাল-বিল-হোগলা-কুমীর-বাঘের দেশ হচ্ছে বরিশালের দক্ষিণ সীমা। সে দেশকে যমের দক্ষিণ দরজা বললেও বাড়িয়ে বলা হয় না। সেখান থেকে এসেছেন ভৈরবী। সেখানকার ঠেঁকাড়ে ভাষা, চালচলন—এককথায় সেখানকার কৃষ্টি আর সংস্কৃতির তিনি জলজ্যাস্ত প্রতিনিধি। তাঁকে দেখে যদি এই মরুবাসিনীর কলকাতার আওরৎ দর্শনের সাধ মেটে, তবে সেটা যে একেবারে হরিপালের কয়মটা চিবিয়ে কাশ্মীরী আঙুর খাওয়ার শখ মেটানো হবে!

প্রবল প্রতিবাদ করে আদৎ কলকাতা-বাসিনীদের রূপগুণ পোশাক-পরিচ্ছদ চালচলন ইত্যাদি সম্বন্ধে একটি স্ফুটন্ত ভাষণ দেবার জন্তে গলা চুলবুল করতে লাগল। কোনও ফল হবে কি না ভেবে না পেয়ে ঢৌক গিলে ফেলে দাঁত বার করে নীরব হান্স করে কৃতার্থতা জানালাম।

তারপরই উঠে পড়ল সেই ছাগলাদুগ্ধত-প্রসঙ্গ।

শেরদিল-পত্নী তাঁর স্বামী মারফৎ জানালেন যে ঐ সামান্য জিনিসটুকু যদি আমরা গ্রহণ করি তবে তিনি ধন্ত হবেন। ওই মহামূল্য দ্রব্য তাঁর নিজের হাতে বানানো একেবারে সর্বগুণসম্পন্ন সর্বরোগহর বস্তু। অতএব—

সভয়ে কিছু দূরে বসানো ভাঁড়টির দিকে একবার চাইলাম। তারপর মাথা চুলকে উভয়কে আসন গ্রহণ করতে অনুরোধ করলাম।

ভৈরবীর মুখের দিকে চেয়ে দেখি তিনি ঘাড় হেঁট করে নিজের পায়ের আঙুলের নখের শোভা দর্শনে একান্ত ব্যস্ত।

কুস্তী তার আঁচলের খুঁটটা নিজের মুখে পুরছে, তবু তার নাক মুখ চোখ দিয়ে হাসি উপচে পড়তে চায়।

শেষে মরীয়া হয়ে শুরু করলাম, “আপনার মত বন্ধু পথে পাওয়া যে কতবড় সৌভাগ্যের কথা এ আর মুখে কি করে বলি। আর ঐ ঘি যে কতবড় অমূল্য-তুল্য জিনিস সে কথা কি আর আমরা জানি না! কিন্তু কি করব, আমাদের যিনি শুরু, মানে ওস্তাদ, তাঁর আদেশ মত ঐ সমস্ত ভাল ভাল জিনিস আমরা

ছুঁতেও পারি না। সবই ত্যাগ করতে হয়েছে কি না—এই বাক্যে আপনারা ‘কোরবান’ বলেন—তাই আর কি। এখন কি যে করি—”

বলে উভয়ের চোখের দিকে চাইলাম।

নাঃ, দপ্ করে জলে ওঠে নি চোখ আমার কথা শুনে। সেদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে কুস্তীর দিকে চেয়ে দেখি হাসির তোড় সামলাতে গিয়ে সে কাঁপছে।

অসুদি চা বানাবার হুকুম দিয়ে তাকে তাড়ালাম।

তখন জুত করে বসে ওঁরা কলকাতার গল্প শুনতে বাসনা প্রকাশ করলেন।

তখান্ড। শুধু কলকাতার কেন, খাস লগুন শহরের গল্পও করতে এখন আমার আপত্তি নেই। ছাগলাস্তের হাত থেকে নিষ্কৃতি মিলেছে, একি কম কথা।

ভৈরবীকে বললাম, “এঁদেরও ভাত চড়াওগে যাও। ঘি, ছোট এলাচ আর কিসমিস পেস্তা বাদ্যার ছাড়তে যেন ভুল না হয়। প্রত্যেক দিন দু’বেলা কলকাতার লোকে কি খেয়ে বেঁচে আছে তা এঁরা মালুম করে যান। একেবারে কলকাতাটা চাখা হয়ে থাক।”

গভীর মুখে ভৈরবী উঠে গেলেন।

কলকাতাটা কেমন পদার্থ তার বর্ণনা শুরু করলাম।

ঘণ্টা দু’এক পরে তখনও আমি বলে যাচ্ছি—“কলকাতার লোক মোটে হাঁটে না, হস হস করে কলের গাড়ি চেপে যেদিকে ইচ্ছে চলে যায়। সবসে তাক্সি ব্যাপার হচ্ছে, কলকাতার যে সমস্ত আসমান-হোঁরা বাড়ি আছে সেই সমস্ত বাড়িতে দিনরাত হড় হড় করে জল পড়ছে ত পড়ছেই এমনই সব আত্মব কল লাগানো আছে। কলকাতার কখনও আঁধার হয় না, কলের চিরাগ জলছে ত জলছেই। তারপর আরও আছে, কিখে পেলেই কলকাতার লোকের আর কোনও কথা নেই, তখুনি ছুটে গিয়ে একটা দোকান থেকে লাড্ডু যেঠাই কিনে পেট-ভরে খেয়ে তবে নিশ্চিন্ত। তার সঙ্গে চালার আঙুর বেদানা আপেল বড় খুশী।”

হঠাৎ শেরদিল জিজ্ঞাসা করে বসলেন, “কলকাতার লোকে বিবাহ করে ক’টি করে?”

প্রশ্নের মত প্রশ্ন। গুটিকতক করে বিবাহ করেন বললে কলকাতার লোকের ইচ্ছতটা বাড়বে, না একটি স্বাত্র বিয়ে করেন বললে এঁরা খুশী হবেন? চিন্তায় পড়ে গেলাম।

এমন সময় শ্রীমান সুখলাল এসে সংবাদ দিলে—খানা প্রস্তুত।

আর কথা-বাড়ানো কাজের কথা নয়। আপাতত কলকাতার লোকের মান-ইচ্ছতটা ত বাঁচুক। হৈ হৈ করে উঠে পড়লাম ওঁদের নিয়ে।

খাওয়া-দাওয়ার পর ওঁরা বিদায় নিলেন। রূপলাল আর গুলমহম্মদ ধরে বসল বে, সন্ধ্যায় গানের আসর বসবে, শেরদিল বেন দয়া করে বাজনা সঙ্গে আনেন। কলকাতার খানা হজম করবার অন্তে শেরদিল পত্নীসহ চলে গেলেন নিজের গৃহায়।

আমরাও গড়িয়ে নেবার আশায় তোড়জোড় শুরু করলাম। স্থানটি সত্যিই ভেতে উঠল না। অনেক উঁচু দিয়ে সূর্যদেব নিজের বাধাধরা পথে ধীরে ধীরে এগিয়ে চললেন পশ্চিম দিকে। গর্তের মধ্যে পড়ে আছি আমরা, আজ আমাদের পাত্তা পাবেন কি করে তিনি। কি আকসৌস।

একটি লম্বা ঘুম দেওয়া গেল—নিরেট নিশ্ছিন্ত নিখুঁত নিদ্রা—যতক্ষণ পর্যন্ত না শেরদিল ফিরে এলেন ঢোল নিয়ে। তাঁর স্ত্রী এলেন আরও একটু পরে—ঠিক সন্ধ্যার পূর্বেই।

গোটা চারেক আলো জ্বলে কেলতে হল। তাতে কি হবে? অন্ধকারটা বেন আরও দানা বেঁধে উঠল।

বে যার আসন কখন টেনে নিয়ে এল আমার সামনে। দিনের বেলা ছড়িয়ে থাকতে কারও আপত্তি নেই, কিন্তু সন্ধ্যার পর সকলের কাছাকাছি হোওয়া-ছুঁটির মধ্যে থাকা চাই। জয়াশঙ্করজী এইটুকু করে

গেছেন। তাঁর বিদায় আমাদের এক-প্রাণ এক-মন এক-আত্মা করে দিয়ে গেছে।

পোপটলাল ভাই একবার লোক গুনে নিলেন। রূপলাল দেখে নিলে সকলের কুঁজো ভরতি হয়েছে কি না। মালপত্র গোছগাছ করে বেঁধেছেদে তৈরী রাখলে গুলমহম্মদ। রাত্রি শেষ গ্রহরে আবার যাত্রা আরম্ভ। এখন উর্বশীদের নিয়ে দিলমহম্মদ ফিরলেই হয়।

যে পাথরখানায় চড়ে আমি বসে আছি তার ডানাদিকে ভৈরবী আর কুস্তীর কবল পড়ল। রূপলাল বসল থিরুমলকে নিয়ে আমার বাঁ ধারে। পোপটলাল গমস্ত দলবল নিয়ে সামনে বসলেন। শ্রীমান সুখলাল থাকবে আমার সঙ্গে।

মাঝখানটা ফাঁকা রেখে সকলের বিছানা বিছানো হল। মাঝখানে গানের আসর বসবে, গান ভাঙলে যে যার নিজের কবলে শুয়ে পড়বে। রাত্রির অন্তে নিশ্চিন্ত হয়ে বসা গেল একেবারে।

থিরুমলের দিকে মাঝে মাঝে চেয়ে দেখছি। সে হাসছে, কথা বলছে, কলকে টানছে, কিংবা রূপলালের গলা জড়িয়ে চলাফেরা করছে। কে বলবে কিছু হয়েছে তার, কোনও গুণগোল নেই। তবে লক্ষ্য করলে বেশ বোঝা যায়—একবার তুলক্রমেও সে কুস্তীর দিকে চেয়ে দেখছে না—যেন কুস্তীকে সে চেনেই না। রূপলালের একান্ত বাধ্য হয়ে আছে সে। দেখে-শুনে একরকম নিশ্চিন্ত হয়ে আছি।

দিলমহম্মদ ফিরল। উর্বশীর গলার ঘণ্টার আওয়াজ ভেসে এল দূর থেকে। ছুটে চলে গেল গুলমহম্মদ বাইরে। উপর দিকে মুখ তুলে চেয়ে দেখলাম একখানা আশমানী রঙের কাপড়ে চমৎকার জলজলে তারার ফুল ফুটে উঠেছে।

দিলমহম্মদ নেমে এল অন্ধকারের ভিতর থেকে, পাহাড়ের গা বেয়ে। দুদিন পরে উটেদের পেটে কিছু পড়েছে, সেজন্তে দিলমহম্মদের মুখে তৃষ্ণার হাসি।

হাতের কাছে তার ভাত ভাল কুটি চাটনি গোছানো ছিল। কুস্তী উঠে গিয়ে এগিয়ে দিলে।

শেরদিল উঠে গেলেন গুলমহম্মদকে নিয়ে আসতে। উটেদের ছেড়ে বুড়ো যদি আসে আর উট যদি কোনও দিকে পাড়ি জমায়, তবেই চিত্তির। এখানে ত ওদের নিয়ে আসা অসম্ভব। যে পথে আমরা আগা-বাওয়া করছি উট ওপথে আসবে কি করে!

কি করে গুলমহম্মদ! ভাবনায় পড়ে গেলাম।

ঠাণ্ডা শুনি পাহাড়ের ভিতর দিকে ঘণ্টার শব্দ। তার সঙ্গে গুলমহম্মদের গলা—“হৈ হৈ হট্ট হট্ট হৈ।” সেই সঙ্ক পথ বেয়ে উর্বশী আর তার মাকে সাবধানে নামিয়ে আনা হচ্ছে। পিঠে বোঝা না থাকায় ছাগলের মত অক্লেশে ওরা সেই গড়ানে পথে নেমে এল।

এসে বসল আমাদের সামনে লম্বা গলা উঁচু করে। গানের উপযুক্ত সমঝদার। ভৈরবী গেলেন বাদাম খেজুর নিয়ে উর্বশীকে আদর করতে।

বাইরে পড়ে রইল আটার বস্তাগুলো। তা থাকুক, কে নেবে ওখান থেকে শেরদিল জ্যান্ত থাকতে।

গুলমহম্মদ এসে বসে ঢোল কোলে তুলে নিলে। দিলমহম্মদ বসল তার ডান পাশে, আর ওদের মুখোমুখি বসলেন শেরদিল। তিনি গাইবেন, ঢোল বাজাবে গুলমহম্মদ আর আখর দেবে তার ছেলে।

টাটি পড়ল ঢোলে। গুড় গুড় গুড় গুড় গুড়ুম।

ঘুরতে লাগল সেই শব্দ হাজার লক্ষগুণ বাড়তে বাড়তে পাহাড়ের রক্কে রক্কে। ঘুরতে ঘুরতে উঠতে লাগল উপর দিকে, যেন শব্দময় ধূপের ধোঁয়া। নীচে থেকে উপর দিকে বার বার দেখতে লাগলাম চেয়ে চেয়ে, স্পষ্ট মনে হল সেই গুড় গুড় গুড়ুম ধ্বনি জ্যান্ত হয়ে উঠেছে, চোখে বেশ দেখা যাচ্ছে।

ধামল ঢোল, আরম্ভ হল গান। হুরটা ঠিক কি ছিল আজ সঠিক বলতে

পারব না। হয় কাওয়ালী নয় গজল। ভাষা জানি না, কিন্তু এটুকু বুঝতে বাকি রইল না যে সৃষ্টিকর্তার উদ্দেশ্যেই এই গানের ভাষা সুর সমস্ত নিবেদিত। বখন ঢোল থামে, তখন টেনে টেনে করণ বিচিত্র সুরে শেরদিল কয়েকপদ বলে যান। যা বলেন তার মধ্যে সুরে আর ভাষায় যা ছুটে ওঠে সে হচ্ছে নির্জলা আকুল আকৃতি। ভাষা না জানা থাকলেও সেই সুর মর্মস্থলে আঘাত তেনে সবটুকু বেশ পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দেয়। তারপর দ্রুত ভালো ঢোল বেজে ওঠে, শেরদিলের সঙ্গে গলা-মিলিয়ে গানের দুপদ গেয়ে ওঠে দিলমহম্মদ। তখন প্রোতারা কেউ স্থির থাকতে পারে না। হাতে হাতে চাপড় মেরে তাল দেয়। ঘাড় নড়ে, দেহ তুলতে থাকে সকলের।

চলল গান একটার পর একটা। গাওয়ারও যেমন শেষ হয় না, শোনারও তেমন শেষ হয় না। যে গান শুনতে প্রাণ্তি জন্মায় না তেমন জাতের গান শোনা কচিং কদাচিং ভাগ্যে ঘটে।

মনে পড়ে হিংলাজের পথে সেই পাহাড়ের গহ্বরে গোটা-চারেক টিমটিমে আলোর আবছা অঙ্ককারে একতালে একদল লোক মন্ত্রমুগ্ধের মত তুলছে আর হাতে তালি দিচ্ছে। এখনও গভীর রাতে যুম ভেঙে গেলে প্রথমে মাথার মধ্যে তারপর বুকের মধ্যে গুরু গুরু বাজতে থাকে সেই ঢোল। বখন কোথাও গান শুনতে বসি তখন হঠাৎ অন্তমনস্ক হয়ে শুনতে থাকি সেই ন-দশ বছরের মেয়েলী গলার অপূর্ব সুর। যেন মনে হয়, আবার যদি কোনও রাতে সেই রকমের পরিবেশে কোথাও আরম্ভ হয় সেই সুরের গজল বা কাওয়ালী, তবে হাতে হাতে চাপড় মেরে ঠিক জায়গায় তাল দিয়ে মাথা নাড়তে পারি।

জাহাজের খোলের মধ্যে কাবুলীর গান শুনে শবৎচক্রেব্রী ক্রীকাস্ত যা বলেছিলেন সেটুকু হয়ত মিথ্যা নয়। জাহাজের খোলে, ড্রইংরুমে, পাড়ার জলসায় বাধা স্টেজে কাবুলীওয়ালার গান মানাবেই বা কেন, জমবেই বা কেন। বৈষ্ণবের আখড়ার অঙ্গনে তুলসীগাছের পাশটিতে থেমটা জমে কি না

জানি না, তবে অন্ত হৃদয়ের অন্ত বস্তু এমন জবাই কমে যে, খোঁতাকেও জমিয়ে নিয়ে গলিয়ে ছাড়ে এ আমি অনেকবার নিজ চক্ষে দেখেছি। তেমনি কাবুলীর গানের মর্ম বুঝতে হলে, কাবুলীর দেশেই যাওয়া দরকার, যেখানে তার গান উন্মুক্ত আকাশের তলায় কোথাও বাধা পায় না। পায় না বলেই বোধ হয় খোঁতাকে স্কন্ধ সঙ্গে নিয়ে উধাও হয়ে যায় এমন রাজ্যে যেখানে আর জাতি-বিচার থাকে না, যেখানে কাবুলীর গানের সঙ্গে হালিসহরের রামপ্রসাদীর তফাৎ করা অসম্ভব। চার দেওয়ালের গভীর মধ্যে স্বাধীন প্রাণের গানের প্রাণ থাকে না যে।

গান বন্ধন থামল তখন যে ঠিক কখন এ আমরা জানতেই পারলাম না। শেষ রাতে আমাদের বিদায় দিতে আসবেন জানিয়ে পেরদিল সত্ৰীক উঠে চলে গেলেন। উট দুটি নিয়ে গুলমহম্মদরাও গিতাপুত্রে বাইরে চলে গেল যেখানে আটার বস্তা পড়ে আছে।

আমরা কেউই উঠলাম না। যে যেখানে বসে ছিল সেখানেই শুয়ে পড়ল। গান তখনও চলতে লাগল আমাদের মনের কানার কানার পূর্ণ হয়ে।

সেই রাতে এমন এক কাণ্ড ঘটে বসল যার সঙ্গে তুলনা দিতে গেলে অনেকদিন আগেকার এক সন্ধ্যার একটি ঘটনা বড় বেশি করে মনে পড়ে। সে মাসটাও বোধ হয় আবাত বা শ্রাবণই ছিল। সন্ধ্যার সময় আলো জ্বালার সঙ্গে সঙ্গে বথানিয়মে আমরা খুড়তুতো জেঠতুতো পাঁচ ভাই আলোটার চার ধার ঘিরে বই খুলে বসেছি। বাইরে কুষ্টি পড়ছে। সেই সময় একটি চামচিকে জ্বালা দিয়ে ঘরে ঢুকল। ঢুকে চুপচাপ এক কোণে বসে থাকলেই পারত কুষ্টিটা না থামা পর্যন্ত। তা নয়। একটা হাল্কা বাধাবার বদ্ মতলব রয়েছে কিনা মাঝার মধ্যে। চুপ করে থাকতে পারবে কেন। চারিদিকের দেওয়ালের গারে ঠোকর খেয়ে বন বন করে উড়তে লাগল। সেদিকে প্রথম কার নজর পড়েছিল বলতে পারব না। বারই সে সোঁতাগ্য হয়ে থাকুক,

এটুকু বেশ মনে পড়ছে যে দিগ্‌বিদিক-জ্ঞানশূন্য হয়ে আমরা পাঁচজনেই এক-যোগে চূড়ান্ত বিক্রমে সেই চামচিকের পিছনে আক্রমণ চালিয়েছিলাম। সেই আক্রমণে হাতের কাছে যা পাওয়া যাচ্ছিল সমস্তই নির্বিচারে ব্যবহার করা হচ্ছিল। বই খাতা টেনিসবল হকি-টিক, মায় জুতো পর্যন্ত, সব কিছুই সেই মহা আক্রমণে কাজে লেগে গেল।

নিমেষের মধ্যে হলুদুল কাণ্ড ঘটে গেল পড়বার ঘরে। দেওয়ালের গায়ে যে কথানা ছবি টাঙানো ছিল তার একখানাও আস্ত রইল না। দোয়াত ভাঙল, বই ছিঁড়ল, বইএর আলমারির কাঁচ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল। ছোট কাকার সন্ত বিয়েতে পাওয়া পাম্পাস জোড়ার এ হেন অবস্থা হল যে, তা দেখলে তাঁর অতিবড় শত্রুর চোখেও জল আসত। শেষ পর্যন্ত আলোটা গেল উন্টে; শুধু উন্টে গিয়েই কাস্ত হল না, তক্তপোষের উপর পাতা চাদর শতরঞ্জি সমস্ত ভিজিয়ে দিলে কেরোসিন তেলে। তারপর সেটা দপ দপ করতে করতে গেল নিতে। তখন সেই ঘোর অন্ধকারে আমরা পাঁচ বীরপুরুষ আক্রমণ বন্ধ করে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

এর পরেরটুকু একান্ত করুণরসাত্মক ব্যাপার। তারপর শুক হয় পাণ্টা আক্রমণ। বড়দা ছোটকাকা মা এবং আরও কে কে মনে নেই ছুটে এলেন। এল আলো, এল বেত। তখন সেই চামচিকেটার পক্ষ অবলম্বন করে তাঁরাও একযোগে চালালেন পাণ্টা আক্রমণ। ঘণ্টাখানেক পরে যখন শান্তি স্থাপিত হল তখন আবার আমরা সেই ঘরের আরেকটা আলোর চারধারে বই খুলে বসতে বাধ্য হয়েছি, কিন্তু সবাই দুহাতে চোখের জল মুছছি। সবচেয়ে দুঃখের কথা, সব অনর্থের মূল সেই হতভাগা চামচিকেটার চুলের টিকিটিও আমরা আর দেখতে পেলাম না।...

এই রকমেরই একটা কাণ্ড ঘটে গেল সেই রাতে। শেরদিলের সেই পরম শাস্তিময় আশ্রয়ে নিকরবেগ চিন্তে ঘুমতে ঘুমতে হঠাৎ লাক দিয়ে উঠে অল্প সকলের সঙ্গে সেই গোল স্থানটির ভিতরে ছুটতে লাগলাম ঘুরে ঘুরে। শুধু

ছোট্টা নয়, প্রাণপণে সকলের সঙ্গে গলা মিলিয়ে চোঁচাতে লাগলাম, আর নিচু হয়ে বা হাতে ঠেকল তাই কুড়িয়ে নিয়ে ছুঁড়তে লাগলাম পাহাড়ের গায়ে অনেকটা উচুতে আর-একটি ছুটন্ত প্রাণীর দিকে। সেও ছুটছে ঘুরে ঘুরে, সেই চামচিকোটর মতই পালিয়ে যাবার পথ খুঁজছে। আমাদের সকলের হাতের পাখর গিয়ে পড়ছে তার দিকে। আমাদের সমবেত কণ্ঠের চীৎকার লক্ষণ হতে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে পাহাড়ের মধ্যে। তুমুল কাণ্ড! হঠাৎ সেই প্রাণীটির ছুটন্ত দেহটা কালো পাহাড়ের গায়ে অন্ধকারের সঙ্গে মিলিয়ে গেল। তবু কি সহজে আমাদের চীৎকার থামে! শেষে একান্ত হায়রান হয়েই আমাদের পা আর গলা থামল। আমরা হাঁশ ফিরে পেলাম।

তখন প্রথম যে কথা মাথায় এল তা হচ্ছে—ভৈরবীর আর কুস্তীর অবস্থাটা কি?

যেখানে ওরা শুয়ে ছিল সকলেই সেই দিকে ছুটে গেলাম। গিয়ে পৌঁছে বা দেখা গেল তাতে আর কারও মুখে বা ফুটল না।

কুস্তীকে জড়িয়ে ধরে ভৈরবী বসে আছেন। স্পষ্ট কিছুই দেখা গেল না, তবে এটুকু বেশ বোঝা গেল যে, নিশ্চয়ই একটা কিছু হয়েছে কুস্তীর, নম্রত তাকে ওভাবে জড়িয়ে ধরে বসে ভৈরবী কাঁদছেন কেন।

“আলো, আলো জ্বালাও জলদি।”

গোটা তিনেক আলো তৎক্ষণাৎ জ্বলে উঠল। ওদের কাছে গিয়ে নিচু হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, “কি, হয়েছে কি?”

কাঁদতে কাঁদতে ভৈরবী উত্তর দিলেন, “হয়েছে আমার মাথা আর মুণ্ড। ওদের সঙ্গে আপনিও কি এতক্ষণ জ্ঞানহারী হয়ে ছিলেন না কি? কাকে ও রকম করে তাড়ালেন তা জানেন?”

সকলে পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলাম। সত্যই ত—কাকে তাড়ালাম আমরা?

ভৈরবীই জানালেন, “ও থিকবল—এতক্ষণ ধরে থাকে শেরাল-তাড়া করে তাড়ানো হল। এই দেখুন ও কি করে গেল মেরেটার!”

সবাই স্বীকে পড়লার দেখবার জন্তে। আলো ধরে দেখা হল কুস্তীর গলায় মোক্ষর নিশীড়নের স্পষ্ট দাগ। দুহাতে গলা টিপে তাকে শেষ করে দেবার চেষ্টা করা হয়েছে।

আরম্ভ হল মাথার জল ঢেলে বাতাস করে কুস্তীর জ্ঞান ফিরিয়ে আনার প্রাণপণ চেষ্টা। ইতিমধ্যে আমরা শুনলাম কি করে ব্যাণারটা এতদূর গড়াল।

ভৈরবী বললেন—“গৌ গৌ আওয়ার শুনে আমার ঘুম ভেঙে যায়। চোখ চেয়ে দেখি, কে চড়ে বসে রয়েছে কুস্তীর বুকের উপর। তখন লাফিয়ে উঠে তাকে সজোরে একটা খাড়া মারি, সঙ্গে সঙ্গে চেষ্টা করে উঠি। লোকটা ছিটকে পড়ে ওদারে। আমার চীৎকার শুনে যে বার বিছানা থেকে উঠে চৌচাতে চৌচাতে তার পিছনে তাড়া করে। কেউ একবার ফিরেও দেখলে না যে, আমরা দুটো বেবেমাহুয যে পড়ে রইলাম আমাদের দশা কি হল।”

সকলেই নির্বাক।

মুখ তুলে তাকালার। অনেক উচুতে, পাহাড়ের একেবারে মাথা পর্যন্ত চোখ বুলিয়ে নিলাম। আরও উচুতে দৃষ্টি পড়তে দেখি, ভোর হয়ে এসেছে। মাথার উপরের গোল আকাশটুকুর রঙ ফিকে হয়ে এসেছে। তারাগুলিকে দেখতে পাওয়া গেল না।

শুলামহম্মদ এসে দাঁড়াল। বাইরে উর্টের পিঠে মালপত্র বাঁধা হয়ে গেছে। আমাদের বিদায় দিতে শেরদিলও এসে উপস্থিত হলেন।

দলহুজ সবাই বাক্যহারা। তখনও কুস্তীর মুখে মাথার জলের ঝাপটা দেখা চলেছে।

শেষে ওদের শোনানো হল সমস্ত ব্যাণারটা। শুনে ওরাও স্তম্ভিত।

শেরদিল বললেন যে তিনিও কিছুক্ষণ আগে বিধব গোলমাল শুনে

পেয়েছিলেন তাঁর আস্তানা থেকে। পাহাড়ে নানা জাতের আওয়াজ ত হামেশাই হয়। হয় কোথাও পাহাড়ের পা থেকে একাও পাথরের স্তূপ পড়তে লাগল গড়িয়ে, নয়ত বা পাহাড়ী জিনেরা গুহায় গুহায় কেঁদে বেড়াতে লাগল—কাজেই তিনি ঠিক খেয়াল করে উঠতে পারেন নি যে আমরাই প্রাণপণে চেষ্টা করেছি।

গুলমহম্মদ বললে, “তা হলে থিকমল গেল কোথা? এখান থেকে বেরবার রাস্তার ঠিক সামনেই ত আমরা উট নিয়ে বসে আছি, ঐ পথে সে গেলে আমরা নিশ্চয়ই তাকে দেখতে পেতাম।”

ভৈরবী উঠে দাঁড়ালেন—তখনও কুস্তী বেহঁশ। দাঁড়িয়ে তিনি হুকুম করলেন গুলমহম্মদকে—“এখনই যাত্রা করব আমরা। আর এক মুহূর্তও এখানে থাকা নয়। বুড়ো বাবা, নিয়ে চল ত তুলে এই মেয়েটাকে। শুকে আমার সঙ্গে খাটিয়ার ওপর তুলে দেবে।”

কেউই আপত্তি করলে না। যে বার কুঁজো কবল নিয়ে ভৈরবী হল। চূপ করে বসে সব দেখছি। শেষে জিজ্ঞাসা করলাম, “কিন্তু থিকমল যে রইল, তাকে খুঁজে বার করতে হবে না?”

ভৈরবী বললেন, “ঝাড়ু মারি তার মুখে।” বলে আবার গুলমহম্মদকে বিনতি করলেন—“বুড়ো বাবা, নাওনা মেয়েটাকে তুলে।”

দলস্বল্প সকলের মুখের দিকে চেয়ে দেখলাম। দেখলাম, ঘুণায় বিরক্তিতে সকলের মুখ ধমুধমু করছে। কেউ এরা আর চায় না থিকমলকে। সে বাঁচল না ম’ল এটুকু জানবারও বিন্দুমাত্র স্পৃহা নেই কারও মনে।

ছড়িদার রূপলাল এগিয়ে এসে দাঁড়াল আমার সামনে। দৃঢ় কণ্ঠে সে জানালে যে থিকমলের জন্তে আর কারও এক মুহূর্ত নষ্ট করবার ইচ্ছা নেই। সকলের যথেষ্ট লোকসান হয়েছে তার জন্তে। বাচ্ছে সকলে তীর্থ করতে। সেই হতভাগার জন্তে সকলের তীর্থযাত্রার ব্যয় পড়ছে বার বার। শেষ পর্যন্ত এই যাত্রা পণ্ড হয় এই কি আমার বাসনা?

পোপটভাই এসে আমার একটা হাত ধরলেন। তাঁর মুখের দিকে চেয়ে দেখলাম। দেখলাম পোপটভাইএর মুখের উপরেও দৃঢ় সঙ্কল্পের ছাপ ফুটে উঠেছে।

যেমন ভাবে ছোট শিশুকে দুহাতের উপর শুইয়ে নেয় তেমনি করে কুস্তীর জ্ঞানহীন দেহটা তুলে নিয়ে এগিয়ে চলেছেন শেরদিল। সামনে চলেছেন ভৈরবী।

পোপটভাই আমাকে টেনে তুলে নিয়ে চললেন।

অনেকটা উঠে সেই পাহাড়ী গলি দিয়ে ঘুরে ঘুরে নেমে গিয়ে আমরা খোলা জায়গায় পৌঁছলাম। যেন মুক্তি পাওয়া গেল কারাগার থেকে। সামনে যতদূর দৃষ্টি যায় তার শেষ সীমায় আকাশের গায়ে গিয়ে মিশেছে পাণ্ডুবর্ণ ধরণীতল। সেইখানটিতে কিপ্রহন্তে রঙের পর রঙ চড়াচ্ছেন কোন এক অদৃশ্য শিল্পী। প্রথমে ফিকে গোলাপী। তারপর আরও একটু চড়া ঐ একই রঙ। তারপর ফিকে লাল রঙ। তারপর তাঁর নিপুণ হাতের টানে সারা দিগন্তটা ঘোর রক্তবর্ণ হয়ে জ্বলতে লাগল। সেই দিকে চেয়ে রইলাম। ছটো রাত আর একটা পুরো দিন চোখের দৃষ্টি ছিল চতুঃসীমার মধ্যে আবদ্ধ। এতক্ষণে টের পেলাম সেটাও একটা কম জালা নয়।

সবাই প্রস্তুত। উটের পিঠে খাটিয়ার মধ্যে স্বস্থানে বসেছেন ভৈরবী। কোলে তাঁর বেহঁশ কুস্তী। সার বেঁধে দাঁড়িয়েছে সবাই কুঁজো কব্বল ঘাড়ে করে। এবার যাত্রা শুরু হবে।

পিছন ফিরে তাকানাম কালো রুক্ষ পাহাড়টার দিকে। ওর গায়ের অত খাঁজ-খোঁজের মধ্যে নিশ্চয়ই কোথাও লুকিয়ে বসে আমাদের দেখছে থিরুমল। পাহাড়টার আপাদমস্তক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখতে লাগলাম যদি কোথাও তার মুখখানা দেখতে পাওয়া যায়!

সামনে থেকে রূপলাল চীৎকার করে উঠল, “হিংলাজ মাতাকি—”, সকলে বেশ বলিষ্ঠ কণ্ঠে জবাব দিলে, “জয়!”

উট ছুটো আর মাগুঘের সারিটা নড়ে উঠল।

হাণুবৎ দাঁড়িয়ে আছি। আমার একপাশে শেরদিল অল্পপাশে পোপটভাই।
পোপটভাই বললেন “চলুন।”

শেরদিল বললেন, “কিছু ভাববেন না আপনি। নিশ্চয়ই সেই ছোকরাকে আমি পাব। পাগলই হোক আর বাই হোক জল-তেষ্টা পেলো তাকে নেমে আসতেই হবে পাহাড় থেকে। তখন আমার কাছেই বেধে দেব তাকে। গুলমহম্মদকে আমি বলে দিয়েছি যে আপনারা যে পথে ফিরবেন সেই পথে একটা কুয়ার কাছে লোকের বসতি আছে। সেখানে আমি আমার লোক সঙ্গে দিয়ে ছোকরাকে পাঠিয়ে দেব।”

আমি তখন ভাবছি শোনবেগীর সেই ঝড়জলের রাতটার কথা। ভাবছি সেই রাতে থিকমলকে ফিরিয়ে আনতে গিয়ে আমি প্রাণের মায়া তুলে গিয়ে-ছিলাম। ওর হাত ধরে টানতে টানতে ছুটে চলেছি। এক একবার পিছনের দিকে তাকিয়ে দেখছি, অন্ধকারের মাঝে পিছনে তাড়া করে ছুটে আসছে ঠিক ঐ কালো পাহাড়টার মত সমুদ্রের বিরাট ঢেউ। আমার কানে তখন বাজছে—থিকমল সেই প্রথম অর্থহীন হাসি হেসে উঠল—হা হা হা হা। বিছাতের আলোয় ওর চোখদুটোর দিকে চেয়ে আতকে উঠেছিলাম। তবু ওর হাত ছাড়িনি। কিন্তু—কেন?

কি করে তখন তাকে ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে আসব? তার একটু আগে পাচিলের উপর থেকে যে শুনেছিলাম—শুনেছিলাম থিকমলের সেই কাকুতি-মিনতি—“কিছুই হয়নি কুস্তী। কিছু হয়নি। আমি তোমার ছেড়ে বাঁচব কি করে, কোথায় যাব আমি? যে করে হোক আমরা আবার দাঁড়াব। আবার ঘর বাঁধব। কেন অবুক হচ্ছে তুমি?”

আবার নতুন করে শুনেতে পেলাম সেই আকুল আকুতি থিকমলের। আর একবার চোখ বুলিয়ে নিলাম পিছনে দাঁড়ানো পাহাড়টার চূড়া থেকে নীচে পর্যন্ত। নিশ্চয়ই ওখানে রয়েছে থিকমল। নিশ্চয়ই সে কোনও একটা

পাথরের আড়ালে লুকিয়ে বসে চেয়ে রয়েছে আমাদের দিকে। অসহায় ভাবে দেখছে থিরুমল যে আমরা তাকে ফেলে রেখে তার কুস্তীকে নিয়ে পালছি।

কিস্ত কোন্ অধিকারে ?

এক ঝটকায় পোপটলালের হাত থেকে হাত ছাড়িয়ে নিলাম। প্রাণপণে ছুটলাম সামনে ডাকতে ডাকতে, “গুলমহম্মদ, গুলমহম্মদ !”

সামনের বড় উট থামল। তার পিছনে থামল ছোট উট বার উপর ভৈরবী আর কুস্তী। দৌড়ে গিয়ে পৌছলাম ওদের পাশে।

“নামাও কুস্তীকে। নামিয়ে দাও বলছি এখনই। আমাদের কোনও অধিকার নেই ওকে নিয়ে যাবার—”

সবাই স্তম্ভিত। আমাদের ঘিরে দাঁড়িয়েছে সকলে। আমি হাঁফাচ্ছি।

উটের উপর থেকে ভৈরবী ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞাসা করলেন, “তার মানে ?” উত্তর দেবার আগে একবার সকলের মুখের দিকে চেয়ে দেখলাম। সকলেই রুদ্ধ নিশ্বাসে চেয়ে আছে আমার দিকে। কি রকম যেন হয়ে গেল আমার ভিতরটার। গলাটা কেঁপে উঠল। তবু বললাম, বললাম একান্ত মিনতি করে, বুঝে দেখ তোমরা। সবাই মাথা ঠাণ্ডা করে বুঝে দেখ, কেন আমরা ঐ মেয়েটাকে নিয়ে যাচ্ছি ? আমরা ওর কে ? থিরুমল এখানে থেকে গেল। শেরদিল বলছেন যে, সে ফিরে আসবেই জলের জন্তে। জল পর্যন্ত না খেয়ে সে কতক্ষণ থাকবে। কুস্তীও থাকুক শেরদিলের কাছে। ওদের দুজনকেই শেরদিল পাঠিয়ে দেবেন আমাদের ফেরার পথে সেই কুয়োর ধারের বস্তুতে। কুস্তীকে যদি আমরা নিয়ে যাই, থিরুমল ফিরে এসে বখন দেখবে যে কুস্তীও নেই তখন সে আরও কেঁপে উঠবে। আর যদি তার মাথার গোলমাল কেটে যায়—তখন সে কি ভাববে ? থিরুমল ভাববে যে তাকে বিসর্জন দিয়ে আমরা তার কুস্তীকে নিয়ে পালিয়েছি।”

আরও হয়ত বলতে পারতাম। রূপলাল সামনে এসে দাঁড়াল চোখ পাকিয়ে। তার চোখে তখন নিদারুণ স্বপ্ন। থেমে থেমে চিবিয়ে চিবিয়ে সে

উচ্চারণ করলে, “আগনি কি বলতে চান আমরা এতজন হিন্দুসন্তান ঐ হিন্দুর মেয়েটাকে এই মূল্যকে ফেলে রেখে চলে যাব ?”

ভৈরবীর চোখে আগুন জ্বলছে। তিনি শুধু বললেন, “ভীমরতি ধরেছে,” বলে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে দিলমহশাদকে আদেশ করলেন “চলো”।

ঘাড় হেঁট হয়ে গেল আমার। আর একবার কি একটা বলবার জন্যে চোখ তুলে ওদের দিকে চাইতে নজর পড়ল কুস্তীর চোখের উপর। কুস্তী চেয়ে আছে। চেয়ে আছে সোজা আমার দিকে। কি যে দেখছে কুস্তীই জানে। কিন্তু আমি তার চোখে দেখলাম জ্বাল আর তার সঙ্গে যেশানো যুগা। বোধ হল যেন ব্যাকুল মিনতিও করে পড়ছে সে দৃষ্টি থেকে। সে চোখদুটি মুখর হয়ে উঠেছে তখন, শব্দহীন ভাষায় বলছে আমাকে, “ফেলে যাবে ? আমাকেও এখানে বিসর্জন দিয়ে যাবে তুমি ?”

চোখ নামিয়ে নিলাম আমার।

পোপটলাল হাত ধরে টান দিলেন—“চলুন।”

সামনে চেয়ে দেখলাম সূর্যদেব উঠে আসছেন। কি জানি কেন আজ বহুদিন পরে একবার চোখ বুজে আমার ইষ্টদেবতাকে সূর্যমণ্ডলের মধ্যে দেখবার চেষ্টা করলাম। থিরমলের মুখখানাই ভেসে উঠল। মুখ টিপে সে হাসছে।

তারপর কখন যে সবাইএর সঙ্গে পা মিলিয়ে চলতে আরম্ভ করেছি তা নিজে বুঝতেও পারিনি।

চলেছি। কারণ, না চলে উপায় কি! এ চলার কি বিয়ায় আছে কোথাও? সবাই চলেছে এ ছনিয়ায়। সবাই তীর্থযাত্রী। যে মহাতীর্থে গিয়ে পৌছতে পারলে এই চলা কর্মটির হাত থেকে একেবারে রেহাই মেলে সে তীর্থের নাম-ঠিকানা আজও জানা নেই। এই যে হিংলাজ-যাত্রা, যেখানে এর শেষ হবে সেখানেই শুরু হবে আর এক যাত্রার। হয়ত সে পথে চোর-

কাঁটার মত সজ নেবে আর একদল কুস্তী আর থিরমল। তখনও হয়ত এই ভাবে চোখের জল মুছতে হবে কারও জন্তে। এক হাতে চোখের জল মোছা আর অন্য হাতে এই চলার পথের দুধারে বা মেলে তা কুড়িয়ে নিয়ে আঁচলে বাঁধা—এইই হচ্ছে এ চলার নীতি। কিন্তু আঁচলটা হচ্ছে শতচ্ছিন্ন। তার অজস্র ছিন্ন দিয়ে সব গলে পড়ে পথের ধুলার গড়াগড়ি যায়। তবু দাঁড়াবার সময় নেই কারও। পিছন ফিরে তাকাবার সময় নেই। কারণ অন্য সবাই এগিয়ে যাচ্ছে যে।

তাইত দেখেছি। জীবনের অনেকগুলো দিন মাস বছর গঙ্গার ঘাটে বসে কাটাতে কাটাতে দেখেছি। দেখেছি সন্তানকে বুকে জড়িয়ে ধরে হাহাকারে আকাশ বাতাস কাঁপাতে কাঁপাতে মা এসে উপস্থিত হলেন। চিত্তায় ভূলে দেবার পরও হাহাকার। সে হাহাকারে পাষণ গলে যায়। চিত্তা নিভল। নেয়ে ধুয়ে ফিরে গেলেন মা। দিন গেল মাস গেল—বছরও প্রায় যায় যায়। সেই মাকেই আবার ঘুরে আসতে দেখেছি। এবার তাঁর কোলে আর একটি নূতন আগন্তুক। স্মৃতিকাগার থেকে বেরিয়ে গঙ্গান্নানে এসেছেন। শুক শুচি হয়ে ঘরে ফিরবেন ছেলে কোলে নিয়ে। বুকের ভিতর তাঁর সীমাহীন কামনা—তাঁর এই সন্তান বড় হবে, এরই কোলে মাথা রেখে তিনি চোখ বুজবেন, আর এই ছেলেই তখন তাঁর জন্তে চোখের জলে বুক ভাসাবে।

শহরের রাস্তায় দেখেছি—পথেও এক পাশ দিয়ে শুকমুখ নয়-পা নয়-পা একদল চলেছে একখানা খাটিয়া কাঁধে করে। চোখের দৃষ্টি তাদের শূন্য, মুখে তাদের ভাষা নেই। সেই সময় সেই রাস্তারই মাঝখান দিয়ে মন্ত এক গাড়িতে চলেছে একজন,—পাশে তার নববিবাহিতা বধু। চোখে সোনালী স্বপ্নের কাজল। বৃকে তাদের মধু-ভাষার কলধ্বনি। ওদের দেখে এরা মুখ ফিরিয়ে নিল। বিতৃষ্ণায় মনটা ভরে গেল এদের—“মরবার আর দিন গেলে না ব্যাটা!” এই অলক্ষ্যে দৃষ্ট চোখে পড়ে আজকের দিনে মনের আনন্দজটুকু না মাটি হয়ে যায় এ জন্তে নববধুকে একটু আড়াল করে বসল।

জীবনভোর বেখানে বা কিছু চোখে পড়েছে তার সবটুকুই একটা বিরাট ফাংলাপনার উলঙ্গ মূর্তি ধরে সামনে এসে দাঁড়াল। এ ছুনিয়ার বেঁচে থাকার সোজা অর্থটা হচ্ছে আগাগোড়া গৌজামিলের মিল খুঁজে বেড়ানো। বা কিছু সামনে পড়ুক ওকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে বাওয়াটাই সবচেয়ে চরম কথা। অল্পস্বার নিজের সঙ্গে আপোসে মিটমাট করে নিয়ে সামনে শুধু চোখ বুজে ছুটে চলাটাই বেঁচে থাকার পরম সার্থকতা।

তাই করতে হল। প্রচণ্ড একটা ধমক দিয়ে নিজেকে বোঝাতে লাগলাম—“তুমি চলেছ তীর্থ করতে। বেঁচে যদি ফিরতে পার এখান থেকে তাহলে দাঁড়িপাল্লার পুণ্যের দিকটা কতকখানি বুঁকে পড়বে তার হিসাব রাখ বাপু? শুধু কি তাই? যদি খড়ে প্রাণটুকু বজায় রেখে গিয়ে দাঁড়াতে পার তোমার সমশ্রেণীর সগোত্রদের মাঝে, তখন তোমার বাবাবরজের মহামূল্য মুকুটে এই হিংলাজ-পথে কুড়িয়ে-পাওয়া জলজলে হীরাখানি দেখে সকলের কতটা তাক লেগে যাবে সেটা কি ভুলে গেলে? পা চালাও, সামনে পা চালাও ঘাড ঝুঁজে, কোন দিকে না চেয়ে। সামনেই চন্দ্রকূপ। জান সেটা আবার কি পদার্থ? যখন সেটা চোখের নাগালের মধ্যে আসবে তখন বুঝতে পারবে কি বিশ্বয় অপেক্ষা করেছে তোমার জন্তে। যে পড়ে বইল সে থাকুক। কোনও লাভ নেই শিছন কিরে চেয়ে। শুধু সামনে এগিয়ে চল।”

চলতে লাগলাম ডাই পোপটলাল প্যাটেলের আমার চেয়ে আধ হাত উচু দীর্ঘ দেহখানির পাশে পাশে।

একটা লম্বা নিখাস পড়ার শব্দ শুনলাম। আমার ডান কানের আধ হাত উচুতে পোপটলালের মুখ সেখান থেকে সেই নিখালের সঙ্গে চাপা গভীর স্বরে বেরুল—“হে ভগবান, হে হিংলাজ মাতাজী, আজ সন্ধ্যা পর্বন্ত যেন বেঁচে থাকি। একবার যেন চন্দ্রকূপ পৌঁছতে পারি এই দেহটা নিয়ে। তারপর মরণই আবশ্যক আর পাগলই হয়ে বাই কোনও আকসোস নেই।”

মুখ তুলে চেয়ে দেখলার পোপটলালের মুখ। পোপটভাই ঐ দেহটার মধ্যে কোথায় তলিয়ে গেছেন। বহুদূরে কোথায় চলে গেছেন তিনি। তাঁর লম্বা দেহটা দম দেওয়া পুতুলের মত আমার পাশে পাশে হাঁটছে।

কিছুক্ষণ চুপচাপ। হুজনে আগুন চিড়ার হাবুডুবু খাচ্ছি। আবার অতি নিচু গলায় কি বলতে লাগলেন পোপটলাল। এবার মনে হল যেন বহু দূর থেকে তাঁর কথাগুলি ভেসে আসছে। কান খাড়া করে শুনতে লাগলাম।

“উঃ কতদিন! কতদিন ধরে কাটালাম এই দিনটির অপেক্ষার। বারো বছর। বারোটা বছরের প্রত্যেকটি দিনরাত শুনে শুনে কাটিয়েছি। এই বারোটা বছরের প্রত্যেকটি রাতে স্বপ্ন দেখেছি চন্দ্রকূপের আর মাত্র কয়েকটা খণ্ড। এই কয়েকটা খণ্ড যদি সামর্থ্যটুকু বজায় থাকে তবে পৌঁছব নিশ্চয়ই চন্দ্রকূপ। এই দেহ নিয়েই চন্দ্রকূপ দর্শন হবে। সমস্ত জালা জুড়িয়ে যাবে। জয় বাবা চন্দ্রকূপ! এইটুকু সময় যেন তোমার দয়ার আমার হাঁশ বজায় থাকে বাবা।”

আবার চেয়ে দেখলাম পার্শ্ববর্তী চলন্ত দেহটার মুখের দিকে। প্রকাণ্ড পাগড়ির নীচে কপালের উপর একান থেকে ওকান পর্যন্ত পরপর পাঁচটা রেখা। হুগভীর হুন্সট পাঁচটা দাগ। যদি পড়তে জানতাম ঐ দাগগুলোর অর্থ। কত কিছুই যে জানা যেত। সোজা সামনের দিকে চেয়ে আছেন পোপটলাল। তাঁর চোখের পাতা পড়ছে না। সামান্য বোলাটে তারা ছুটিও স্থির নিশ্চল। যেন এখান থেকেই তিনি দেখতে পাচ্ছেন চন্দ্রকূপ। না, তা ঠিক নয়। দেখছেন তিনি পার-হরে-আসা বারোটা বছর অপেক্ষার কোনও কিছু, যা জানতে পারলে তাঁর কপালের ওই রেখাগুলোর মানে বোঝা যেত, যা হৃদয় আর তাঁর মুখ দিয়ে বার হবে না কখনও।

কক্ষ নিখাসে মন কান সজাগ রেখে হাঁটছি তাঁর পাশে পাশে। অনেকটা সময় নিশ্চেষ্টে পার হওয়া গেল। পারের নীচে চাঙড়া চাঙড়া পাখর শেষ

হয়ে গেছে। আরও হয়েছে বালি। সাদা কুরকুরে চিক্‌চিকে নির্ভেজাল বালি। পা বসে যাচ্ছে। বহু আগে দেখা যাচ্ছে উট ছটিকে। সামনের বড় উটটার উপর এতগুলো লোকের বেঁচে থাকার রসদ। পিছনেরটার উপর খাটটার মধ্যে ওরা দুজন। হেলছে দুলছে দুটো দেহ। এতদূর থেকে মনে হচ্ছে, বেন হাওয়ার দুলছে। তারপর মাহুঘের একটা লম্বা সারি। পাশাপাশি দুজন, তাদের পিছনে আরও দুজন বা একলা একজন। সার বেঁধে একমনে চলেছে সবাই জলের কুঁজো কাঁধে নিয়ে। মুখে কথা নেই, বেন সকলেই গভীর চিন্তায় ডুবে গেছে। কি ভাবছে ওরা এখন? ভাবছে নাকি শিকরনের কথা? পিছনে যে পড়ে রইল সেই হতভাগার একমাথা কুক কৌকড়ানো চুল আর ভাসা-ভাসা চোখ দুটো শুক শুকনো মুখখানা সকলের মনের কোণে উকিঝুঁকি দিচ্ছে হরত। হরত ইতিমধ্যে অনেকের বুকের মধ্যেই তোলপাড় করছে একটা চিন্তা—এই ভীষণপথে এখন এই সময় হঠাৎ যদি বিগড়ে বসে দেহের মধ্যে মন নামে যে কলটা চলেছে সেই কলটা, তা হলে? হঠাৎ যদি সেটার কোথাও কিছু ঢিলে হয়ে যায়? দৈবাৎ যদি এমন হয়ে বসে যায় ফলে এতদিনের চেনা জানা এই পুরানো জগৎটাকে আর চেনাই বাবে না—তখন? তখন আর কি, তখন নির্বিঘ্নে নির্বিবাদে সহযাত্রীরা তাকে ফেলে রেখে এগিয়ে চলে যাবে। তারপর এই বিশাল মরুভূমির আদিগন্ত সমস্তটুকু মৌরসী সঙ্গে ভোগ দখল করতে থাক। কেউ কোনও দিন তিলমাত্র আপত্তি করতে আসবে না।

দেশে-গাঁয়ে নিজের স্বজাতি-স্বজনের মাঝে স্বাধীনতা বলতে কোনও কিছুই বলাই নেই। না যার প্রাণ খুলে একটা কথা বলা, না চলে নিজের প্রাণটা নিয়ে একটা কিছু করা। এখনই খপ করে মরব বললে সহজে কেউ মরতেও দেবে না। গলার দড়ি দিলে লুকিয়ে দিতে হবে। টের গেলে দড়ি কেটে নাযাবে। বিষ খেলে তৎক্ষণাৎ বস্তু ডেকে আনবে। টেনে-হিঁচড়ে বসের স্বরজা থেকে আনবে কিরিরে। পাগল হয়েও শাস্তি নেই, দড়িদড়া শিকল

দিয়ে বেঁধে রাখবে। যার কেউ কোথাও নেই তারও না-খেয়ে মরবার ভয় নেই। দিগন্তর হয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল রাস্তায় রাস্তায়। তখন সবাই দেখে খেতে, সকলেই তার ভার বয়। সকলেরই নজর থাকে তার উপর। দুদিন না দেখতে পেলেই অমনি আরম্ভ হয়ে যায় চারদিকে—“তাইত, পাগলাটা আবার গেল কোথায়? কদিন দেখা যাচ্ছে না ত!” সকলের দরজার সামনের খোলা রাস্তাটুকু তার জন্তে। দিনরাত বদৃচ্ছা পড়ে কাটাও। কেউ আপত্তি করবে না।

কিন্তু—এখানে? এখানে কেউ নেই যে তোমার শাস্তির ব্যাঘাত ঘটাবে। তোমার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করবে এমন জনপ্রাণী কখনও এখানে এসে জুটবে না। উপরের ঐ আকাশ আর পায়ের তলায় এই ধূ ধূ মরুভূমি—এরা দুজনেই নির্বাক বিন্ময়ে চেয়ে থাকবে তোমার দিকে, যতক্ষণ না তুমি এই মরুভূমির বুকে লুটিয়ে পড়। তারপর এই শ্বেত শুভ্র অকলঙ্ক বালির বুকে পড়ে থাকবে কখানি শ্বেত শুভ্র পবিত্র হাড়।

বালির বুকের মধ্যে লুকিয়ে রেখে এসেছি আমরা জয়াশঙ্করকে। উপরের-খোলা-চাড়ানো তাঁর হাড় কখানা আকাশের দিকে চেয়ে নির্লজ্জের হাসি হাসতে পারবে না। কিন্তু থিরমলের যে সে-উপকারটুকুও করে আসা হল না। তা না হল ত কি এমন কতি হল! যতক্ষণ এই খোলা হাওয়ায় ছুটে বেড়াতে পারে বেড়াক। তারপর পড়ে থাকবে আরাধ করে এই খোলা হাওয়ায়।

এতক্ষণ পরে খেয়াল হল খোলা হাওয়ার মধুর আনন্দটুকু। চোখ মুখ পুড়িয়ে ঝলসে দিতে শুরু করেছে। তাভাতাড়ি চাদরটা দিয়ে মাথা মুখ ঢেকে ফেললাম।

আবার মুখ খুললেন পোপটলাল।—

“এই আগুন—বারো বছর ধরে দিনরাত অষ্টগ্রহর এই আগুনে দগ্ধে মরছি। আজ আর এর আঁচ গায়ে লাগে না আমার। এ ত অতি তুচ্ছ। এ শুধু বাইরেটাই পোড়াতে পারে। যে আগুনে আমি পুড়েছি তা শুধু পুড়িয়েছে

ভিতরটা। মুখ বুজে দিনের পর দিন কাটাতে হয়েছে। সে জানা সে দখানি কোথাও কারও কাছে ভিলমাজ প্রকাশ করার উপায় নেই। এইবার তার শেষ। আর কয়েকটা ঘণ্টা যদি এই শরীরের শক্তি-সামর্থ্যটুকু বজায় থাকে! জয় বাবা চন্দ্রকূপ!”

বোধ হয় বাবা চন্দ্রকূপকেই উদ্দেশ্য করে বার বার জোড় হাত কপালে ঠেকালেন তিনি।

চূপ করে চলেছি। আমাকে ত শোনাচ্ছেন না পোপটলাল। কথা বলছেন তিনি নিজের সঙ্গে। বলুন, কান আছে শুনে যাই। তাঁর সেই নিজের সঙ্গে বাক্যালাপের মাঝে আমি কি কথা কইব।

কথা না বললেও তাঁর স্বগতোক্তি আর এক নূতন ভাবনার ফেলে দিলে। এই যাত্রার প্রথম থেকেই নানাজনের মুখ থেকে নানাকথা কানে আসছে চন্দ্রকূপ সম্বন্ধে। চন্দ্রকূপের কোনও আলোচনা উঠলেই বেশ সমস্ত ভাব এসে পড়ছে স্বরে আর ভাবায়। রহস্যজনক সমীহ করা হচ্ছে চন্দ্রকূপ বাবাকে। অনেকবার এ জাতের আলাপও শুনিছি যে, চন্দ্রকূপ বাবার কৃপা হলে, তাঁর হুকুম পেলে, তবে ত হিংলাজ-দর্শন। এতদিন বিশেষ করে এ সব কথাই মাথা ঘামাইনি। ভারতবর্ষের প্রায় সব তীর্থেই কুণ্ড আর কূপের চড়াচড়ি। উষ্ণ শীতল শ্রাম রাধা গৌরী সৌভাগ্য সূর্য—আরও নানা রকমের কুণ্ড দেখেছি, স্পর্শ করেছি। কূপেরও কিছু কন্মতি নেই। সর্বত্রই এক আইন, এক চাল। জ্ঞান করবার মত জল থাকলে জ্ঞান কর, নয়ত সেই স্থল-বেলপাতা-পচা জল মাথায় ছিটিয়ে নাও। তারপর সেই সমস্ত কুণ্ড-কূপের রক্ষক পাণ্ডা-পুরুতদের সঙ্গে যথারীতি খেঁচাখেঁচির পর যথাসক্তি দান-দক্ষিণা শেষ করে হাকামা চুকিয়ে ফেল। চন্দ্রকূপে পৌঁছে ঐ ধরনের কিছু করলেই চলবে—এতদিন এই ধারণাই করে আসছিলাম। পোপটলাল প্যাটেলের কথাগুলি শুনে বাবা চন্দ্রকূপের প্রতি ভক্তির মাত্রাটা কতখানি বৃদ্ধি হল বলা শক্ত, তবে ভয় না হোক, হুশিঙ্গা যে খানিকটা বৃদ্ধি হল তাতে সন্দেহ নেই। কি জানি কি

আছে সেই চক্রকূপে, যার মাহাত্ম্য এমনই অসীম যে একবার সেখানে পৌঁছতে পারলে দীর্ঘ যারো বছরের ভুয়ানলের জালা জুড়িয়ে যাবে।

কিন্তু এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন—কি সে কারণটি যার জন্তে এই সদানন্দ প্রোতের এই সুদীর্ঘ অন্তর্দাহ। সেখানে পৌঁছলেই ত জানা হয়ে যাবে চক্রকূপের রহস্তটা কি—কিন্তু পোপটভাইএর গোপন রহস্তটি আর কখনই জানা যাবে না।

আমার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে অন্তর্দৃষ্টি চেয়ে থেকে হঠাৎ পোপটলাল জিজ্ঞাসা করলেন—“স্বামীজি মহারাজ, একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই আপনাকে যদি কিছু না মনে করেন।”

এতক্ষণ পরে কথা বলার সুযোগ পেয়ে কৃতার্থ হয়ে গেলাম, তাড়াতাড়ি জবাব দিলাম, “বলুন না কি জানতে চান।”

“ঐ যে মাতাজী চলেছেন আপনার সঙ্গে, উনি আপনার কে?”

এই প্রশ্নটির জন্তে প্রস্তুত ছিলাম না। আশা করেছিলাম পাপ-পুণ্য সম্বন্ধে একটি সারগর্ভ বক্তৃতা করবার সুযোগ পাব তাঁর প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে। কিন্তু এ একেবারে অপ্রত্যাশিত প্রশ্ন। উত্তর দিতে গিয়ে ঢোক গিলতে হল। বাস্তবিক আমি নিজেও ত কখনও ভেবে দেখিনি যে উনি আমার কে। কিন্তু চট্ট করে উত্তর না দিলে চলে না। পোপটলাল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন আমার মুখের দিকে। যা মুখে এল তাই বললাম, “কই—কেউ নয় ত। মানে কোনও সম্বন্ধই নেই আমার সঙ্গে তাঁর। ছনিয়ায় আমি স্রেফ একা, কারও সঙ্গেই কোনও সম্বন্ধ নেই আমার।”

উত্তরটা শুনে তাঁর কপালের পাঁচটা রেখা সঙ্কচিত হয়ে উঠল। একটু চুপ করে থেকে তিনি বললেন, “তবে? তাহলে কিসের জন্তে একটা মেয়েমানুষের দায়িত্ব বয়ে বেড়াচ্ছেন আপনি শুধু শুধু? এখানে এই সময়ের মুখে এসেছেন আজন্মের পাপ-তাপের জালা থেকে পরিত্রাণ পেতে। এখানেও ঐ আপদ সঙ্গে এনেছেন কেন?”

একটু বেন বাগের ছোঁয়াচ তাঁর ঘরে, বেন একটু থমকের স্বর মেশানো। আমিও ভাবনার পড়ে গেলাম। বললাম—“কই, মনে ত পড়ছে না এমন কোনও বড়সড় পাগ-টাপের কথা, যার জলুনির হাত থেকে রেহাই পাবার আশায় এতদূর ছুটে এসেছি। আর জন্মাবার সময় যখন ঐ আগদের জ্বাভেরই একজনের পেট থেকে বেরতে হয়েছে—তখন আছেই না হয় একটা সন্ধে। এতে আর দার-দারিঘটা কোথায় আসছে বলুন। এমন কি, নিজের কুঁজো থেকে ঐকবিন্দু জলও ত দেবার উপায় নেই। হাব নদীর কিনারায় সেই প্রতিজ্ঞাগুলো সন্ধে চলেছে ত। কি আর এমন কতিবুদ্ধি হচ্ছে আমার ও সন্ধে থাকলে। তীৰ্ধ করে ও ওর ভাগের পুণ্য নিয়ে ফিরবে, আমি আমার ভাগেরটুকু নিয়ে ফিরব। কেউ কারও পুণ্যে ভাগ না বসালেই হল।”

তুনে তিনি একটি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। টেনে টেনে বলতে লাগলেন—“হায়, আমিও যদি পারতাম আপনার মত বলতে। এতবড় পাগের বোঝাটা বয়ে যদি আমাকে এখানে আসতে না হত। আপনার আর ঐ মাতাজীর মত আমিও তাহলে অনায়াসে পারতাম বাক-তাকে কুড়িয়ে নিয়ে বুক করে আগলে বেড়াতে। কোনও ঝগড়াই তাহলে আপন বলে মনে হত না আমার। কিন্তু তা হবার উপায় নেই। নিজের তার বতকণ না নামছে বুক থেকে, ততকণ অল্প কিছুই সেখানে স্থান নেই। এই দলের অনেকেরই এই তীৰ্ধপথে অল্প কোনও দিকে নজর দেবার উপায় নেই। অনেকেরই বুকের উপর চাপা ভগদল পাখর। সামনে ঐ চন্দ্রকূপ। ওখানে পৌঁছলে সে পাষণ বুক থেকে নামবে। জয় বাবা চন্দ্রকূপ!”

কাঁধের কোলা থেকে ছুটি বিড়ি বার করে একটি তাঁকে দিলাম। একটা কাঠি জেলে দুজনের বিড়ি ধরিয়ে নিয়ে আবার চলা শুরু করলাম। এক স্তম্ভীর্ণ টানে বিড়িটার স্মৃতি পর্বন্ত পৌঁছে নাকমুখ দিয়ে গল্গল্ করে ধোঁয়া ছেড়ে পোপটতাই বললেন, “কিছু মনে করবেন না, আমিও মহারাজ, আমার বেরাদবির জন্তে। ও কথাটা আপনাকে জিজ্ঞাসা করা কখনই আমার উচিত

হয় নি। মাতাজী ত সাক্ষাৎ দেবী! ঠিক কথা আলাদা। কিন্তু মেয়েমানুষ জাতটাকেই আমি সাপের চেয়ে বেশি ভয় করি। বারো বছর আগে আমিও আপনার মত বুক ফুলিয়ে বলতে পারতাম, কই মনে ত পড়ছে না এমন কোনও বড়সড় সাপের কথা—যদি না তখন সে এসে জুটত আমার জীবনে। ঐ মায়ের জাতেরই সে একজন। কিন্তু আমার এই পোড়া চোখে তাকে দেখেছিলাম অন্য নজরে। সেই বয়সই ছিল তখন আমার। আগুন জলে উঠল আমার দেহমনে। নিজের সর্বনাশ নিজে করে বসলাম। সেই সর্বনাশের কীস থেকে মাথা গলিয়ে পালাবার জন্তে যা করলাম তার ফলে এই বারো বছর আমার চোখের মুম গেছে ঘুচে, মুখের গ্রাস বিস্তার হয়ে গেছে। ওই জাতকে আমি সাপের চেয়ে বেশি ভয় করি। শুধু ভয় নয়, ঘৃণাও করি। হাঁ, ঘৃণাই করি। নিজের এই ছু চোখে যা দেখেছি, এই হাত দুটো দিয়ে যা ঘাঁটতে হয়েছে আমাকে, তার ফলে ওই জাতের উপর আর কোনও নেশা নেই আমার। ভালও না মন্দও না। শুধু ঘৃণা—শুধু বিতৃষ্ণা—” বলতে বলতে পোপটলাল বার বার শিউরে উঠলেন, যেন কি একটা বীভৎস দৃশ্য আজও দেখতে পাচ্ছেন তিনি।

বিস্ময়ে হতবাক হয়ে বার বার মুখ ফিরিয়ে দেখলাম পোপটলাল প্যাটেলকে। আমার দেহের চেয়ে আধ-হাত লম্বা লোহার মত শক্ত ঐ দেহটির ভিতর থেকে, আসল যে পোপটলাল, তিনি যেন এইবার ধীরে ধীরে বেরিয়ে এসে দাঁড়ালেন আমার চোখের সামনে। দেখলাম, সেই আসল মানুষটির সবাক্কে বড় বড় ফোফা। ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে লাগলাম প্রায় নিশ্বাস বন্ধ করে।

“কি নিদারুণ অবস্থা। একদিকে বংশের সুনাম সমাজ আত্মীয়স্বজন ঘর-বাড়ি গ্রামদেশ সব ছেড়ে পালানো, নয় আত্মহত্যা করা, অন্যদিকে জেল হাজত পুলিশ আর তার জীবন। কি করি, কোথায় যাই, কার সঙ্গে পরামর্শ করি! বতবড় আত্মবদ্ধুই হোক, সেই বিপদের কথা জানিয়ে কারও কাছে সাহায্য চাইতে গেলেই জাহান্নামের অভয় ভলে তলিয়ে যেতে হবে। সকলের চোখে খুলো দিয়ে সেই মহাক্যামার থেকে উদ্ধার হতে হবে। তার না জানি কোনও

উপায়, না জানি কোনও ওষুধ। নিজের গ্রামে সকলের মাঝখানে সে কর্ম করবার স্থানই বা কোথায়। শেষে স্বযোগ-নিজে থেকেই এসে উপস্থিত হল। সেই রাত্রেই স্বযোগ এ জীবনের বারোটা বছর বিধিয়ে দেবার জন্তেই এসে ধরা দিলে। তারপর সেই শেষ ছোটো দিন আর ছোটো রাত। অসীম ধৈর্য ধরে এক একটি মুহূর্ত গুনতে গুনতে অপেক্ষা করা। প্রাণ যখন একেবারে কণ্ঠাগত প্রায়—তখন উপস্থিত হল সেই মোক্ষম সময়। সেই একটা রাতেই আমার বয়স বিশ বছর বেড়ে গেল। বাইরে আলকাতরার ঈত আঁধার, আর বৃষ্টি পড়ছে। কাছে-পিঠে এক ক্রোশের মধ্যে জনশ্রাণী নেই। নদীর কিনারায় একটা ভাঙা ঘরের ভিতর আমরা দুটি প্রাণী। অসহ্য ধ্বনায় সে গোড়াচ্ছে মেঝের পড়ে, মিটমিটে আলোয় তার দিকে চেয়ে আমি অসহায় ভাবে বসে আছি। কি ভাবে কি হয়, তখন কি করা দরকার, তার কিছুমাত্র জ্ঞান নেই আমার। বুকের মধ্যে টিপটিপ করছে, ভয়ে নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। যদি মরে যায়? ছেলে হবার সময় অনেকেই ত মরে ছেলে আটকে। যদি তাই হয়—তখন? অমাতুলিক তার সেই কাতরানি, তার উপর তার দেহটা কঁকড়ে মূচকে ছুঁড়ে এমন ভয়ঙ্কর হয়ে দাঁড়াল যে সেদিকে আর চাওয়াই যায় না। একবার মনে হল—দিই ছুঁতে গলাটা টিপে চিরকালের মত সমস্ত আওয়াজ বন্ধ করে। চোখ বুজে নিজের হুকানে আঙুল দিলাম। ও একটা তীব্র চীৎকার করে উঠল। ভয়ে আঁতকে উঠে চোখ খুললাম। দেখি নীল হয়ে গেছে তার মুখ। ঠিক করলাম ছুটে পালান। উঠে দাঁড়ালাম তার পাশ থেকে। চোখের মত পা টিপে টিপে এগিয়ে যাচ্ছি ঘরের দরজার দিকে, আবার সে করুণ আর্তনাদ করে উঠল। পিছন ফিরে তাকালাম। ইসারায় কাছে ডেকে বহুকষ্টে সে বললে—

কে যেন পোপটলালের কণ্ঠ চেপে ধরল দৃঢ়মুষ্টিতে। হঠাৎ তিনি দাঁড়িয়ে পড়লেন। নিজের হুঁহাতের মুঠো ছোটো বার বার খুলে আর বন্ধ

করে কি যেন দেখতে লাগলেন। যেন কিসের দাগ তাঁর দুই হাতে লেগে রয়েছে।

হঠাৎ হ হ করে কেঁদে উঠলেন তিনি। নিজেকে খাড়া রাখতে পারলেন না আর, হাঁটু মুড়ে বালির উপর বসে পড়লেন। কান্নার সঙ্গে মিশিয়ে কিস্ কিস্ করে বলতে লাগলেন পোপটতাই —

“জ্যাস্ত লাল-টুকটুকে এতটুকু একটি মেয়ে আমার এই দুহাতে। কেঁদে উঠল—নিকলক সন্ত-আগতের প্রথম ধনি। তাড়াতাড়ি মুখ চেপে ধরলাম। তার সেই ছোট্ট মাথাটা ধরে একটা পাক দিতেই কৌক কৌক করে আবার সামান্য একটু আওয়াঙ বেরুল। এক মুহূর্ত নষ্ট করবার কি সময় আছে তখন আমার! চক্কর নিমেবে কাপড় জড়িয়ে নিয়ে নামলাম গিরে নদীর জলে। গলা পর্বন্ত জলে গিয়ে পুঁটলিটা ছুঁড়ে কেলে দিলাম নদীর মাঝে। তখন সেই জলের মধ্যে চূপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। আবার আমার খাল বইতে লাগল। যেন প্রচণ্ড নেশা করেছিলাম এতক্ষণ। এবার সেই নেশার ঘোর কেটে যেতে লাগল। সবরে একবার পিছন কিরে দেখলাম কেউ সাক্ষী রইল কিনা কোথাও। সেখানে সেই আধারে বৃষ্টির মাঝে কে আসবে! চেয়ে রইল শুধু মাথার উপরের ঐ আকাশ। নিকষকালো বিরাট দুই চক্কু মেলে সবরে চেয়ে রইল আমার দিকে। ঐ আকাশ আজও ঠিক তেমনি করেই চেয়ে আছে। ওর দিকে চোখ তুলে তাকালেই দেখতে পাই মুখ টিপে হাসছে আর নীরব ভাষায় বলছে আমার—“তোমার সেই মহাপাতকের সাক্ষী আমি। আগাগোড়া আমি সমস্তই দেখেছি। আমাকে ত লুকাতে পারনি তুমি কিছু। আমার কাছ থেকে কোথায় লুকাবে তুমি তোমার মুখ?”

সমস্ত পাগড়ি স্ফুট মাথাটা সজোরে বার-কতক নেড়ে নিজের দুহাত দিয়ে মুখ ঢেকে পোপটতাই কাঠ হয়ে বসে রইলেন।

তাঁর কাঁধের উপর আলতো করে একটা হাত রেখে নীরবে তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে রইলাম আমি।

একসঙ্গে একগল্গা প্রাণ ঠেলাঠেলি করতে লাগল মনের দরজার। কে সেই মেয়ে? তারপর কি হল সেই মেয়ের? নদীর জল থেকে উঠে এসে কি করলেন তিনি, কোথায় গেলেন তারপর? মরবার অন্তে মেয়েটাকে সেই ঘরে ফেলে রেখে পালিয়ে এলেন না কি? না, ফিরে এসে দেখলেন ঘরের মেয়ের সেও মরে কাঠ হয়ে আছে?—আরও কত রকমের কত প্রশ্নই করা যায় ছিল তাঁকে। একটি কথাও জিজ্ঞাসা করা হল না। বা জিজ্ঞাসা করব সেটাই হবে অবাস্তব প্রশ্ন। আসল কথাটা হচ্ছে—শোপটলাল প্যাটেল সেই রাতের দীর্ঘ থেকে আজ পর্যন্ত বেঁচে রয়েছেন। বেঁচে থেকে তুহানলে দণ্ড হচ্ছেন রাজ এই আশাটুকু বুকে নিয়ে যে, একদিন না একদিন তিনি সশরীরে এসে পৌঁছবেন চন্দ্রকূপে—যেখানে পৌঁছলে তাঁর জগহত্যার মহাপাতকটা বেমালুম বাবে উবে।

সামনের দিকে চেয়ে দেখলাম। কোথাও কিছুমাত্র নেই। ওই যে বিরাট শূন্যতার সমুদ্র, ওর ওপারে পৌঁছতে হবে। সেই তীরে আছে চন্দ্রকূপ, যার মাহাত্ম্য এমনই ভীষণ যে—যতবড় পাপই থাকুক না কেন—চন্দ্রকূপের জলে নিঃশেষে তার সবটুকু ধুয়ে গলে সাক হয়ে বাবে। চেয়ে থাকতে থাকতে কিন্তু আমার মনে হল যে, পাপ নিয়ে কেউ চন্দ্রকূপ পর্যন্ত পৌঁছতেই পারবে না। মনে হল যেন, এখানে পায়ের তলার বালি আর মাথার উপরের আকাশ—এ দুটোও এই অপার অতল শূন্যতার মাঝে কোথায় তলিয়ে গেছে। শুধু থাকবার মধ্যে আছে একটা অগ্নি-তরঙ্গ, যার উপর ভাসতে ভাসতে আমরা কোথায় যে চলেছি তা নিজেরাও জানি না। যদি সত্যি এই ভাসার অন্তে কোথাও কোনও কূলে গিয়ে ঠেকতে পারি তখন পাপপুণ্য, কর্মকল, এর কোনও কিছুই সঙ্গে থাকবে না, সবই নিঃশেষে পুড়ে ভস্ম হয়ে বাবে আমাদের কূল পাওয়ার আগেই। আমরা তখন অগ্নিতত্ত্ব নিশাপ নিকলক জ্যোতি রাজ। অমৃতের সন্তান আমরা, আমাদের ভয় কি।

তবু একবার আগাগোড়া সমস্ত জীবনটা তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখলাম—
আছে নাকি কোথাও ঘাপটি মেয়ে লুকিয়ে একটা যন্তবড় জাত-পাপ। নাঃ,
সেদিক দিয়েও আমি দেউলিয়া। মনের অঙ্ককার কোণা-ঘুঁজিগুলোয়
ছোটখাটো ঢোঁড়া-ঢামুনা চিতি জাতের নির্বিষ পাপ অনেকগুলো কিলুবিল্
করে উঠল বটে, কিন্তু চন্দ্রকূপের জলে ডুবিয়ে মারবার মত এক-আধটা
কেউটে গোথরো জাতের কোনও কিছু খুঁজেই পেলাম না। নাঃ, এই
সামান্য পুঁজি নিয়ে এত তোড়জোড় করে এতদূর আসা ডাহা মূখ্যামি
হয়েছে। আমার ক্ষুদ্রে পাপগুলোর জন্তে ঘরের কাছের গঙ্গাসাগর বা ত্রীধাম
নবদীপই যথেষ্ট হত।

হিসাবটা উল্টিয়ে নিলে অবশ্য লোকসান কিছুমাত্র নেই। চা-বাগানে
ম্যালেরিয়ার বিষ পাছে শরীরে প্রবেশ করে এই ভয়ে আগে থেকে
সপ্তাহে সপ্তাহে কুইনাইন গেলানো হয়। তেমনি যার শরীরে মহাপাপের
বিষ ঢোকেনি সে যদি চন্দ্রকূপ-দর্শনটা সমাধা করে গিয়ে দু'একটা কুলীন
জাতের পাপ করেই ফেলে, তাহলে সেই পাপের ফল নিশ্চয়ই তাকে স্পর্শ
করতে পারবে না। সুতরাং এ জীবনের বাকি দিনগুলোর জন্তে অনেকটা
বেপরোয়া হয়ে চলতে-ফিরতে পারব যদি একবার চন্দ্রকূপ থেকে মশরীরে ফিরে
যেতে পারি। এও কি কম কথা নাকি!

দল থেকে আমরা অনেকটা পিছিয়ে পড়েছি। সেদিকে খেয়াল হতে
পোপটভাই বললেন, “চলুন একটু পা চালিয়ে, নব্বত ওরা নাগালের বাইরে
চলে যাবে।”

অসম্ভব নয়। আমাদের ফেলে রেখে চলে যাওয়া কিছুমাত্র অন্তায় হবে
না ওদের। ওরা যে তীর্থযাত্রী। ওদের এখন একমাত্র লক্ষ্য চন্দ্রকূপ। যে
করে হোক একবার সেখানে পৌঁছে পাপের বোঝাটা ঘাড় থেকে নামাতে পারলে
হয়। এ হেন সময়ে কে রইল পড়ে পিছনে তা দেখবার জন্তে ফিরে তাকাবার
মত দুর্বলতাটা যে হবে অমার্জনীয় অপরাধ।

সামনে নজর করে সমস্ত দলটা দেখতে পেলাম। অগ্নিকুণ্ডের মাঝে স্তম্ভ দিকে ঝুঁকে যেন সত্যিই কি গুরুভার পিঠে নিয়ে চলেছে সব। দেখলাম যেন কালো কাপড়ে জড়ানো এক একটা বিরাট মোট বাঁধা রয়েছে প্রত্যেকের পিঠে। সেইটের ভারেই সকলে সামনের দিকে হুয়ে পড়েছে। বেচারী চন্দ্রকুণ বাবার বরাতটা কেমন! কি চমৎকার উপচার নিয়ে চলেছি আমরা তাঁকে ভেট দিতে। এক এক মোট উৎকট বিবাক্ত কালো কালো পাপ।

আবার কানে এল পোপটলালের স্বর।

“এবার দেখবেন ঐ কুস্তীও আর আপনার মজ ছাড়বে না।”

চমকে উঠলাম। পোপটলান্নাই বলতে লাগলেন, “ঠিক এই-ই হয়। একটা মেয়ের জন্তে কেউ সর্বস্ব পণ করে বসে। হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হয়ে আগুনের মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারপর সেই মেয়েকে যখন হাতের মুঠোর পায় তখন সেই মেয়েই তাকে দেখে সকলের চেয়ে সুগার চোখে। দুটি জিনিস হচ্ছে মেয়েদের কাছে সবচেয়ে মূল্যবান। নিজের জন্তে ইচ্ছাত আর নিরাপদ নিশ্চিত আশ্রয়, আর তার গর্ভের সন্তানের জন্তে সমাজে উপযুক্ত স্থান। প্রবৃত্তির তাড়নার নেশার ঝাঁকে ঘরের বার হয়ে এসে সে দেখে যে, মান ইচ্ছাত শালীনতা সর্বস্ব খুইয়ে বার হাত ধরে সে পথে নামল সে তাকে আর বাই দিক ও-দুটি জিনিস কখনও দিতে পারবে না। আজীবন কাটাতে হবে শুধু ডর বিড়ম্বনা আর মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে। তখন সেই লোকটিই হয়ে ওঠে সেই মেয়ের চোখে সবচেয়ে বড় শত্রু। তারপর স্বযোগ সুবিধা মেলে ত হেঁড়া জুতোর মত সেই লোকটিকে টেনে ফেলে দেয় দূর করে।

“কি দিয়েছে ঐ থিরুমল কুস্তীকে? আপনি বলবেন ঐ মেয়েটার জন্তে থিরুমলের প্রাণটা যেতে বসেছিল। কিংবা হয়ত এও বলতে পারেন যে ঐ মেয়ের জন্তেই থিরুমল আজ পাগল হয়ে গেছে। কিন্তু থিরুমল গেল কেন কুস্তীকে তার বাপের নিরাপদ আশ্রয় থেকে ভাগিয়ে আনতে? এই লাহনা এই নির্বাসন এই নরকযন্ত্রণা ভোগ আজ কুস্তীর ভাগ্যে কিসের

জন্তে ? থিরুমলের সঙ্গে যদি দেখা না হত তাহলে কুন্তী তার বাপের ঘরে যেমন ছিল তেমনই থাকত। কোনও দুর্ভোগ ঘটত না তার কপালে। সেইজন্তেই থিরুমলের চেয়ে বড় শত্রু আজ আর কুন্তীর কাছে কেউ নয়। থিরুমলকে সে আর কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারবে না, কারণ তার নারীত্বের ইচ্ছাতটুকু ঐ থিরুমলের জন্তেই খোয়া গেছে।”

এর জবাবে অনেকগুলো ভাল কথা শোনাতে পারতাম পোপটভাইকে। বলতে পারতাম তাঁর মুখের উপর এই দুনিয়ার একান্ত পবিত্র সব অমূল্য কথাগুলি,—প্রেম ভালবাসা আত্মত্যাগ বিরহ ইত্যাদি। প্রেমের জন্তে কবে কোথায় কখন কি-ভাবে কোন্ কোন্ চিরস্মরণীয় অতুলনীয় আত্মত্যাগ আর বিরহযজ্ঞা ভোগ করে অসন্ত আদর্শ স্থাপন করে গেছেন। ইতিহাস-পুরাণের বিখ্যাত বিখ্যাত নক্সিগুলি টেনে এনে তাঁর চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে অপূর্ব পুলক অঙ্কুর করতে পারতাম। লাড়বরে তাঁকে বুঝিয়ে দিতে পারতাম সহজিয়া পরকীয়া ইত্যাদি সব গুহ্য রসতত্ত্বের অপার মহিমা। একখানা জুতসই গীতও হরত তাঁকে শুনিয়ে দিতে পারতাম যাতে প্রেমিকা প্রেমিকের জন্তে কেঁদে আকুল হয়ে যাচ্ছে : কিন্তু কিছুই করা হল না। তার বদলে স্পষ্ট দেখতে পেয়ে শিউরে উঠলাম পোপটভাইএর মনটার গামর দগ্ধগে বিবাক্ত ঘা। অনর্থক পাছে সেই বাথার স্থানেই আবার আঘাত দিয়ে ফেলি এই ভয়ে চুপ করে রইলাম।

“আমার ভাগ্যেও ঠিক তাই হয়েছিল। সেই রাতের পর থেকেই আমি তাঁর ছ’চোখের বিষ হয়ে উঠলাম। বিপদ থেকে উদ্ধার পেয়ে তাঁকে নিয়ে ত বাড়ি ফিরলাম। মেলা থেকে ফেরবার পথে ডাকাতির হাতে পড়ে তিনটে দিন কি ভয়ঙ্কর অবস্থায় কেটেছে তার লোমহর্ষণ বিবরণ, আর কি অভূত উপায়ে তাদের হাত থেকে আমরা পালিয়ে আসতে পেরেছি তার আশ্চর্য কাহিনী শুনিয়ে আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে রেহাই মিলল। উপোসে আর পথের কষ্টে তাঁর শরীর ভেঙে পড়েছে এই অছিলায় তিনি কয়েকদিন

শুয়ে রইলেন। কোথাও কারও মনে কিছু সন্দেহ হল না। সন্দেহ করবেই বা কে। চিরকালই গ্রামে আর নিজের লোকের কাছে আমি একজন আদর্শ নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের মানুষ। সেই আমি যদি মৃত বড় ভাইএর স্ত্রী আর গ্রামের ছ'চারজন বুড়িকে নিয়ে মেলা দেখিয়ে আনতে যাই তাতে আর সন্দেহ করবার কি আছে। তারপর সেই বুড়ি কটাকে ফাঁকি দিয়ে ছুজনের সরে পড়তে কতক্ষণ লাগে? আগে থেকেই নদীর ধারে একটা ডাঙা ঘর আমার জানা ছিল। সেইখানেই গিয়ে উঠেছিলাম আমরা দুজনে। জনপ্রাণীও সেখানে যায় না। কাজেই দুটো দিন লুকিয়ে থাকতে কোনও বাধাই ছিল না সেখানে। প্রাণ নিয়ে যে বাড়ি ফিরে এসেছি আমরা এই আনন্দেই সকলে উন্মত্ত হয়ে উঠল।

“সবই সব দিক থেকে যেমন আশা করেছিলাম সেই রকমটি হয়ে গেল। আবার আমার মনে কল্পনার বড় ধরতে শুরু করল। তখনই আবৃত্ত হল আসল খেলা। তিনি আর আমার ছায়া পর্বত সহ করতে পারলেন না। দূর থেকে কি উপায়ে কত রকমে সকলের চোখে আমার ছেয় করা যায়—সর্বদা সেই চেষ্টা করতে লাগলেন। অন্য সমস্ত সংস্কৃতির সঙ্গে যেয়েদের একটি আশ্চর্য শক্তি আছে যা কোনও পুরুষ কখনও আয়ত্ত করতে পারবে না। সে শক্তিটি হচ্ছে নিজের ভালমাহুবি বোল-আনা বজায় রেখে দূর থেকে নানা উপায়ে শত্রুতা করে আলাদা। এ বিভ্রাট মেয়েরা কষ্ট করে বহু বড়ে শেখে। যে হতভাগার উপর এই বিভ্রাট পরীক্ষা-প্রয়োগ চলে তার অবস্থা হয় শোচনীয়। মুখ বুজে শুধু মার খেয়ে যাও। মুখ খুলেছ কি মরেছ। তৎক্ষণাৎ চারিদিক থেকে সকলে একবাক্যে বলে উঠবে, তোমার চেয়ে নীচ তোমার চেয়ে হীন নরাত্ম আর ছুনিয়ার ছুটি নেই। এ ছুতোগে যে কখনও পড়েনি সে বুঝবে না সেই বর্ণচোরা শত্রুতার স্বরূপটি কি।

“মুখ বুজেই মার খেয়ে চলেছিলাম আমি। চিরকাল তাই চলতাম। কখনও ধৈর্যের বাধ ভাঙত না আমার। কিন্তু সবচেয়ে চরম শত্রুতা বা তাই

তিনি করে বসলেন। আমাদের বংশের মুখে কালি লেপে দিলেন। আমার বাপ-ঠাকুরদা চোদ্দপুরুষের উচু মাথা হেঁট করলেন। করবেনই ত, তাঁর কি দোষ। সেই বংশেরই বংশধর আমি—আমিই ত তাঁকে সর্বনাশের পথে টেনে নামিয়েছি। কেন তিনি প্রতিশোধ নিতে ছাড়বেন।”

অসহ্য কোণ্ডে পুনরায় পোপটভাইএর কণ্ঠ কড়কল। অনেকক্ষণ পরে আন্তে আন্তে বিজ্ঞাসা করলাম, “এখন আপনার বৌদি কোথায়?”

নিশ্চয় দৃষ্টিতে আমার দিকে চাইলেন পোপটভাই।

“নাগালের বাইরে। একেবারে ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। এখন তিনি অনেক উচুতে উঠে গেছেন। আমাদের কুমার সাংগেবের সবচেয়ে বড় বাইজী এখন তিনি। কত নামডাক এখন তাঁর। নাচ জানেন গান জানেন। দেশ-সুখ লোক বলাবলি করছে—অমুক বাইজী অমুক বাড়ির বড় বৌ। এই কথা শুনে শুনে আমার বাবা মারা গেছেন। আমি যখন মরব তখনও লোকে আমাদের বাড়ির বড় বউএর খ্যাতি গাইবে। আমার মা প্রায় পাগল হয়ে আছেন। দেশে আজ আমরা একঘরে। এ সমস্তর জন্তে আমিই দায়ী। দায়ী। আমিই সংসারে এই বিষ ঢুকিয়েছি, উঃ!”

এর পর পোপটলাল সত্যিই সজোরে পা চালালেন। চক্ৰকূপ যে তাঁকে পৌছতে হবেই তাড়াতাড়ি।

একাই চলেছি। অনেকটা আগে এগিয়ে গেছে সকলে। মাঝে মাঝে চোখ তুলে দেখছি ওদের। বোদের ঝলকানিতে এতদূর থেকে ওদের দেখাচ্ছে যেন একটা লম্বা সরীসৃপ-জাতীয় প্রাণী। উট দুটো সামনে থাকায় মনে হচ্ছে যে, প্রাণীটা মাথা উচু করে বুকে হেঁটে এগিয়ে চলেছে। আরও অনেক সামনে অল্পস্র বজ্রকুণ্ড জালা হয়েছে। কুণ্ডলী পাকিয়ে সাদা ধোঁয়া সেই সমস্ত কুণ্ড থেকে উঠে আকাশ স্পর্শ করেছে। তার ওধারে আর দৃষ্টি পৌছয় না। ঐ ধোঁয়ার ঘবনিকার অন্তরালে বলে কে জানে কোন্ অয়েজর আবার নতুন

করে সর্পযজ্ঞ আরম্ভ করেছেন—যাঁর মস্তকের অমোঘ অনিবার্হ আকর্ষণে ঐ বিরাট সন্ন্যাসপট্টা আশ্রয় চেষ্টায় অগ্রসর হচ্ছে তাঁর সেই যজ্ঞকুণ্ডে ঝাঁপিয়ে পড়ে পুড়ে মরবার জন্তে। আমিও চলেছি সন্ন্যাসপট্টাকে দূর থেকে অমুসরণ করে যজ্ঞের পূর্ণাহুতি দেখবার আশায়।

যজ্ঞস্থানে পৌঁছে কতটা সমারোহ-কাণ্ড দেখা ভাগ্যে জুটবে এই চিন্তায় অনেকটা অন্তমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম; হঠাৎ চমকে উঠে মুখ তুলে দেখি কে একজন ফিরে আসছে। কি হল আবার ওর! কাছাকাছি হতে চিনতে পারলাম—আমার ছড়িদার পণ্ডিত রূপলাল ঠাকুর করাচীওয়ালে। বত্ৰিশখানা দাঁত বার করে নীরবে সামনে এসে দাঁড়াল,—হাতে এক লোটা পানি।

আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, “কি ব্যাপার—আবার ফিরে চলেছ কোথায়?”

সলজ্জ স্বরে বললে, “আপনার অন্তে জল নিয়ে এলাম। বড্ড শিহ্নিয়ে পড়েছেন। হয়ত তেঁটোও পেয়েছে আপনার।”

চেয়ে রইলাম ওর মুখের দিকে। এ কি সেই রূপলাল, যে আজ ভোরেই আমায় চোখ রাড়িয়েছে, যে বিন্দুমাত্র বিধা না করে তারিই সমবয়সী তারই জুড়িদার আর একজনকে বিসর্জন দিয়ে চলে এল অবলীলাক্রমে!

পকেট থেকে এক ডেলা মিছরি আর কয়েকটা খেজুর বার করে দিয়ে রূপলাল বললে, “নিন্—জল খেয়ে নিন্। এখনও অনেকটা যেতে হবে। একেবারে চন্দ্রকূপের কাছে গিয়ে তবে আমরা আজ থামব।”

নিলাম। তেঁটার পায়ের নখ পর্যন্ত শুকিয়ে টা টা করছিল। মিছরির ডেলাটা চিবিয়ে লোটার সবটুকু জল গলায় ঢেলে দিয়ে আবার ওর মুখের দিকে চাইলাম। ওর মুখে চোখে তৃপ্তির হাসি ফুটে উঠেছে।

বিড়ি ধরিয়ে নিয়ে আবার হাঁটা আরম্ভ হল। এবার আমার ছড়িদার আমার পাশে। এতক্ষণ পরে কি বেন কেন মনটা বেশ হাকা হয়ে গেল। সকাল থেকে এতক্ষণ একটা দীর্ঘ দৃশ্য দেখছিলাম, সেটার হাত থেকে মুক্তি পেলাম। মহাতীর্থ হিংলাজ বর্ননে চলেছি আমি, আমার পাশে আমার পাশা,

আমার এই তীর্থপথের কাণ্ডারী, যে আমাকে হিংলাজ দর্শন করিয়ে কিরিয়ে নিয়ে যাবে করাচীর সেই নাগনাথের আশ্রয়। হোক সে বয়সে ঢের ছোট, নেহাৎ লম্বীছাড়ার মত হলেই বা তাকে দেখতে, টানলই না হয় সে ছিলিমের পর ছিলিম। তবু এখানে এই তীর্থপথে এই ছোকরাই আমার একমাত্র বন্ধু, সবচেয়ে বড় আপনাত্মক। তাই ত পিছিয়ে পড়েছি বলে ওকে ফিরে এসে টেনে নিয়ে যেতে হচ্ছে আমাকে। এ আমাকে যেখানে নিয়ে গিয়ে যা দেখাবে তাই হবে আমার কাছে মহাতীর্থ। যে কোনও উপাখ্যান যে ভাবেই বোঝাক, যে কোন মন্তব্য যে রকম উচ্চারণ করেই পড়াক, তার বিচার করবার আমি কে? একবার যখন ওর হাতে সমস্ত সঁপে দিয়েছি তখন আমার একমাত্র কর্তব্য ভাল মন্দ সব কিছুই তার ওর হাতে ছেড়ে দেওয়া—ওকে বিশ্বাস করে ওর আদেশ শিরোধার্য করে তীর্থ করে ফেরা। অবিশ্বাস সংশয় বিচারবুদ্ধি শুধু যত্নশূন্যই বাড়াবে। শাস্তি পাব না। তীর্থযাত্রা বিফল হবে আমার।

পাশে চলতে চলতে রূপলাল চীৎকার করে উঠল, “হিংলাজ রানী মাতা কি—”

সামনে থেকে সকলেই একযোগে উত্তর দিলে ওর ডাকে—“জয়!”

আরও জোরে পা চালালাম।

“ও কি। কি ও?”

আচম্বিতে আতর্জন করে উঠলেন ভৈরবী। সামনে বহুদূরে অসাধারণ কিছু দেখতে পেয়েছেন তিনি উটের উপর থেকে, যা দেখে তাঁর বাহুজ্ঞান হারিয়েছে। কাঁঠ হয়ে চেয়ে আছেন দু চোখ মেলে। তাঁকে আঁকড়ে ধরে কুন্তীও সেইভাবে চেয়ে আছে সামনের দিকে।

টেঁচিয়ে উঠলাম নীচে থেকে, “কি হয়েছে—কি দেখছ অমন করে?” কোনও উত্তর নেই। আমার কথা কানেও গেল না ওদের। ছুজনেই যেন পায়ণ হয়ে গেছে।

অনেকটা আগে বড় উঁট নিয়ে চলেছে গুলমহম্মদ। আরও কয়েক পা এগিয়ে একটা বালির টিলার উপর পৌঁছল সে, সঙ্গে সঙ্গে অভূত একটা আওয়াজ করে উঠল। তারপর একটানে মাথার পাগড়িটা খুলে আছড়ে ফেললে পায়ের কাছে। উঁটের দড়ি আর টাঙিখানা তার হাত থেকে খসে পড়ল। হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল সে বালুর উপর।

রূপলাল ছুটে গেল তার পাশে। গিয়েই চোঁচিয়ে উঠল, “বাবা চম্ভকূপ বামী!” কথাটা শেষ হবার আগেই উগুড় হয়ে শুয়ে পড়ল সে।

চম্ভের নিমেষে সবাই কাঁধের কুঁজো নামিয়ে লুটিয়ে পড়ল অগ্নিজলন্ত বালুর বুকে। একেবারে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম।

মাথার পাগড়ি খুলে দিলমহম্মদ বসে পড়ল উর্বশীর পায়ের কাছে। একা আমি থ হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। সামনে পিছনে কোনও দিকে পা বাড়াবার উপায় নেই। চারিদিকে সবাই নিচুমুখ হয়ে পড়ে আছে টান টান হয়ে।

আবার ধমক দিলাম ভৈরবীকে, “হয়েছে কি? দেখছ কি তুমি অমন করে?”

কোনও জবাব দিলেন না তিনি, তবে কাজ হল। হাঁশ ফিরে পেয়ে ছু হাত জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে চোখ বুজে রইলেন। তাঁর দেখানেশি কুস্তীও।

একে টপকে ওকে ডিঙিয়ে গুলমহম্মদের পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। দাঁড়িয়ে মুখ তুলে চেয়ে দেখি—

যা দেখলাম তা দেখে ভয়ে বিষয়ে আমিও কাঁঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। হয়ত উচিত ছিল তখনই সাষ্টাঙ্গ লুটিয়ে পড়া। কিন্তু তা আর আমার ভাগ্যে হয়ে ওঠে নি। উচিত-অনুচিতের ঐশ্বর্যই তখন উঠতে পারে না। বিচার-বিবেচনা করে মন আর বুদ্ধি। এমন কিছু দেখছি দুচোখ দিয়ে বার লেশমাত্র ধ্যান-ধারণা ছিল না মনের কোণেও। সে দৃষ্ট চোখে পড়ার সঙ্গেই চিন্তাবৃত্তি নিকল হয়ে গেছে। কণেকের ভয়ে হলোও, অথ দুঃখ আনন্দ অহুত্ব—সবকিছুর হাত থেকে পরিজ্ঞান পেয়ে এক অপার্থিব মহাজিজ্ঞাসার বাবে

ভূবে গেলাম। হারিয়ে ফেললাম নিজেকে সেই মুহূর্তে। চোখ দিয়ে—তুধু চোখ দিয়ে নয়—সংগ দিখে সর্বেক্সিয় দিখে গিলতে লাগলাম দৃষ্টির শেষ সীমার আকাশের গারে আঁকা সেই ছবিখানি।

ছোট বড় মেজ মেজ অনেকগুলি নৈবেদ্য সাজানো রয়েছে সেখানে। ঝাঁর উদ্দেশ্যে সাজানো হয়েছে ওগুলি তাঁর পায়ের তলা স্পর্শ পাবার আশায় নৈবেদ্যের চূড়াগুলি ধোঁয়াটে মেঘ ভেদ করে উঠে গেছে আকাশেও মধ্যে। তুণুলী পাকিয়ে উঠছে ধোঁয়া ওখান থেকে। তা দেখে বেশ আনন্দ করা যায় কি পরিমাণ ধূপ ধূনা পোড়ানো হচ্ছে ওখানে। কিংবা হয়ত বিরাট বন্ধ হচ্ছে। ধরিত্রীর একেবারে শেষ প্রান্তে ঐ নিভৃত স্থানটি খুঁজে বার করে তামাম জীবজগতের দৃষ্টির অন্তরালে যারা ঐ পূজা অহুষ্ঠানের বিপুল আয়োজন করেছেন—ভাল করে নজর করেও এতদূর থেকে তাঁদের কাকেও দেখতে পাওয়া গেল না। কিন্তু কেমন একটা আতঙ্কে বার বার বৃকের ভিতর কঁপে কঁপে উঠল।

কারা করছেন ঐ অহুষ্ঠান? কোন্ দেবতার তুষ্টির জন্তে ঐ অমাত্যবিক আয়োজন? কি উদ্দেশ্যে এত সজোপন? কি মন্ত্র উচ্চারিত হচ্ছে ওখানে? কোন্ মহাবলি নিবেদন করা হবে ঐ পূজায়?

ঐ চন্দ্রকূপ। অথবা ওখানেই চন্দ্রকূপ। ঐ চন্দ্রকূপের অধীশ্বর সকলের সর্বপাপ নিঃশেষে হরণ করেন। আর তা করেন বলেই তাঁকে এই নিরাশার সকলের ধরা-ছোঁয়ার নাগালের বাইরে পালিয়ে এসে ধুনি জ্বালাতে হয়েছে। ছুনিয়ার পাপস্রোত নিরন্তর গড়িয়ে এসে পড়ছে তাঁর ধুনিতে। সেই হচ্ছে চন্দ্রকূপ স্বামীর ধুনির হবি। তারপর সেই পাপ ধোঁয়া হয়ে ধোঁয়ার সঙ্গে মিশে যাচ্ছে অনন্ত আকাশের গারে। মেঘ হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে সারা জগতে। জল হয়ে নামছে মাছুষের মাথায়। পড়ছে শত্রু-কসলের উপর। তাই খাচ্ছে সবাই জীবনধারণের তাগিদে। কলে পাপই জন্মাচ্ছে আবার তাদের রক্ত-বাংস থেকে। সেই পাপ আবার হড় হড় করে এসে পড়ছে চন্দ্রকূপ দেবতার

ধুনিতে। সৃষ্টির কোন্ আদিকালে এই অখণ্ড অনিবাণ যজ্ঞাগ্নি জ্বলি হয়েছে, আজও তা জ্বলছে সমানে। অনাগত অন্তহীন ভবিষ্যৎ জুড়ে জ্বলতে থাকবে এই ধুনি। কখনও কোনও কালে ক্ষয়িবৃত্তি হবে না এই বৈশ্বানরের। নিরবচ্ছিন্ন হবিস্রোত চাই আত্মতির জন্তে। স্মৃতরাং পাপীরা চিরকাল জন্মাবেই। নম্রত মহাকালের এই মহাপ্রয়োজন সিদ্ধ হবে কি করে।

কিন্তু যদি কেউ প্রাণের মায়া ত্যাগ করে একবার এসে পড়তে পারে এখানে, এসে একটিবার স্পর্শ করতে পারে এই যজ্ঞাগ্নি, তবে তৎক্ষণাৎ সে হবে অগ্নিশুদ্ধ নিম্পাপ জ্যোতিমান, আনন্দের সন্তান। তার তখন অধিকার মাতৃদর্শনের। ব্রহ্মরন্ধ্রের মহাপীঠে সে তখন জ্যোতির্দর্শন করতে পারবে। জ্যোতিঃস্বরূপিণী আনন্দময়ী জননী—পাপপুণ্য প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি জ্ঞান-বিচার এ সবার ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। সেই মাতৃলোকের দ্বার জুড়ে এই ধুনি জ্বলছে মহাকাল। আজ আমরা অগ্নিশুদ্ধ হব। আনন্দের সন্তান হতে চলেছি আমরা। আজ আমাদের নবজন্ম লাভের পরম কণটি সমুপস্থিত।

নিজের অজ্ঞাতে কখন হাঁটু গেড়ে বসে পড়েছি বালুর উপর—কখন উঁচু মাথা নিচু হয়ে পোড়া কপালটা ঠেকেছে পোড়া বালুর উপর—এ সমস্ত কিছুই টের পাইনি। শুধু মনে আছে তখন একটি মাত্র মন্ত্র সমস্ত রক্তের মধ্যে ছুটোছুটি করে বুকের মধ্যে তোলপাড় লাগিয়েছিল। সেই মহামন্ত্রটি হচ্ছে—মা।

এসে যে আমরা পৌঁছেছি এ সংবাদ বার বার গলার জোরে পৌঁছে দেওয়া হল চন্দ্রকূপ স্বামীর দরবারে। বুক ফাটিয়ে বার বার জয়ধ্বনি দেওয়া হল চন্দ্রকূপ বাবার। একে অপরকে জাপটে ধরে হাউমাউ করে কানতে লাগল। কেউ বা বুক চাপড়ে খেই খেই করে নাচতে লাগল। জন ছুই সেই যে উপুড় হয়ে শুয়েছে আর ওঠেই না।

ইতিমধ্যে উর্বশীকে বসিয়েছে দিলমহম্মদ। কুস্তীকে নিয়ে ভৈরবী নেমে

পড়েছেন। আর উটের উপর চড়ে এগোনো চলতেই পারে না। সে স্পর্ধা থাকেও একান্ত অহুচিত। ঐ দীনহুনিয়ার মালিক দীনবন্ধু দয়ালের দরবারে দীনহীনের মত পারে হেঁটে যাওয়াই প্রয়োজন। দেহ মন আত্মা জুড়িয়ে যাবে তাঁর কল্যাণস্পর্শে। যে দুর্বীর পিপাসা নিয়ে জন্মেছি, যা বুকে নিয়ে এতদিন ছুটে মরছি, আজ হবে সেই অনন্ত পিপাসার শান্তি। করুণাময়ের আশির করুণাধারায় স্নান করে জীবনের সকল জালা আজ জুড়োবে। চল, এগিয়ে চল আর একটু।

কিন্তু এ আবার কি! ওরা হুজন বে ওঠেই না!

ওরা দণ্ড খাটতে খাটতে যাবে।

যেখান থেকে চন্দ্রকূপ প্রথম দর্শন হবে সেখান থেকে দণ্ড খাটবে চন্দ্রকূপ পর্বত—এই মানত করে ওরা রওয়ানা হয়েছে বাড়ি থেকে। উপুড় হয়ে শুয়ে পড়বে হাত দুটো মাথার দিকে সোজা করে দিয়ে। হাত যে পর্বত পৌঁছল সেখানে একজন বালির উপর দাগ টানবে। তখন উঠে হেঁটে সেই দাগ পর্বত পৌঁছে আবার উপুড় হয়ে পড়বে। তখন আবার দাগ টানা হবে। এইভাবে শুতে শুতে ওরা যাবে চন্দ্রকূপ পর্বত।

ব্যাপারটা মাথায় রাখল তখন শিউরে উঠলাম ভয়ে দুর্ভাবনার। ওরা যে বললে যাবে। বড় বড় ফোফা পড়বে ওদের মুখে হাতে সর্বাঙ্গে। কিন্তু কে যাবে ওদের বারণ করতে? আর বারণ ওরা শুনবেই বা কেন? কার আছে এতবড় বুকের পাটা যে দেবতার মানত শোধ না দিয়ে তাঁর যোষবহিতে জলে পুড়ে থাক হবে।

অতএব তারা ঐভাবেই চলল। সঙ্গে দাগ টানতে টানতে চলল পাণ্ডা রূপলাল ঠাকুর ছড়িওয়াল। আমি দুই চোখ বুজে মনে মনে বার বার কমা চাইলুম চন্দ্রকূপ বাবার কাছে।—

“হে দেবতা, তুমি এদের কমা কোরো। যারা তোমার করুণাময় স্বরূপটি বুঝতে পারল না তাদের তুমি দণ্ড কোরো দয়াময়। খানিকটা আত্মতৃপ্তি ওরা

পাবে এই নিষ্ঠুর আত্মপীড়নের কলে। হয়ত তাতে কিছুটা আত্মমানির উপশম হবে ওদের। কিন্তু এই মিথ্যা আত্মতৃপ্তি লাভের মোহে ওরা তোমাকে কোথায় নামিয়ে আনছে তা বোঝবার শক্তিও ওদের নেই। চিরকাল ওরা পরের কাছ থেকে পেয়েছে নিষ্ঠুর নির্ধাতন। নিজেরাও অন্তকে দিয়েছে নির্দয় আঘাত। একমাত্র নৃশংসতা ছাড়া অন্য কিছু ওরা জানেও না বোঝেও না। সেই উপচারেই তোমায় তুষ্ট করতে চায় ওরা। ওরা যে তোমায় আত্মবৎ কল্পনা করেছে। নির্ধাতন করে ওরা চিরকাল আনন্দ পেয়েছে বলেই তোমাকেও একজন চরম নিপীড়নকারী বলে ওদের ধারণা হয়েছে। তাই এই বীভৎস আয়োজন তোমার অকুণ্ঠ লাভের আশায়। একমাত্র তুমিই এদের এই মহাত্ম্য থেকে মুক্তি দিতে পার। কে এদের বোঝায় যে তুমি জমিদারের নায়েব মশায় বা থানার দারোগা সাহেব নও।”

কতক্ষণ চোখ বুজে হাঁটছিলাম খেয়াল ছিল না। আর কেনই বা ছুচোখের জল গড়িয়ে নামছিল বুকে তাও আজ সঠিক বলতে পারব না। কানে এল—

“কেন কঁাদছেন?”

চোখ মেললাম আর তখন খেয়াল হল যে আমার চিরকুট চোখে শ্রাবণের ঢল নেমেছে। একটু লজ্জায় পড়ে গেলাম বৈ কি। মুখ ফিরিয়ে দেখি, পাশে কুস্তী। তখনও সে চেয়ে আছে আমার মুখের দিকে। আবার জিজ্ঞাসা করলে চাপা গলায়, “কেন কঁাদছেন?”

এ ‘কেন’র জবাব দেওয়া সহজ নয়। সব সময় সব ‘কেন’র জবাব কি দেওয়া সম্ভব? তাহলে সমস্তা বলে কোনও কিছুর অস্তিত্বই থাকত না যে জন্মিয়ায়। মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্রই সকলে সর্বাগ্রে কেঁদে ওঠে কেন? কেউ কি কখনও শুনেছে না দেখেছে যে, খিলখিল করে হাসতে হাসতে কোনও শিশু পৃথিবীতে শুভ পদার্পণ করছে?

তেমনি আমার সেদিনকার অহেতুক চোখের জলের যেমন কোনও মানে খুঁজে পাই না তেমনি সে পোড়া চোখের জল পড়া সহজে বন্ধ হতেও চাইল

না। কি জানি কেন বার বার মনে হতে লাগল যে চন্দ্রকূপের দেবতাও ওই ওখানে একলা বসে অশ্রুবিগর্জন করছেন নীরবে। এই মূঢ় মানুষ দুটির দিকে অসহায় আকুল দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন তিনি। এদের এই অমানুষিক আত্মলীড়নে তাঁর বুক হাহাকারে ভরে উঠছে। বার বার গুমরে গুমরে বলছেন তিনি, “ওরে না না না, হুঃখ দিয়ে আর হুঃখ পেয়ে আমাকে তুট করেতে চান নে তোরা। তোদের এই দানবীয় ভক্তির অত্যাচার আর আমার সহ্য হয় না। ও সব সহ্যবার আমার শক্তি নেই বলেই এখানে ছুনিয়ার এই শেষ প্রান্তে পালিয়ে এসেছি আমি। এখানেও কি তোরা আমার রেহাই দিবি না যে। এখানেও তাড়া করে এসে আমাকে জালা দিচ্ছিস তোরা। তোদের এই বান্ধুলে ভক্তি-দেখানোটা বন্ধ করে আমায় শান্তি দে এবার।”

স্পষ্ট দেখতে পেলাম চোখ বুজে—জটাভূটধারী, কপালে অর্ধচন্দ্র, পরনে বাথছাল—এক জ্যোতির্ময় কমান্ডারের পরম দেবতাকে। দুটি অল্পময় আঁখি হতে মুক্তার মত বড় বড় ফোঁটা গড়িয়ে পড়ছে তাঁর বুকের উপর। অসহ্য বস্ত্রণায় তিনি একেবারে আড়ষ্ট নীল হয়ে গেছেন।

আবার শুনতে পেলাম পাশ থেকে—“কাদবেন না আপনি। অনর্থক চোখের জল ফেলছেন কেন? সে আসবে, ঠিক আসবে। দেখবেন আমার কথা সত্যি হয় কি না।”

কুস্তী! এ হতভাগীর আর অন্য কোনও চিন্তা নেই। এ শুধু আপন হুঃখ-সাগরেই হাবুডুবু খাচ্ছে। কিসকিসিয়ে বলতে বলতে চলল কুস্তী আমার পাশে পাশে—“এত সহজে কি রেহাই পাব নাকি আমি তার হাত থেকে? এখনও হয়েছে কি আমার? কতটুকু হয়েছে? আজীবন আমাকে নরক-বস্ত্রণা ভুগতে হবে যে। কুকুরে শেয়ালে আমাকে নিয়ে ছেঁড়াছিঁড়ি করবে তবে না আমার কাজের উপযুক্ত ফল মিলবে। কি দেখে, কার উপর নির্ভর করে আমি খর ছেড়ে পথে নেমেছি? বাপ-মায়ের মুখে কালি মাখিয়ে দিয়েছি কিসের লোভে? তার ফল ভুগতে হবে না আমাকে? কিসের অভাব ছিল

আমার? আজ আমার কোথার আশ্রয় মিলবে? কুষ্ঠব্যাধি হয়েছে যে আমার সর্বক্ষে—আমাকে ছোঁবে কে? শুধু ওই আমার ছোঁবে, আর ওর মত আমার হাড় মাংস নিয়ে যারা ছেঁড়াছেড়ি করবে তারাই আমার ছোঁবে। তার জন্তে আপনার চোখের জল পড়ছে—পড়বেই ত। সে যে পুরুষমানুষ, তার ত কোনও অপরাধ থাকতে পারে না। সব দোষ সব অপরাধ আমার—কারণ আমি মেয়ে হয়ে জন্মেছি। শুধু শুধু আর কঁাদবেন না আপনি। সে ঠিক এসে পৌঁছবে। না এসেই পারে না। যতক্ষণ আমার এই হাড় রক্ত মাংস আছে ততক্ষণ সে এর লোভ ছাড়তেই পারে না। তা সে পাগলই হোক আর বাই হোক।”

এবার জল পড়তে লাগল কুস্তীর চোখ দিয়েও। কোনও কথা না বলে তার কাঁধে একটা হাত তুলে দিলাম। সে ফোঁপাতে লাগল। কাঁদুক খানিক। পড়ুক চোখের জল এই বালুর উপর। তাতে যদি জুড়ার ধরিত্রীর অল তাহলে ওর বুকের জ্বালাও নিশ্চয়ই জুড়াবে। অন্য কারও চোখের জল পড়তেই পারে না ওর জন্তে। এতটুকু সহানুভূতির বিন্দুমাত্র আশা ও করতে পারে না কারও কাছে। খেচ্ছার সমাজ স্বজাতি আশ্রয়ন সবকিছু ছেড়ে আজ ও এমন জায়গার নেমে এসে দাঁড়িয়েছে যেখানে সবকিছুর জন্তেই মূল্য দিতে হয়। এটুকু ও নিজেই সবচেয়ে ভাল করে বোঝে। তাই আজ ও কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারে না যে, সম্পূর্ণ অকারণ এবং কিছুমাত্র প্রত্যাশা না করেই এই তীর্থযাত্রী দলের সবকটি লোক ওর হিতাকাজী। আমরা সকলেই মরণের মুখগহ্বরের মাঝে ঘুরে বেড়াচ্ছি। এ সময় কোনও শব্দ কোনও বাসনাকামনা কারও মনে আসতেই পারে না। তাছাড়া সকলেই এখানে এসেছে জ্ঞান কবুল করে নিজের নিজের বুকের তার নামাতে। তবুও-যে কেউ ওকে এখানে ফেলে যেতে চায় না তার কারণ সকলেরই যা বোন কন্যা ঘরে আছে। কোনও রকমে ওকে নিয়ে করাচী পৌঁছতে পারলে হয়। তারপর বা থাকে হোক ওর কপালে। আমরা কেউ ফিরেও দেখতে বাব না।

ঠিক সামনেই চলেছেন ভৈরবী—তার চোঁট নড়ছে। ডান হাতের কঙ্গি পর্যন্ত জপমালায় লাল ফুলিটির মধ্যে ঢোকানো। ফুলিফুল হাতটি বুকের কাছে ধরা রয়েছে। বাঁ হাতখানি সুখলাগের কাঁধে। অর্থাৎ এখনও ইষ্টমন্ত্রটা ভোলেন নি তিনি। এটাও মহাজ্ঞ কথ্য নয়।

অনেকে গুর করে ভজন গাইতে গাইতে চলেছে। দীর্ঘকার গোকুলদাস সবার আগে চলেছে লম্বা লম্বা পা ফেলে। চিরঞ্জীর সঙ্গে আড়াআড়ি ভাবটার নিশ্চিন্ত হয়ে গেছে। ছোটো কুঁজোই বইছে চিরঞ্জীলাল। কে জানে আর কোনও খাবার জিনিস লুকোনো আছে কিনা গোকুলদাসের কাছে।

চলেছেন পোপটভাই মাথা হেঁট করে। পিছন থেকে আজ তাঁকে দেখলাম এক নূতন দৃষ্টিতে সকলের সঙ্গে থেকেও এ ব্যক্তি সম্পূর্ণ একক, সঙ্গীহীন। মুখ বুজে ইনি নিজের বোঝা বয়ে নিয়ে চলেছেন নিঃশব্দে। সে বোঝার অংশ নেবার শক্তিও নেই অপর কারও। চন্দ্রকূপে পৌঁছে বিসর্জন দেবেন সেই জঞ্জালের পুঁটলিটি। তখন ভারমুক্ত হবেন পোপটভাই। স্বচ্ছ দৃষ্টিতে দেখতে পাবেন ছনিয়ার সব কিছু। সেদিন হাসিমুখে সকলের বেমনার ভার খেঁচায় কাঁধে তুলে নেবেন পোপটভাই। সেই পোড়খাওয়া পোপটলালের ছায়ায় তখন লোকে এসে আশ্রয় নেবে শান্তির আশায়। বহর হুঃখ দূর করবেন ইনি,—অনেকের ভার বইবেন নিজের কাঁধে। সার্থক শুভকর হবে মাতৃদর্শন পোপটভাইএর।

ক্রমে সামনের দিক্চক্রবাল আরও স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল। সেখানের আকাশচূর্ণী নৈবেদ্যগুলির ধূসর রঙ গাঢ় হতে হতে মাটির রঙ হয়ে ধরা দিল চোখে। এতদিন পরে সত্যিই এবার খাঁটি মাটি দেখতে পেলাম। পায়ের তলার বালু কমতে কমতে ক্রক কঠিন মৃত্তিকায় পরিণত হল। এখানে ওখানে নরয়ে পড়তে লাগল সবুজের আভা। আরও কমে এল মাটির কর্কশতা। শেষে আমরা চলতে লাগলাম নরম মাটির উপর দিয়ে। সেই মাটির ছোঁয়ায়

শরীর মন জুড়িয়ে গেল। ছুপাশে কচি কচি পাতা বেরুনো কাঁটার ঝোপ দেখে উর্বশী আর তার মা চকল হয়ে উঠল। পায়ের তলায় কাঁটার দংশন অসুভব করে অনেকদিন পরে আবার সর্বশরীর সিরসির করে উঠল। মাঝে মাঝে দেখা গেল ছোট ছোট খানা ডোবা গর্ত। সেই সব গর্তের তলায় জল দেখে অনেকে তা আঁজলা করে মাথায় মুখে দিতে গেল। তাতে ঘটল আর এক বিভ্রাট। জলে গন্ধকের গন্ধ—এমনই বিটকেল গন্ধ যে কুঁজোর জল খরচ করে মুখ হাত ধুয়ে ফেলেও সে গন্ধ গেল না। কাজেই সেই জলের লোভ সংবরণ করে আমরা এগিয়েই চললাম সামনে। শেষে যখন সেদিনের শেষ আদেশ শোনা গেল গুলমহম্মদের কাছ থেকে, তখন চন্দ্রকূপের বিপরীত দিকে সূর্যদেব আন্তে আন্তে নেমে যাচ্ছেন—আর আমাদের সামনে সেই নৈবেদ্যগুলির ওপর কারা বেন রাশি রাশি আবীর ঢেলে দিচ্ছে। তীর্থযাত্রীদল ঘুরে দাঁড়িয়ে অন্তাচলগামী বিভাবত্বকে জোড় হাতে প্রণাম করলে অনেক দিন পরে।

অনেক দিন পরে।

অনেক দিনই বটে। মানে, আজকের এই রাতটি হচ্ছে একাদশ রাত। আজ থেকে ঠিক দশরাত্রির আগের যে রাত সেই রাতে আমরা এই মাহুঘ ক'জন হাব নদীর ধারে এসে যখন বসলাম তখন আমাদের বুকের মধ্যে সে কি প্রবল উত্তেজনা, রক্তের তালে তালে সে কি বিচিত্র স্বপ্ন। তখন আমরা একে অপরকে চিনতামও না। তবু কেউ কাউকে পর বলে ভাবতে পারি নি। সেই রাতে ত্রিশ জন মাহুঘের এক চিন্তা এক সঙ্কল্প এক মন এক প্রাণ। ত্রিশ জনে সেদিন এক হয়ে গিয়েছি। একজন কিছু বললে অপরের কানে তা মধুবর্ষণ করেছে। কখন রাতটা পোহাবে, কখন নদী পার হবে আর প্রকৃত রাজ্য আরম্ভ হবে, এই উৎকণ্ঠায় সে রাতে আমরা কেউ চোখের পাতা এক করি নি। তখন দেহ মন প্রাণ সব কিছু হালকা সোনার মত মনে হচ্ছিল। নদীটা একবার পার হতে পারলেই হয়, একেবারে পাখার মত উড়ে গিয়ে

পৌছিব হিংলাজ । পথের দুঃখকষ্টের কথা সেদিনও বেশ ভাল করে জানা ছিল । রক্ত মাংস অস্থি মজ্জা দিয়ে যেটুকু সান্ধাৎপরিচয় ঘটেছে এই দশ দিনে পথের সঙ্গে, তার চেয়ে শতগুণে ভয়াবহ ছিল এই পথ তখন আমাদের মনে । তবুও সেই রাতে কারও মন টলে নি, পা কাঁপে নি, চোখের পাতা ভিজে ওঠে নি । অদেখাকে দেখার, না-জানাকে জানার দুর্নিবার আকর্ষণে তখন আমাদের বন্ধ মাতালের অবস্থা । বাঁধন হেঁড়ার জন্তে দেহের মধ্যে রক্ত টগবগ করে ফুটছে তখন আমাদের ।

সেই রাত বখাসময়ে প্রভাত হল, হাব নদী পেরিয়ে এগারে এসে ‘বাঁধন হেঁড়ার সাধন’ সমাধা করে আমরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম । কিন্তু তারপর ?

তারপর জুড়াতে জুড়াতে জুড়িয়ে একেবারে হিম হয়ে গেল দেহের রক্ত, তার সঙ্গে বত উচ্ছ্বাস উদ্দীপনা । উহ—ঠিক হল না—বলা উচিত, শরীর মন প্রাণ সমস্ত শুকিয়ে গেল—একেবারে রসকম্পশূন্য ছিবড়ে হয়ে গেল শুকিয়ে । কোথায় গেল সেই উত্তম উৎসাহ আর কোথায়ই বা গেল সেই তড়পানো ! এখন পা আর ওঠে না, ঘাড় আর সোজা হয় না, পলা দিয়ে আওয়াজও যার হয় না ভাল করে । এখন আমরা একে অপরের মুখ দর্শন না করতে পারলেই বাঁচি । কারও কথা কানে ঢুকলে সর্বশরীরে ঘেন বিষ ছড়িয়ে দেয় ।

ঐ ত সামনেই চন্দ্রকূপ । জাগ্রত অবস্থায় এই কদিন ঐ চন্দ্রকূপের কল্পনা করেছি মনে মনে, ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখেছি এই চন্দ্রকূপের । সেই চন্দ্রকূপের কিনারায় এসে দাঁড়িয়ে এখন আর চোখ তুলে ভাল করে চেয়ে দেখবার সামর্থ্যও নেই কারও দেহে—গরজও নেই মনে । সর্বস্ব খোয়া গেলে লোকে কিছু-কণের জন্তেও নিরাসক্ত নিঃস্পৃহ হয়ে ওঠে । সেই রকমের একটা তুরীয় অবস্থায় পৌছেছি আমরা তখন । এগারো দিনের ধকলে পুণ্যার্জনের, উকার পাবার, পাপকর্মের দ্রবস্ত বাসনাটাও বেশ ঝিমিয়ে এসেছে । কোনও কিছুই জন্তেই আর ছিটেফোটা আকুপাঁকু নেই মনে দেহে কোথাও । এসেই ত পড়েছি

—কাল সকাল হোক, তখন কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে দর্শন-স্পর্শনিটা সারলেই চলবে। অতএব এখন লুটিয়ে পড়া যাক ধর্ম্মজীর বুকে।

হুনিয়ার জালায়ন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি পাবার স্পর্শমণি এই মহাতীর্থগুলি সকলের ধরা-ছোঁয়া-নাগালের বাইরে এই রকমের উৎকট পথের শেষপ্রান্তে নির্দেশ করা হয়েছে কি কারণে তার একটা সহজ সরল অর্থ খুঁজে পেলাম। ঝাঁ করে মেলগাড়িতে চেপে রাতারাতি কানী পৌঁছে বিশ্বনাথের মাথায় ফুল-বেলপাতা চাপিয়ে তার পরদিনই আবার বাড়ি ফিরে আফিস করলে কানী-বিশ্বনাথ দর্শনের ফল কষ্টটুকু পাওয়া যায় তা মা অন্নপূর্ণাই জানেন। কিন্তু পুণ্যকামীর পুণ্যার্জনের ক্ষুধাটা যে তাতে বোল-আনা মেটে না এটুকু জোর দিয়েই বলা যায়। আর—পুরোনো তেঁতুল ইসবগুল পর্বত পুঁটলি বেঁধে পিঠে ফেলে ছমাস ধরে পাহাড়পর্বত ভেঙে সর্বশরীরে ঘা করে ধোঁড়াতে ধোঁড়াতে কেদার-বদরী থেকে ফিরে এলে তৃপ্তিতে বুকখানা দশহাত ফুলে ওঠে। তাই বোধ হয় কেদারনাথের মহিমা বিশ্বনাথের চেয়ে অনেক উচুতে পৌঁছেছে। আসল কথা, তীর্থপথের কষ্টটুকুই হচ্ছে “তপঃ”। তপস্তা ধারা ব্রহ্মদর্শন হয়, তাই বলা হয়েছে ‘তপোহি ব্রহ্ম’। মেলে চেপে তীর্থদর্শন করে ফিরে এলে তীর্থদর্শনও হয় গায়েও আঁচড় লাগে না, তবে ঐ ‘তপঃ’টুকু বাকি থেকে যায়।

তীর্থপথ এমন হওয়া চাই যা পার হয়ে তীর্থে পৌঁছতে মন বৃদ্ধি অহংকার—তার সঙ্গে ইঞ্জিয়গুলো পর্বত—পুড়ে পুড়ে খাঁটি সোনা হয়ে যায়। অন্য কোনও কামনা বাসনা ত দূরের কথা, খাস যে উদ্দেশ্য নিয়ে তীর্থযাত্রা সেই পুণ্যকামনারও ছিটেকোটা যেন না থাকে তীর্থে পৌঁছে। সং হোক অসং হোক যে কোনও জাতের বাসনাকামনা বুকে থাকলে ঈশ্বরকেও দেখা যাবে রঙিন কাঁচের ভিতর দিয়ে। ঐ রঙিন কাঁচ ভেঙে কেলে সবকিছু সাদা স্বচ্ছ দৃষ্টিতে দেখতে পাওয়ার শক্তি লাভ করার অন্তরেই এই সব তীর্থদর্শন সাধনভজন ধ্যানধারণা চক্রহতপস্তা।

সবাই বসে পড়েছে গোল হয়ে। অল্প সব দিনের মত 'কোথায় জল, কোথায় কাঠ, দাও এখনই বড় কলকের মাথায় আগুন চাপিয়ে' এই সব ডাকহাঁকও উঠল না। ভোর রাত থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সমানে চলে এসেও কারও ক্ষুধা-পিণাসার গরজ নেই। কেউ কারও সঙ্গে আলাপও করছে না। যেন কেউ কাউকে চেনে না। এমন কি, আমাদের সুখলালও একপাশে আলাদা হয়ে বসে পড়েছে। অল্পদিন যাত্রাবিরতির সঙ্গে সঙ্গে সে হয়ে ওঠে একজন কর্মবীর। জল আনো, আগুন জালাও, চা চড়াও—এই সব হাঁকডাকে একেবারে অস্থির করে তোলে সবাইকে। সেই সুখলালও চুপটি করে বসে একদৃষ্টে চেয়ে আছে চন্দ্রকূপের দিকে। সবাই আমরা নিশ্চল হয়ে বসে আছি সেই ছোট-বড় মেজ মেজ পাহাড়গুলির দিকে চেয়ে। আশ্চর্য হয়ে দেখছি, সবচেয়ে বড়টি থেকে সবচেয়ে ছোটটি পর্যন্ত প্রত্যেকটির আকার একই ধরনের। ঠিক দুর্গাপূজার চালের নৈবেদ্য। নৈবেদ্যের চূড়ায় বসানো থাকে একটা বড় নারকেল নাদু বা ক্ষীরের সন্দেশ। সেইগুলিই দিতে ভুল হয়ে গেছে এখানে। সেই অন্তেই এই বিরাট বিরাট মাটির নৈবেদ্যগুলিকে কেমন যেন ঝাড়া ঝাড়া দেখাচ্ছে। শুধু তাই নয়—আরও তাকাব কাণ্ড হচ্ছে এই যে, সেই চেপ্টা চূড়াগুলি থেকে সাদা ধোঁয়া উঠছে। জল ফুটলে যেমন ধোঁয়া ওঠে, ঠিক তেমনি। পূর্ব অংশ যাবার পরেও পশ্চিম দিক থেকে যে স্বচ্ছ আলোটুকু এসে পড়েছে ওখানে তাতে সেই সাদা ধোঁয়া আরও স্পষ্ট হয়ে দেখা গেল।

একটু একটু করে আঁধার জমা হতে লাগল সেই চেপ্টা-মাথা ধোঁয়া-বেকনো মাটির নৈবেদ্যগুলির পায়ের তলায়। ঐ দিকে একভাবে চেয়ে থাকতে থাকতে একটা অদ্ভুত চিন্তা একেবারে পেয়ে বসল আমাকে। চোখের দৃষ্টি আড়াল করে ঐ যে বিচিত্র-ছবি-আঁকা পর্দাখানি বুলছে, ওর পিছনে নিশ্চয়ই তোড়জোড় চলেছে এক বিরাট নাটক অভিনয়ের। ঐ ধ্বনিকাখানি হঠাৎ উঠে যাবে চোখের উপর থেকে। তখন উজ্জল আলোতে চোখ ধাঁধিয়ে যাবে—আর স্পষ্ট দেখতে পাব ওই ধ্বনিকার অন্তরালে কি রহস্য লুকিয়ে রয়েছে। সেই প্রতীকার রহস্য

নিখাসে একদৃষ্টে চেয়ে রইলাম সেই দিকে। শেষে নিবিড় আধারের মাঝে একেবারে তলিয়ে গেল সবকিছু। লেপে মুছে একাকার হয়ে গেল সেই পর্দার গায়ে আঁকা ছবিখানি। শুধু দেখা যেতে লাগল অনন্ত আকাশ আর আকাশের গায়ে ফুটে ওঠা অসংখ্য জলজলে ছোট ছোট রূপালী ফুলগুলি। তখনও মধ্যে আশায় নিস্তর হয়ে বসে আছি ওইদিকে একদৃষ্টে চেয়ে। নিশ্চয়ই একটা-কিছু ঘটবে ওখানে। হঠাৎ ঐ আধার ববনিকাখানি অদৃশ্য হয়ে যাবে চোখের উপর থেকে, আর চোখ-ধাঁধানো আলোর আরম্ভ হবে এক নাটক, যে নাটক দেখে ইহজন্ম পরজন্ম কর্মফল পুরুষকার—এই সমস্ত চিরন্তন বন্দনমস্তার একেবারে চরম সমাধান পেয়ে যাব। আগে কি ছিলাম, এখন কি হয়েছি আর আগামীতে কি হবে—এইসব বিলী বিদ্যুটে জিজ্ঞাসার শেষ উত্তর মিলে যাবে সেই নাটক দেখে।

“ঐ যে দেখছেন—ডান ধারের সবচেয়ে উঁচু পাহাড়—ঐ পাহাড়ই হচ্ছে চন্দ্রকূপ।” আচমকা কানে এল কথাটি। সঙ্গে সঙ্গে সর্বোচ্চ সজাগ হয়ে উঠল।

“ঐ পাহাড়ের উপরেই কাল সকালে আমাদের উঠতে হবে।”

আমাদের পাণ্ডা রূপলাল কথা বলছেন। কিন্তু কোথায় যে তিনি বসে আছেন তা ঠাহর করতে পারলাম না।

“ওখানে উঠে কাল আমাদের কবুল করতে হবে যদি আমাদের মধ্যে কেউ এই দুটি মহাপাতক করে থাকেন জীবনে : একটি হচ্ছে—নারীহত্যা, অপরটির নাম—ভ্রূণহত্যা। আমাদের মধ্যে যদি কেউ ওই দুটি মহাপাতকের একটিও করে থাকেন আর তা কবুল না করেন চন্দ্রকূপ স্বামীর দরবারে, তাহলে চন্দ্রকূপ বাবার হুকুম মিলবে না আর এগোবার। তাহলে তাঁকে এখানেই আমাদের ত্যাগ করে যেতে হবে। মাতা হিংলাজের শুহার প্রবেশ করবার তাঁর অধিকার নেই।”

ধীর অচঞ্চল কণ্ঠে রূপলাল বলে যেতে লাগল।

“আপনারা সকলেই চাক্ষুষ শ্রমাণ পাবেন চন্দ্রকূপ বাবার হুকুমের। ঐ পাহাড়ের মাথায় উঠে দেখতে পাবেন ওখানে ঠাঁর সমস্ত মাথাটা জুড়ে রয়েছে একটা মস্ত পুকুর। ঐ যে দেখছেন সাধা ধোঁয়া উঠছে ওখান থেকে—ঐ ধোঁয়া উঠছে সেই পুকুর থেকেই। সে পুকুরে জল নেই, জলের বদলে আছে থকথকে নরম কাদা। সেই কাদা ফুটছে অনবরত, বড় বড় বুজকুড়ি উঠছে সেই কাদার পুকুরে। দেখলে মনে হবে, যেন ঐ পাহাড়ের ভিতর আগুন জলছে আর সেইজন্মেই ফুটছে ঐ নরম কাদা। মা ধরণীর ভিতর থেকে কত যুগ ধরে ঐ নরম মাটি বেরুচ্ছে আর তা জমে জমে ঐ অত উচু পাহাড়টা তৈরী হয়েছে। শুধু ঐ পাহাড়টা নয়, এতবড় হুনিয়াখানা সৃষ্টি হয়েছে ঐ কাদায়। ওখানে পৌঁছে দেখতে পাবেন এখনও সেই নরম কাদা ঐ পাহাড়ের গা বেয়ে গড়িয়ে নামছে অনেক জায়গা দিয়ে। চন্দ্রকূপ দর্শনের পর আমি আপনাদের শোনাব এই চন্দ্রকূপের উপাখ্যান। কি করে এর সৃষ্টি হল আর কেনই বা চন্দ্রকূপ বাবা সকলের সর্বপাপ হরণ করেন সে সব কথা তখন শুনবেন। এখন শুনতে নেই, শুনলে বিপদ ঘটে।”

রূপলাল হঠাৎ থামল। যেন কে তার মুখ চেপে ধরলে। অন্ধকারে তার মুখ দেখা যাচ্ছে না। মনে হল যেন সে আর-কিছু বলতে ইতস্তত করছে। শেষে গলা নামিয়ে একরকম ফিসফিস করে সে তার বক্তব্যটুকু এই ভাবে শেষ করলে।

“ওখানে সেই অতবড় পুকুরের সর্বত্র সবসময় অসংখ্য বুদবুদ উঠছে, আবার মিলিয়ে যাচ্ছে। ছোট ছোট বুদবুদ নয়। হু মণ চাল-গম রাখা যার এমন মাপের বড় ঝোড়া উন্টে রাখলে যতবড় দেখায় তার চেয়ে ঢের বড় বড় বুজকুড়ি উঠছে সেই কাদায়। আমি আবার বলছি, চন্দ্রকূপ স্বামীর হুকুমের চাক্ষুষ শ্রমাণ পাবেন আপনারা সেখানে গিয়ে। যদি কেউ ওই ছোটো মাপের একটি করে থাকেন আর তা চোঁচিয়ে কবুল না করেন ওখানে দাঁড়িয়ে, তাহলে তৎক্ষণাৎ

বুজবুড়ি ওঠা একেবারে বন্ধ হয়ে যাবে। বতকণ না তিনি স্বীকার করছেন তাঁর পাপ, কিংবা বতকণ না তাঁকে নামিয়ে দেওয়া হবে পাহাড় থেকে, ততকণ কিছুতেই আর একটিও বুদবুদ উঠবে না। ওখানে দাঁড়িয়ে নিজের নাম, বাপ মা ঠাকুরদাদা এঁদের নাম বলে প্রত্যেককে চন্দ্রকূপ মহারাজের হুকুম প্রার্থনা করতে হবে হিংলাজ দর্শনে যাবার। সেই সময়ই কবুল করতে হবে নিজের পাপ। তা যদি কেউ না করেন তবে তখনই বুদবুদ ওঠা বন্ধ হয়ে যাবে। আর আমাদের মধ্যে যদি কারও ঐ জাতের ছোটো পাপের একটিও না থাকে তবে আর কোনও মুশকিলই নেই। বুদবুদ উঠতেই থাকবে। আমরা ওখান থেকে নেমে হিংলাজ মায়ীর গুহায় রওয়ানা হয়ে যাব।”

রূপলাল আবার খামল। চারিদিক থেকে নাক ঝাড়ার ফৌস ফৌস শব্দ শোনা যেতে লাগল। বুড়া গুলমহম্মদ কখন এসে দাঁড়িয়েছে আমার পেছনে।

বিড় বিড় করে সে তার নিজের ভাষায় কি-সব মন্ত্র আওড়াচ্ছে। অন্ধকারে কেউ কারও মুখও দেখতে পাচ্ছি না। পোপটডাইএর কথা মনে পড়ল। এ সময় তাঁর পাশে থাকা আমার একান্ত উচিত ছিল। অন্তত তাঁর হাতখানা চেপে ধরে তাঁর প্রাণে একটু শান্তি দিতে পারতাম।

কে একজন উঠে দাঁড়াল। দাঁড়িয়ে বেশ চোঁচিয়ে সে বলতে লাগল। গলা শুনে বুঝলাম রূপলালই উঠে দাঁড়িয়ে কথা বলছে। ওখানে আমাদের কি কি সন্ধে নিয়ে যেতে হবে, ওখানে পৌঁছে কি ভাবে তীর্থকর্ম করতে হবে, এই সব সন্ধকে আমাদের ওয়াকিফহাল করছে সে এবার।

“আপনাদের প্রত্যেকের কাছে ছুটি করে নারকেল আছে, তার একটি এই-খানে পূজার লাগবে। চন্দ্রকূপ বাবার পূজার জন্তে আপনারা সন্ধে যে ছোট কন্ডেটি আর গাঁজা এনেছেন তাও সন্ধে নিতে হবে পূজার জন্তে। ঐ সব পূজার জিনিস নিয়ে কাল ভোরে আমরা ঐ পাহাড়ের উপর উঠব। উঠতে কষ্ট নেই কিছুই, তবে পা না হড়কার। এক ঘণ্টা বা সওয়া ঘণ্টা লাগবে ঐ পাহাড়ের মাথায় গিয়ে পৌঁছতে। সেখানে সেই কাদার পুকুরের ধারে

দাঁড়িয়ে নিজের নাম বাপ-মায়ের নাম বলে চক্ৰকূপ স্বামীর হুকুম চাইতে হবে। হুকুম মিললে তখন নারকেলটি কলকেটি আর গাঁজাটুকু ফেলে দিতে হবে চক্ৰকূপে। বাবার হুকুম না পেয়ে যদি ওসব জিনিস ফেলা হয় তাহলে বাবা পূজা গ্রহণ করেন না। মানে, জিনিসগুলো কাদার উপর পড়ে থাকবে, কাদায় তলিয়ে যাবে না। আর বাবার হুকুম পেয়ে পূজো ফেললে বাবা সে পূজো তখনই গ্রহণ করবেন। সমস্তই আপনারা চাক্ষুষ দেখতে পাবেন। আজ সারা রাত আমরা জেগে থাকব। আজ রাতে চক্ৰকূপ স্বামীর ‘লোট’ বানানো হবে। সেই লোট নিয়ে যাওয়া হবে উপরে। তাই বাবার ভোগে নিবেদন করা হবে। ওখান থেকে নেমে এসে কাল আমরা সেই লোট প্রসাদ পাব সকলে। ওইখানে চক্ৰকূপের কিনারায় দাঁড়িয়ে আপনারা বা দান-দক্ষিণা করবার করবেন।”

এর পর রূপলাল জোড়হাত করে চক্ৰকূপের দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে বলতে লাগল, “আমি রূপলাল ছড়িওয়াল, আমার বাপের নাম হুগনলাল ছড়িওয়াল, আমার ঠাকুর্দা ছিলেন ছেদীলাল ছড়িওয়াল। যিনি সওয়া দু’শ বার হিংলাজ দর্শন করে গেছেন—আর আমার মায়ের নাম হচ্ছে বালস্তী; আজ আমি আর আমার ছোট ভাই হুখলাল ছড়িওয়াল। এইখানে বাবার সামনে দাঁড়িয়ে বাবার কাছ থেকে হুকুম চাচ্ছি—দয়া করে বাবা আমাদের সকলকে হিংলাজ দর্শনের অহুমতি দিন। বহু রাজীকে নিয়ে বহুবার আমাদের বাবা-ঠাকুর্দা এই চক্ৰকূপ স্বামীর দরবারে এসেছেন, আবার সকলকে হিংলাজ দর্শন করিয়ে ফিরিয়েও নিয়ে গেছেন। আমরা ছু ভাই তাঁদেরই বংশধর। আজ আমরা বাবের সঙ্গে করে এনেছি তাদের সব পাপ সব অপরাধ বাবা ক্ষমা করুন। আমরা যেন তাদের মঙ্গলমত হিংলাজ-মাতা দর্শন করিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারি।—জয় বাবা চক্ৰকূপ মহারাজ কি—”

“জয়।”

বার বার তিনবার অক্ষয়নি দেওয়া হল। সকলের কণ্ঠে আবার আওয়াজ ফুটল। এতক্ষণে বেন সকলে প্রাণ ফিরে গেল।

সবকটা আলো জ্বলে ফেলা হল। ছড়ি পুঁতে কলকে সাজিয়ে ছড়ির ভোগসেবা চলতে লাগল ওধারে। কিন্তু সবকিছুই আজ একান্ত নিঃশব্দে। অন্তর্দিন এই সময় হৈ-হুয়া ইয়ারকি-ঠাট্টা হাসি-চীৎকার এই সমস্ত চলতে থাকে। আজ সে সব কিছুই হল না। নেহাৎ প্রয়োজনীয় কথা ছাড়া কেউ কথাই বলছে না। যদিও বা কিছু বলছে কেউ, তাও গলা ধার্টো করে। সাবধানে সম্বন্ধে চলাফেরা করছে সকলে। চন্দ্রকূপ খামীর বিজ্রামের না ব্যাঘাত ঘটে।

এখান থেকে অনেকদূরে ঐ চন্দ্রকূপের ধারেই কোথায় জল উঠছে নিজে থেকে। ছুটো আলো আর কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে গুলমহম্মদ চলল সেই জল আনতে। আমাদের ছুটো কুঁজোর জল একটার রেখে একটা কুঁজো তার হাতে পাঠালেন ভৈরবী। জল এল। দারুণ গন্ধকের গন্ধ জলে। সেই জলে গা হাত মুখ মাখা ধুয়ে-মুছে ফেলা হল। সে রাতে কুটি পোড়ার হাদ্যমা নেই কারও। এক এক মুঠো বাদাম আর খেজুর খেয়ে সকলে জল খেলে। অনেকে তাও খেলে না। নিরন্তর উপবাস করে রাতটা কাটাবে তারা। কাল চন্দ্রকূপ দর্শন করার পর তবে জল খাওয়া।

তবু সকলকেই সেই অন্ধকারে কুড়িয়ে আনতে হল এককাঁড়ি শুকনো ভালগালা। মোট পোড়ানো হবে অর্থাৎ চন্দ্রকূপ বাবার ভোগ বানানো হবে।

একখানা নতুন কাপড়ের চার কোণ টেনে ধরে চারজন দাঁড়াল। সেই কাপড়ে প্রত্যেকে আঁধ-শো করে আটা আর বার যেমন সামর্থ্য তিনি দি ফেলে দিল। অনেকে কিছু কিছু কিসমিস পেতা বাদামও দিলে। এ সমস্ত জিনিস সকলেই আলাদা করে সঙ্গে এনেছে চন্দ্রকূপ আর হিংসাজের ভোগের জন্যে।

তখন রূপলাল আছড় গায়ে জোড় হাত করে সেই চারজন লোক আর তাদের ধরা চাদরখানাকে তিনবার প্রদক্ষিণ করে নিলে। নিয়ে চন্দ্রকূপের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে জল দিয়ে সেই সমস্ত জিনিস ঐ চাদরের উপরেই মেখে ফেললে। মাথা কর্মটি শূন্যে সমাধা হয়ে গেল। মাটির উপর রেখে মাথা নিবেদন। ততক্ষণে সেই ভালপালার কাঁড়িতে আগুন দেওয়া হয়েছে। এইবার সেই প্রকাণ্ড আটার ডেলাটা তুলে দেওয়া হল সেই আগুনের উপর। তার উপর আরও ভালপালা চাপিয়ে দেওয়া হল। সারারাত ধরে আগুন জলবে, তারপর নিববে আর জুড়াবে। ততক্ষণে ভোর হয়ে যাবে। তখন আমরা এই লোট ঐ চুলা থেকেই তুলে নিয়ে পাহাড়ে চড়া আরম্ভ করব। চন্দ্রকূপ বাবার লোট মাটিতে স্পর্শ করলেই উচ্ছিষ্ট হয়ে যায়। তাই এত কড়াকড়ি।

সেই আগুনের ধারেই কখন বিছিয়ে আমরা সকলে শুয়ে-বসে রইলাম।

চোখ বুজে শুয়ে ছিলাম। শুনতে পেলাম “তাহলে কি বলব আমি চন্দ্রকূপে গিয়ে?” মাথার কাছে বলে ফিসফিস করে বলছেন ভৈরবী। দারুণ হুশিয়ার তাঁর গলা ভেঙে পড়ল।

সজোরে এক ধাক্কা দিলে আমার মাথার মধ্যে তাঁর কথাটি,—“তার মানে!”

একটু চুপ করে থেকে ভৈরবী বললেন—“মানে, ঐ পাপ সবছে—” আর কোনও কথা বেরল না তাঁর মুখ দিয়ে।

ধড়মড়িয়ে উঠে বসলাম —“কি বললে! পাপ! তা তোমার কি?” আমারও আর একটি কথা বেরল না মুখ দিয়ে। উত্তেজনার উৎকর্ষের গলার ভিতরটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে।

কোনও রকমে তিনি উচ্চারণ করলেন, “সেই কথাই ত বলছি—আমি যে একবার—” এবার তিনি সত্যিই কেঁদে ফেললেন।

শরীরের সমস্ত রক্ত চনচন করে মাথায় উঠে গেল। আগুন বেকতে লাগল আমার হুঁচোখ দিয়ে। দম বন্ধ করে চেয়ে রইলাম একদৃষ্টে পার্শ্ববর্তিনীর অন্ধকার মূর্তির দিকে।

একটু সামলে আবার আরম্ভ করলেন তিনি ভাঙা গলায়—“কিন্তু আমার কোনও দোষ ছিল না। সে যে মারা যাবে তা আমি ভাবতেও পারি নি।”

এতক্ষণে দম ছাড়লাম। সর্বরক্কে হোক! তা হলে অশ্রু কিছু নয়। কবে কোথায় হত্যা করে ফেলেছেন কাকে। কিন্তু এতবড় ব্যাপারটা ঘটল কোথায়?

ভাঙা গলায় আন্তে আন্তে বলেই চলেছেন ভৈরবী—রোজই তাকে স্নান করাতাম। রোজ স্নান করালে যে মরে যাবে এ কথা ত তখন কেউ আমার বলে দেয় নি। শেষে যখন সে ম’ল তখন ঠাকুমা খুব বকলেন। বললেন, স্ত্রী-হত্যা করলি ত—তোমার আর উদ্ধার হবে না কোনও কালে।”

এই পর্বস্ত বলে একটি গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেললেন তিনি।

আর ধৈর্য রাখতে পারলাম না। একটা চাপা ধমক দিলাম—“বলই না ছাই—কে সে? কবে আবার কাকে হত্যা-টত্যা করে মরতে গেলে তুমি—”

প্রায় কানতে কানতেই তিনি জবাব দিলেন—“তার নাম রেখেছিলাম লক্ষ্মী। এই এত বড় বড় লোম, লালে সাদায় মেশানো রঙ। আমাদের বাড়ির পাশের বাড়ির খাঁড় পিসী তার শস্তরবাড়ি থেকে তাকে এনে দিয়েছিল। মাদী বেড়াল, খুব স্নলক্ষণা। আমার কপালে টিকবে কেন। আমার যত সেবার ত ক্রটি করিনি কোনও দিন। রোজ স্নান করিয়েছি, পাউডার মাখিয়ে, চিকনি দিয়ে তার গায়ের চুল আঁচড়ে দিয়েছি। তবু সে মরে গেল আর আমাকে স্ত্রী-হত্যার ভাগী করে রেখে গেল।” তিনি ফোপাতে লাগলেন।

তার দিকে চেয়ে চুপ করে বসে রইলাম। মনে পড়ে গেল আজ ভোরেই ইনি আমাকে শেষ সম্বোধন করেছিলেন—“ভীমরতি হয়েছে!” কারণ মরবার ক্ষণে একলা একটা অজান পাগলকে সেখানে আমি ফেলে আসতে চাচ্ছিলাম

না। সারাটা দিন পরে অর্ধেক রাতে সেই “ভীমরতি-হওয়া”-আমার সঙ্গে এই প্রথম আলাপ করতে এসেছেন। কি ব্যাপার—না, কবে কোথায় একটি মাদী বেড়াল মেয়ে ইনি স্ত্রী-হত্যার পাপ করে ফেলেছেন!

আধিক্যতা নেকাপনা ইত্যাদি চোখা চোখা কথাগুলো জিবের ডগায় এসে গিয়েছিল। অনর্থক আর সে সব ব্যবহার করলাম না। এই মানুষটিকে ধার্মা জানেন তাঁরা জীব-জন্তুর ব্যাপার নিয়ে এঁর সঙ্গে তর্কাতর্কি করতে যাবেন না কিছুতেই। কুকুর বেড়াল পশু পাখী—এরা যে ঘোল-আনা মানুষের খাতির পাবার যোগ্য নয়, এ কথা এঁকে বোঝাতে গেলে লাঠালাঠি করা ভিন্ন উপায় নেই। চন্দ্রকূপের পাশে বসে এই রাতে খেয়োখেয়ি করে লাভ কি। আবার চান্দর মুড়ি দিয়ে চুপচাপ শুয়ে পড়লাম।

বোধ হয় ঘুমিয়েই পড়েছিলাম। কান্নার শব্দ শুনে ঘুম ভেঙে গেল। চান্দর মুড়ি দিয়েই শুনতে লাগলাম।

“না না না—বাব না আমি ঐ পাহাড়ের উপরে। একলা আমি ওখানে কিছুতেই বাব না। বড় আশা করেছিলাম আমি একবার তাকে নিয়ে চন্দ্রকূপ বাবার স্তানে পৌঁছতে পারলেই তার মাথার গোলমাল সেরে যাবে, সে আবার মানুষ হয়ে উঠবে। তার হাত ধরে লারা জীবন আমি পথে পথে ঘুরে বেড়াব। লোকের দরজায় দরজায় ভিক্ষা মেগে খাব। সে ভিন্ন আর কেউই যে আমাকে ছোঁবে না। যতক্ষণ তার হাঁশ ছিল সে আমার ছেড়ে পালায় নি। আমাকে স্নানচাষার জন্তে সে নিজের গ্রাণ পর্যন্ত দিতে গিয়েছিল। আর আজ তাকে ধর্মের মুখে ফেলে রেখে নিজের গ্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসেছি আমি। এখন তার হাঁশ নেই, এখন সে একটা ছোট বাচ্চার মত, মুখে তুলে না দিলে এখন সে এক-ফোঁটা জলও খাবে না। এই অবস্থায় তাকে আমি এই নির্জলা মূল্যকে শুকিয়ে মরবার জন্তে ছেড়ে দিয়ে পালাচ্ছি। মরবার সময়ও তার মুখে এক ফোঁটা জল পড়বে না। আমার জন্তেই সে আজ পাগল হয়ে গেছে আর আমিই

তাকে একলা শুকিয়ে মরবার জন্তে ফেলে রেখে নিজের প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এলাম।”

শুন্মরে শুন্মরে কাঁদতে লাগল কুস্তী।

একেবারে নিচু স্বরে তাকে কি বললেন ভৈরবী। কথাগুলো শুনতে পেলাম না—মিনতি করে পড়ছে তাঁর গলা দিয়ে।

আবার কুস্তীর গলাই শুনতে পেলাম।

“না না না—সে আর আসবে না। আমাকে খুঁজে ছুটে বেড়াতে বেড়াতে জল-তেষ্টায় সে এতক্ষণে মরে কাঠ হয়ে গেছে। হয়ত তার দেহটা নিয়ে এখন নেকড়েরা ছেঁড়াছিঁড়ি লাগিয়েছে। কেউ তাকে ধরতে পারবে না, কারও কাছে সে জলের জন্তে যাবে না। উঃ, কেন আমি তাকে সেখানে ছেড়ে রেখে এলাম, কেন আমি রইলাম না সেখানে, তাহলে সে ঠিক আমার কাছে এসে ধরা দিত।”

অকস্মাৎ গুলমহম্মদ হাঁক দিয়ে উঠল। নিমেষের মধ্যে আকাশ বাতাস ভরে গেল বহু কণ্ঠের তুমুল গর্জনে। লোক দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। দলবদ্ধ সবাই উঠে দাঁড়িয়েছে, এমন কি উট দুটি পর্যন্ত। প্রত্যেকে হাতের লাঠি শূন্যে তুলে বিকট চীৎকার করছে। কিন্তু কেউ এক পাও এগোচ্ছে না। ওরা বাপ-বেটা দুজনে মাথার উপর টাকি বাগিয়ে ধরে হাঁকার দিচ্ছে। সবাইএর মুখ এক দিকে। ঐ দিক থেকেই যেন কোনও কিছু এগিয়ে আসছিল এদিকে। এই হৈ-চৈ লক্ষলক্ষ তাকে ভয় দেখিয়ে দূর করে দেবার জন্তেই করা হচ্ছে।

অনেকক্ষণ ধরে সেই চীৎকার চলল। নিশ্চয়ই নেকড়ে। এ জায়গায় একপাল নেকড়ে থাকাও কিছুমাত্র আশ্চর্য নয়। আমার ঠিক সামনেই ভৈরবী এক হাতে কুস্তীকে অন্য হাতে স্ত্রধলালকে ধরে দাঁড়িয়ে আছেন।

তখনও হৈ চৈ ধামে নি। আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে চুপি চুপি কে বললে, “স্বামীজি মহারাজ, কাকে তাড়ানো হল বুঝতে পারলেন?”

চেয়ে দেখি পোপটতাই। মাথায় পাগড়ি নেই, অন্ধকারে তাঁর মুখ ভাল-

করে দেখা গেল না। পোপটভাই চুপি চুপি বললেন—“ও নিশ্চয়ই আমাদের থিকমল।”

“খ্যা!” আঁতকে উঠলাম একেবারে।

পোপটভাই খপ করে আমার একখানা হাত ধরে ভীষণ চাপ দিলেন।

“চুপ, মুখ বুজে থাকুন। এ সময় কোনও কথা বলে লাভ নেই। আমারও ভুল হতে পারে। এখানে ঐ পাহাড়ের মধ্যে বাহেড়া আছে। হয়ত সেই বাহেড়া একটা আসছিল এখানে। গুলহাম্মদকে ডেকে জিজ্ঞাসা করুন কি দেখেছে সে।”

বাহেড়া!

‘বাম’ এই তার আর একটি নাম। বিশদ পরিচয় শুনে ধারণা হল বনমাহুৰ-জাতীয় প্রাণী এরা। এইখানে এই পাহাড়ের মধ্যে কোথাও আছে তাদের আশ্রয়। তাদের স্বভাব হচ্ছে ঘুমন্ত মাহুৰ চুরি করা। রাতের অন্ধকারে সকলে ঘুমিয়ে পড়লে নিঃশব্দে তারা আসে, মাহুৰের মত হু পায়ে হেঁটে তারা চলাফেরা করে। ঘুমন্ত মাহুৰের কাছে এসে তার পায়ের কাছে মুখ রেখে শুয়ে পড়ে বাহেড়া। শুয়ে তাদের লম্বা লকনকে জিব দিয়ে মাহুৰের পায়ের তলায় চাটতে থাকে! যত চাটে লোকটির ঘুমও তত গাঢ় হয়। শেষ পর্যন্ত মাহুৰটি চৈতন্ত হারায়, আর এ কর্মটি হয় বোধহয় তাদের বিবাক্ত লালার স্পর্শে। আবার যখন তার জ্ঞান ফিরে আসে তখন সে দেখে যে পাহাড়ের মধ্যে এক গুহায় শুয়ে আছে। কিন্তু উঠে দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই। তখন তার পায়ের তলায় দগদগে ঘা, ছাল চামড়া সব উঠে গেছে।

বুঝলাম—বনে যেমন বনমাহুৰ, তুমারশুঁড়ে তুমারমানব, তেমনি এই মক্ৰর মাঝে রয়েছে মক্ৰমানব। কিন্তু কিসের জন্তে মাহুৰ চুরি করে তারা? এ রকমের বিদগ্ধটে বদখেয়াল কেন তাদের? মাহুৰ ত পোক-ছাগল নয় যে দুধ দেবে বা লাকল টানবে। মাহুৰ নিয়ে তারা করে কি? খায় না কি?

তা কেউ বলতে পারে না। ওটা ওদের স্বভাব—গুলমহম্মদের ভাবায় ‘খুশ খেয়াল’। তাদের বেটাছেলেরা চুরি করে মেয়েমানুষ পেলে, আর স্ত্রী-বাহেড়া পুরুষমানুষ-চুরির তালে থাকে। চুরি করে নিজের আন্তানায় নিয়ে গিয়ে ফেলে রাখে। মারা-ধরা বা অন্য কোনও অত্যাচারই করে না। হুঁশ ফিরে এসেছে দেখলেই পা চাটতে থাকে, তখন লোকটি আবার ঘুমিয়ে পড়ে। এই ভাবে চাটতে চাটতে পায়ের গোছ পর্যন্ত তাদের জিবে জিবেই চলে যায়। এখানে কিছুই না খেতে পেয়ে লোকটা মারা পড়ে। মরে গেলেও অনেকদিন পর্যন্ত তারা বস্তু করে রাখে। শেষে যখন পা চাটলে আর তাদের জিবে রক্ত লাগে না তখন তাকে বয়ে এনে বাইরে খোলা জায়গায় ফেলে রেখে যায়।

শেষবার কতদিন আগে হয়েছিল এই রকম মানুষচুরি? শেষবার কাকে চুরি করেছিল তারা?

হরদম আলাপ চালিয়ে বাবার কন্ঠস্বরে নেই বুড়া গুলমহম্মদের। সে তার পাগড়ি খুলে মাথার চুলের মধ্যে আঙুল দিয়ে কি খুঁজতে লাগল। তার হয়ে রূপলাল উত্তর দিলে।—

“আমার বাবার কাছ থেকে সে গল্প আমরা শুনেছি। বাবা শুনেছিলেন ঠাকুরদার কাছ থেকে। নরসিং ছড়িওয়ালার ছিলেন আমার ঠাকুরদার পিসতুতো ভাই। যেমন ছিল তাঁর সাহস তেমনই অশ্রুয়ের মত গায়ের জোরও ছিল তাঁর। একবার একটা উট করাচী শহরের রাস্তায় কেপে উঠে অনেক লোককে কামড়ে বেড়াচ্ছিল। নরসিং এক লাফে সেই কেপা উটটার ঘাড়ের উপর লাফিয়ে উঠে তার লম্বা গলা মূচড়ে একেবারে দফা দফা করে দেন। এইজন্তে লোকে তাঁকে উটমারা বলে ডাকত।

“সেই নরসিং ছড়িওয়ালার একবার তাঁর এক বড়লোক বন্ধুমান আর তার বউকে নিয়ে হিংলাজ আসেন। সে সময় শোনবেলী শহর ছিল না, নাম-ধাম লিখিয়ে খাজনাও দিতে হত না। এ মুহূর্ত থেকে কোনও উটওয়ালারও তখন রাজী নিয়ে আসত না। রাজীরা আসত পারে হেঁটে, পথ দেখিয়ে আসত

ছড়িওয়ালা। আর তাদের মালপত্রও আসত মানুষের পিঠে। ছড়িওয়ালাই মাল বসে আনবার লোকের ব্যবস্থা করত।

“নরসিং এখানে এসে পৌঁছলেন তাঁর বজ্রমান আর তার বউকে নিয়ে। পরদিন চন্দ্রকূপ দর্শন করাবেন তাদের। রাত্রে সকলে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন। পরদিন সকালে আর বউটিকে পাওয়া গেল না। তখন নরসিং আর তাঁর সেই বজ্রমান প্রতিজ্ঞা করলেন যে বউটিকে উদ্ধার করতেই হবে। সন্দের লোকজনদের বেধে ওঁরা দুজনে দুখানা খোলা কুপাণ হাতে করে এই চন্দ্রকূপ এলাকার মধ্যে ঢুকলেন। বাহেড়াদের অনেকগুলোকে মেরে তাদের গুহা থেকে বউটিকে তুলে নিবে তিন দিন পরে তাঁরা বেরিয়ে এলেন ঐ পাহাড়ের ভিতর থেকে। এখান থেকেই সেবার নরসিংকে করাচী ফিরতে হয়। বউটি ত আর হাঁটতে পারে না, কাজেই হিংলাজ যার কি করে। সেই নরসিং বলেন বাহেড়াদের কেমন দেখতে। হুহু হয়ে বউটিও ওদের ষড়াব-চরিত্রের ঘর-সংসারের গল্প করে। কিন্তু তারপর থেকে তারা আর কাউকে চুরি করেছে কিনা বলতে পারি না।”

দিলমহম্মদ স্বল্প কথায় জানাল যে মানুষচুরি তাদের এই মুন্সুকে হামেশা হয়ই। বালুর উপর বাহেড়াদের অস্বাভাবিক লম্বা পায়ের ছাপ দেখে সবাই বুঝতে পারে কারা চুরি করলে মানুষটিকে।

আরও অনেক রকমের অনেক প্রশ্নই করার ছিল। ভাবলাম, দরকার কি। যার বাহেড়া যে নামই হোক সেই মানুষচোরদের, তবুও যে তারা এই মানুষ গোরু পশু পাখী কীট পতঙ্গ এককথায় এই জগতের তাবৎ প্রাণী দ্বারা বর্জিত এই ভয়ঙ্কর স্থানে বাস করছে আর বেঁচে আছে এটাও ত কম কথা নয়। বেশি খোঁচাখুঁচি করে জানতে গেলে হয়ত সন্দেহ জাগবে মনে যে ঐ রকমের কোনও প্রাণীর অস্তিত্বই নেই। তাতে কার কতটুকু লাভ হবে জানি না, তবে চন্দ্রকূপের যে বিশেষ ক্ষতি হবে তাতে আর সন্দেহ রাজ নেই। শান্তিতে থাকুক বেঁচে বাহেড়ারা ছুনিয়ার এই শেষ প্রান্তে। তাদের নামে যে বিত্তীয়িকা এই

চন্দ্রকূপকে ঘিরে রয়েছে তার মূল্য কম নয়। তার আর ভক্তি এ ছাড়া
হচ্ছে যমজ ভাইবোন। একটিকে হারালে অপরটির ডেজও কমতে থাকে
সঙ্গে সঙ্গে।

বাহেড়া-কাহিনী রাত শেষ করে আনলে। চন্দ্রকূপের জাড়া চূড়ার উপর
পিছন থেকে আলো এসে পড়ল। আকাশের গায়ে তখনও দু'একটা নক্ষত্র
জল জল করে জলছে।

আমরা প্রস্তুত হলাম।

আগেই দু'জন চলে গেল রূপলালের সঙ্গে স্নান করে আসতে। ওরা লোট
বয়ে নিয়ে যাবে।

তারি স্নান করে এলে আমরা সকলে যাত্রা করলাম। উট নিয়ে গুলমহম্মদরা
চলল চন্দ্রকূপের উত্তর খার দিয়ে ঘুরে। দর্শন করে নেমে গিয়ে আমরা ওদের
সঙ্গে মিলব।

নারকেল গাঁজা কলকে ইত্যাদি পূজা-উপচার সঙ্গে নিলে সবাই। কুঁজোও
বাদ গেল না। পাহাড়ের তলার কুঁজো বেধে উপরে চড়তে হবে। অমেকে
এক টুকরো লাল সালু সঙ্গে নিলে। চন্দ্রকূপের মাটি বেঁধে আনবে ঐ কাপড়ে।

দণ্ড খাটার ভক্ত দু'জন দণ্ড খাটেতে খাটেতেই চলল। ভেবে পেলাম না ঐ
ভাবে ঐ পিছল পাহাড়ের গা বেয়ে উঠবে কি করে ওরা।

কুস্তীর বাঁ হাতের কবজি মজবুত করে ধরে একরকম তাকে টানতে টানতেই
নিরে চললেন ভৈরবী। শুকনো মুখ, কোটরে-বসা চোখ, কক্ষ চুল, এই সব
মিলে কুস্তীকে ভয়াবহ করে তুলেছে। তার চোখের দৃষ্টিও অস্বাভাবিক।
নীচেকার ঠোঁট কামড়ে ধরে আছে। জালাময়ী দৃষ্টিতে সে একভাবে চেয়ে
আছে চন্দ্রকূপের দিকে।

আরম্ভ হল ছোট-খাটো মাটির নৈবেদ্যগুলি। কোন-কোনটি আমাদের
কোমর বা বুক পর্যন্ত উচু। সকলেরই মাথা চেপ্টা, এক রকমের গড়ন, উপরটা

শুকনো। মা ধরণীর অঙ্গ ফুটো হয়ে কিছুদিন রক্ত রক্ত নির্গত হয়েছিল, এখন বন্ধ হয়ে গেছে। ক্রমে আরও বড় বড় অঙ্গনতি সেই সব মাটির টিবিয় মধ্যে আমরা ঢুকতে লাগলাম। গাছগালা ঘোপ-ঝাড় কিছু নেই। এ হচ্ছে মাটির টিবিয় জঙ্গল। এর মাঝে কেউ যদি হারায় তবে যুগ-যুগান্ত খুঁজেও তাকে বার করা যাবে না। ক্রমে উচুতে উঠতে লাগলাম আমরা টিবিগুলিকে টপকে ডিঙিয়ে ঘুরে ঘুরে। শেষে পাওয়া গেল একটি ক্ষীণ জলধারা। সেটি এই টিবি-জঙ্গলের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে আবার ঘুরে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছে।

এখন একটি বাঁধ দিতে হবে।

কোদাল খোঁড়া কিছুই লাগল না। পঁচিশ ত্রিশ জোড়া হাত আছে কি করতে? ডেলা ডেলা মাটি তুলে এনে ফেলা হল দুটো টিবিয় মাঝখানে। জলধারাটির গতি রোধ হল। কিছুক্ষণের মধ্যেই ষষ্টি ডোবাবার মত ব্যবস্থা হয়ে গেল।

তখন জ্ঞান দান মন্ত্রপাঠ পিতৃপুরুষের তর্পণ এই সব তীর্থকর্ম সমাপন করা গেল। পণ্ডিত রূপলাল মন্ত্রপাঠ করালেন, দক্ষিণা গ্রহণ করলেন। সর্ববিধ অন্নুষ্ঠান সাড়খরে শেষ করে শেষে আমরা পাহাড়ে চড়া আরম্ভ করলাম। আরও কিছুক্ষণ এ-টিবিয় ডান পাশ দিয়ে ও-টিবিয় বাঁ পাশ দিয়ে ঘুরে ঘুরে এগিয়ে মূল চন্দ্রকূপের অঙ্গ স্পর্শ করা গেল। প্রত্যেকে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করলে। নিজের নিজের নাক-কান মললে। এইবার আরোহণের পালা।

প্রথমে কিছুক্ষণ কোনও কষ্টই হল না। এখানে-ওখানে পা রেখে লাফিয়ে লাফিয়ে বেশ খানিকটা ওঠা গেল, তারপর অবস্থা সাংঘাতিক হয়ে দাঁড়াল। ক্রমশ চালু মন্ত্রণ চন্দ্রকূপের অঙ্গ বেয়ে ওঠা অত সহজ ব্যাপার নয়। দুজোড়া হাত-পায়ের সাহায্য নিতে হল। বলা যায় দলহুঙ্ক সবাই একরকম দণ্ড খাটেতে খাটেতেই উঠতে লাগলাম। হাত-পা আটকাবার মত খাঁজ-খোঁজ যেখানে একটু পাওয়া গেল সেখানে একটু খেঁচে দম নিয়ে আবার চার হাত-

পায়ে আরোহণ। তবে বেশি সময় লাগল না। এক ঘণ্টার মধ্যেই আমরা বখাস্থানে গিয়ে পৌঁছলাম।

সেখানেও দাঁড়াবার উপায় নেই। প্রচণ্ড ঝড় বইছে, দাঁড়ালে উল্টে নীচে গড়িয়ে পড়তে হবে চন্দ্রকূপের গা বেয়ে। সেই কাদার কূপের কিনারায় আমরা পাশাপাশি মাটি আঁকড়ে বসে পড়লাম।

এবং এতক্ষণে চোখ মেলে ভাল করে দেখবার ক্ষমতা পেলাম।

যা দেখলাম তা রূপলালের বর্ণনার সঙ্গে হুবহু মিলে গেল। এ-পাড় থেকে ও-পাড়—মাঝখানের মাপ এক শ হাতের কম নয়—সুড়োল গোল একটি কালো থকথকে কাদার গুহুর। বহু জায়গায় পাড়ের উপর দিয়ে উপছে সেই কাদা গড়িয়ে নামছে নীচে। আর—হাঁ—মস্ত মস্ত ধামার মত বৃদবৃদ হরদম উঠছে সেই কাদার, সঙ্গে সঙ্গে সাদা বাষ্পও। জীবন্ত, একেবারে ঘোল-আনা প্রাণময় এই চন্দ্রকূপ।

সেইদিকে চেয়ে থাকতে থাকতে বার বার সর্বশরীর শিউরে উঠল।

পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখলাম, যতদূর দৃষ্টি যায়—হাজার হাজার—চন্দ্রকূপের বংশধরেরা স্থির নিশ্চল হয়ে বসে ধ্যান করছে। বাঁ দিকেও তাই। ডান দিকে বিছানো রয়েছে একখানি ধূসর রঙের চাদর, একেবারে সেই আকাশের সীমা পর্যন্ত। আর ঐ—ঐ চলেছে ছুটি উট আর ছুটি মানুষ। ওরা চন্দ্রকূপ ঘুরে আমাদের সামনের দিকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

এইবার চেয়ে দেখলাম আশেপাশে কে কি করছে। কিছুই করছে না কেউ। সবাইএর চোখ প্রায় কপালে উঠেছে। দু হাতে মাটি আঁকড়ে ধরে সবাই চেয়ে রয়েছে সেই মাটির বৃদবৃদগুলির দিকে। সেগুলি অনবরত উঠছে, আবার তৎক্ষণাৎ ভেঙে মিলিয়ে যাচ্ছে। আমাদের সামনে দু'হাত দূরেই কাদার আরম্ভ। আমাদের পায়ের তলার মাটিও বেশ নয়ম। যদি দৈবাৎ কেউ ওই কাদার মধ্যে পড়ে, তবে—। তবে কি হবে তা ভাবতে গিয়ে সভয়ে চোখ বন্ধ করতে হল।

আমার ডান পাশের পাঁচ-ছ'জনের ওধারে বসেছেন ভৈরবী। তখনও তিনি একহাতে কুস্তীর একখানা হাত ধরে রয়েছেন। কুস্তী বসেছে তাঁর পিছনে। ভৈরবীর এদিকে বসেছে মণিরাম আর ওদিকে কে বসেছে তার মুখ দেখতে পেলাম না। ঐ দিকেই সকলের শেষে বসেছে রূপলাল। তার সামনে সেই নতুন চাদরখানা পেতে তার উপর লোট রাখা হয়েছে। লোটের পাশে পোতা হয়েছে হিংলাজের ছড়ি। সেই ঝড়ে বহু কষ্টে একগোছা ধূপকাঠি আলিয়ে মাটিতে পুঁতলে রূপলাল। এইবার সে তার ঝোলা থেকে আরও সব কি কি জিনিস বার করতে লাগল।

সকলের থেকে দূরে আলাদা হয়ে পোপটলাল প্যাটেল বসেছেন। তাঁর ত্রিমিত চোখ দিয়ে গণ্ড বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে নেমেছে, চোঁট ছুঁখানি নড়ছে। এইবার চরম বোঝাপড়া করছেন তিনি চন্দ্রকূপ স্বামীর সঙ্গে।

আমার ঠিক পিছনেই আমার দুই কাঁধ ধরে দাঁড়িয়ে আছে সুখলাল। ধরে না থাকলে হাওয়ার চোটে উড়েই যাবে অতটুকু ছেলে।

ওধারে মন্ত্রপাঠ শুরু হল যার একবর্ণও কারও কানে ঢুকল না। হাওয়ার উড়িয়ে নিয়ে গেল পণ্ডিত রূপলালের মন্ত্র আর তার গলার স্বর—উড়িয়ে নিয়ে গিরে খাল চন্দ্রকূপনাথের কর্ণেই পৌঁছে দিলে বোধ হয়।

মন্ত্র পড়তে পড়তে রূপলাল এক এক চাপড়া ভেঙে নিতে লাগল সেই মন্তবড় পোড়া আটার ডেলাটার গা থেকে আর ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলতে লাগল চন্দ্রকূপে। সবুয়ে দেখলাম ধীরে ধীরে তলিয়ে গেল কাহার মধ্যে সেই চাপড়াগুলো। শেষে একটি নারকেলও ফেললে রূপলাল। সেটিরও ঐ গতি হল। তারপর এক একটা করে দশ-বারোটা কলকেতে গাঁজা ভরে আগুন না দিয়ে ছুঁড়লে রূপলাল সেই কাহার মধ্যে। সেগুলিও সব আন্তে আন্তে তলিয়ে গেল। কি জ্যান্ত দেবতা রে বাবা, সব কিছুই চোখের উপর গ্রাস করলে!

পাণ্ডার নিজের পূজা শেষ হলে পর, এল আমাদের রাজাদের পূজার পালা।

প্রথমেই দণ্ড খাটা ছুঁজনের হাত ধরে খাড়া করলে রূপলাল। তারা একে একে উঠেঃস্বরে নাম বাপের-নাম ইত্যাদি ঘোষণা করে আরও কত কি বলে গেল যার বিন্দুবিসর্গও কারও কানে চুকল না হাওয়ার জন্তে। তারপর নারকেল কলকে গাঁজা সব ছুঁড়ে ছুঁড়ে অর্পণ করলে দেবতাকে। দু'হাত সামনে থেকে কাদা তুলে নিয়ে বেশ করে তাদের কপালময় লেপে দিলে রূপলাল। তখন ওরা নক্ষিণা দিয়ে পাণ্ডার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলে। রূপলাল তাদের পিঠ চাপড়ে দিলে। শেষে ওরা নিজেদের হাতে এক এক খাবা কাদা তুলে নিয়ে ওপাশে গিয়ে বসল।

এইভাবে একের-পর-এক নাম ডাকতে লাগল রূপলাল আর এক-একজনে উঠে গিয়ে বধাকর্তব্য করে আসতে লাগল। গড় গড় করে বেশ চলতে লাগল পূজা দেওয়া। কোনও বাধা-বিঘ্ন ঘটল না। ওধারে ধোঁয়াও উঠছে আর বুজকুড়িও কাটছে সমানে চন্দ্রকুমার। সেই দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে অন্তরমনক হয়ে ভাবছিলাম—আমার নাম ডাকা হলে কি কি বলব গিয়ে দাঁড়িয়ে। এ পর্যন্ত কত রকমের কত পাপই যে করেছি তার ত ঠিক-ঠিকানা নেই। ভাগ্যে সবগুলো পাপের ফিরিস্তি এখানে দিতে হবে না, তা হলে আমারগুলো আওড়াতে আওড়াতেই সন্ধ্যা হয়ে যেত। ভৈরবীর কথা মনে হল—বেচারী ওখানে দাঁড়িয়ে ঠিক ওর সেই লক্ষ্মী-হত্যার পাপই কবুল করবে। আর কুস্তী? কুস্তী বলবে কী? করবে না কি কবুল যে থিরমলের মৃত্যুর জন্তে ওই দায়ী? কুস্তীর জন্তে একটা নারকেলও সঙ্গে এনেছেন ভৈরবী। তার কলকে আর গাঁজার জন্তে নাকি মূল্য ধরে দিলেই চলবে।

পূজার পালা শেষ করে ফিরে এসে আমার পাশেই বসে পড়লেন পোপটলাল। তাঁর মুখে চোখে বেন জোয়ার এসেছে। এখান থেকে নেমে পোপট নিশ্চয়ই সেই আগের স্বাস্থ্যবলি হয়ে যাবেন, সেই সদা হাসি-খুশি প্রাণ-খোলা সহৃদয় লোকটি।

ও কি! ও কি হল!

চন্দ্রকূপের দিকেই চেয়ে ছিলাম। হঠাৎ দেখি আর একটিও বুজকুড়ি উঠছে না। সমস্ত জায়গাটা একেবারে প্রাণহীন নিস্পন্দ নিখর। যেন জুড়িয়ে একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গেল চন্দ্রকূপ, নীচেকার আগুন নিবে গেল আচম্বিতে। সেই সঙ্গে সেই প্রচণ্ড ঝড়ও একেবারে শুক।

মুখ ফিরিয়ে দেখি রূপলাল উঠে দাঁড়িয়েছে আর তার পাশে দাঁড়ানো লোকটির একটা হাত চেপে ধরেছে। রূপলালের দুই চোখ দিয়ে আগুনের হলকা বেরুচ্ছে :

কে ওই লোকটা ?

সুন্দরলাল।

সুন্দরলাল বাজোরিয়া কাথিওয়াড়ের লোক নয়। গোয়ালিয়রের মাহুদ সুন্দরলাল। প্রায় চল্লিশ বছর হবে তার বয়স; ওর বাবা রাজকোটে ব্যবসা করে প্রচুর টাকা আর খানকয়েক বাড়ি রেখে গেছেন। গোটা তিনেক বিয়ে করেও যখন বংশরক্ষা হল না তখন একমাত্র উপায় যা হিংলাজ দর্শন : হিংলাজ দর্শন করে এলে মায়ের দয়ায় তার বংশরক্ষা হবে।

কিন্তু এখন বংশরক্ষার চেয়ে নিজের প্রাণরক্ষাই বড় কথা হয়ে দাঁড়াল যে !

রূপলাল তার হাতখানায় ঝাঁকানি দিতে দিতে গর্জন করতে লাগল—
“বল—বল তুমি জলদি—কি অত্যাচার কাজ করে, এসেছ তুমি এখানে। কবুল কর, স্পষ্ট করে স্বীকার কর যদি বাঁচতে চাও।”

সুন্দরলাল চুপ। মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে আছে। তার হাতে মোচড় দিতে দিতে আবার ধমক দিয়ে উঠল রূপলাল। ডুকরে কেঁদে উঠল সুন্দরলাল।
না—সে সজ্ঞানে একটিও স্ত্রীহত্যা বা ভ্রূণহত্যা করে নি।

“তবে ? বড় হল কেন বুদ্ধবুদ্ধ কাটা—বাবা চন্দ্রকূপ কিসের অস্ত্রে নররাজ হলেন তোমার বেলায় ?”

উত্তর নেই সুন্দরলালের মুখে। শুধু কান্নার ফুলে ফুলে উঠছে তার লবণস্রব। একেবারে বলির পাঠার মত অবস্থা তার। ব্যাপার দেখে ভয়

হল—লোকটাকে যদি খাকা মেয়ে ফেলে দেয় রূপলাল ? চন্দ্রকূপের ভিতর বার যেখানেই হোক—খাকা মেয়ে ফেলে দিলে আর রক্ষে নেই। সকলের গিছন দিয়ে সাবধানে পা ফেলে পৌছলাম ওদের কাছে। গিয়ে সুন্দরলালের কাছে একটা হাত রেখে দাঁড়ানাম। সে মুখ তুলে চাইলে আমার দিকে। বললাম—“সুন্দরলাল, ভ্রূণহত্যা তুমি না করতে পার, কিন্তু তোমার কি মনে পড়ে এমন কোনও ব্যাপার যে, তোমার দ্বারা কোনও মেয়ের গর্ভ হয়েছিল যে-মেয়ে তোমার স্ত্রী নয় ?”

দপ করে আলো জলে উঠল সুন্দরলালের চোখে। চীৎকার করে উঠল সে—“হাঁ হাঁ মহারাজ, এইবার আমার মনে পড়েছে। কিন্তু তাকে ত আমার মা বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। তারপর তার কোনও খবরই পাই নি আমি।”

বললাম, “খবর তার নাওনি ভালই করেছে। নিলে জানতে পারতে যে সেই মেয়ে তোমাদের কাছ থেকে গিয়ে গর্ভ নষ্ট করেছে কিংবা সে নিজেই মরে সব বিপদের হাত থেকে উদ্ধার পেয়েছে। আর এ ছুটির যেটিই ঘটে থাকুক তার জন্তে তুমিই দায়ী। এইটুকুই বাবার কাছে কবুল করে কমা চাও। তাহলেই বাবার দয়া হবে।”

ঘুরে দাঁড়াল সুন্দরলাল চন্দ্রকূপের দিকে। দু হাত জোড় করে বলে গেল সেই মেয়ের নাম আর তার সঙ্গে যা যা ঘটেছিল আগাগোড়া সেই কাহিনী। সঙ্গে সঙ্গে বার বার নিজের নাক-কান নিজের দু হাতে মলতে লাগল।

আবার একটি-দুটি করে বুজকুড়ি কাটতে আরম্ভ হল চন্দ্রকূপে। আবার হাওয়া বইতে লাগল। সুন্দরলালের হাতে নারকেল কলকে গাঁজা তুলে দিয়ে রূপলাল মন্ত্রপাঠ শুরু করলে। সবাই বার বার জয়ধ্বনি দিতে লাগল, “জয় বাবা চন্দ্রকূপ থামী মহারাজ, জয় !”

আবার পা টিপে টিপে নিজের জায়গার ফিরে চললাম। নাম ডাকলে উঠে আসব।

“হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—হা হা—”

সমস্ত শরীরের তিতর দিবে বেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। মুখ তুলে চেয়ে দেখি—ওই—ওই যে সে এসে দাঁড়িয়েছে একেবারে ঠিক আমাদের সামনা-সামনি চক্রকূপের ওপারে।

দু হাতে নিজের মাথার দু পাশের চুল মুঠি করে ধরে আবার সেই উৎকট হাসি হেসে উঠল থিরমল—“হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—হা হা!”

প্রাণপণে চীৎকার করে উঠলাম, “থিরমল, হ’শিয়ার—আর এক পা এগিও না, খবরদার—আর এক পা—”

আমার কথা শেষ হল না। থিরমল প্রচণ্ড বেগে লাফিয়ে উঠল উপর দিকে। পরমুহূর্তেই তার দেহটা নামল এসে সামনে চক্রকূপের মধ্যে। বহু উচুতে ছিটকে উঠল কাণা। কি জানি কেন সেই মুহূর্তেই চোখ বন্ধ করলাম, কিংবা সম্পূর্ণ অনিচ্ছায় আর অজ্ঞাতে দু চোখ বুজে গেল আমার।

তৎক্ষণাৎ খুলেও গেল চোখ। দেখতে পেলাম আকাশের দিকে উচু করা ছ’খানি পা মাত্র। দম বন্ধ করে চেয়ে রইলাম সেই পা ছ’খানির দিকে। কাঁপতে কাঁপতে পা ছ’খানি কাদার তলায় তলিয়ে গেল।

পালাচ্ছি।

পাণ্ডা পুরুত বাজী বজ্রহান মহাপাপী আর মহাপুণ্যবান সবাই পালিয়ে যাচ্ছি প্রাণ নিয়ে। রইল পূজা করা, রইল ভোগ নিবেদন করা, রইল বাকি অনেকের নারকেল গাঁজা আর কলকে হোঁড়া। হড়মুড় করে ছুটে পালাচ্ছি সবাই। যাদের তখনও নিজ মুখে নিজেদের মহাপাপ কবুল করা হয় নি, যারা তখনও দেবতার কৃপা ভিক্ষা করে হকুম নিতে পারে নি, তারাও পালাচ্ছে। আর দরকার নেই, কারও মনের কোণে আর ভিলমাত্র আকাঙ্ক্ষা নেই এই দেবতার কাছে কল্পনা ভিক্ষা করবার। দেবতা এ নয়—দেবতার আবরণে নৃশংস দানব। প্রাণের মায়া ত্যাগ করে বুকের আলা জুড়াবার জন্তে যার

কাছে আমরা ছুটে এসেছি—সে ছদ্মবেশী শিশু। ওর নির্লজ্জ সুধার উলঙ্গ পরিচয় মর্মে মর্মে পেয়েছি আমরা। তুল আমাদের ভেঙেছে—কমা কৃপা অহুকম্পা সমবেদনা এ-সবের জন্তে ওর কাছে মাথা খোঁড়বার আর লেশমাত্র প্রবৃত্তি নেই আমাদের। দোষ ক্রটি পাপ অপরাধ যা-কিছুই করে থাকি এ জীবনে, করেছি মানুষের কাছেই। সে-সবের মার্জনা পাবার জন্তে মানুষের কাছেই মাথা খুঁড়তে হবে। দেবতার কাছেও না, দানবের কাছেও না। ওরা হৃদয়েই একই বস্তুর এপিঠ আর ওপিঠ। নিজেদের শক্তির দস্তে ওরা এতদূর উন্নত যে, মানুষের বুক-নিউড়ানো স্থখ দুঃখ হাসি কান্না ওদের কাছে নিতান্ত তুচ্ছাতুচ্ছ ব্যাপার, মানুষের স্তবস্তুতি দয়্যভিকা ওদের কাছে নগণ্য পরিহাস-বোণ্য পাগলের প্রলাপ।

চোখ বুজে পালাচ্ছি।

প্রকাণ্ড হাঁ করে পিছনে ভেঙে আসছে রাক্ষস। ধরতে পারলে টপ করে ফেলে দেবে সেই হাঁ-র মধ্যে। চিৎকারেও না একবার—একেবারে গ্রাস করবে চক্ষের নিমেষে। পিছন ফিরে তাকাবারও সাহস নেই কারও, সে প্রয়োজনও নেই। স্পষ্ট পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে কানে। শুধু পায়ের শব্দ কেন, ওর উৎকর্ষ নির্লজ্জ হাসি কানের মধ্যে ঢুকছে, মাথার মধ্যে হাতুড়ির ঘা মারছে, সেই হাসি শুনে বৃকের রক্ত যাচ্ছে শুকিয়ে। শরীরের প্রতিটি তন্ত্রী ধর ধর করে কাঁপছে—সেই প্রেতের হাসি অনবরত ছোট্টাছুটি করছে পায়ের নখ থেকে মাথার তালু পর্যন্ত—“হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হা হা—”

উর্ধ্বশ্বাসে পালাচ্ছি।

কেউ কারও দিকে ফিরেও তাকাচ্ছি না। কে রইল পিছনে পড়ে আর কেই বা গেল দানবের গ্রাসের মধ্যে সেরিকে অন্ধেপ নেই কারও। দরকারও নেই। কোনও রকমে দূরে চলে যাওয়া—দূরে, আরও দূরে—আরও অনেক দূরে—যেখান থেকে নজরেও পড়বে না ঐ রাক্ষসের মুখের হাঁ। চোখ বুজেও

দরতে পাচ্ছি কালো থকথকে পুঁজ রক্ত ক্রেন। বিরাট মুখব্যাদান করে

আছে মহাপিশাচ, টগবগিয়ে ফুটেছে সেই পুঁজ রক্ত ক্লেদ তার হাঁ-র মধ্যে। যুগযুগান্ত ধরে বাদেব গ্রাস করেছে, ঐ ঘন কালো রক্ত তাদেবই। হজম হয় নি। অত রক্ত হজম করা সহজ কথা নয়, তাই উপ্ছে উঠছে ওর মুখগহ্বরে। তবু ওর ক্ষ্মিবৃত্তি হয় নি। কোনও কালে তৃপ্তি হবে না ওর নৃশংস লালসার। কোনও মহাবলি দিয়েই তুষ্ট করা যাবে না ওই দুর্দান্ত শত্রুকে। পালাও পালাও, যে-ভাবে হোক যে-করে হোক আগে ওর ওই বীভৎস দৃষ্টির আড়ালে লুকিয়ে কেল নিজেকে। তারপর হিসেব করা যাবে—কে কে রইল আর কে কে গেল।

সবই পড়ে রইল সেখানে। ময়তত্র দানদক্ষিণা নারকেল গাঁজা-কলকে আর সেই মস্তবড় পোড়া আটার ডেলাটা। কোনও কিছুই দিকেই ফিরে চাইলাম না আমরা। সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্য—আকাশের দিকে উচু করা হাঁটু থেকে পাতা পর্যন্ত ছুখানা পা! থর থর করে কাঁপছে পা ছুখানা—কাঁপতে কাঁপতে অদৃশ্য হয়ে গেল কাদার মধ্যে। ঠিক সেইখানেই উচু হয়ে উঠল একটা ধামার মত বুজবুজি—আবার সেটাও ঠিক সেইখানেই ভেঙে মিলিয়ে গেল। কয়েকটা মুহূর্তের মধ্যেই ঘটে গেল ব্যাপারটা এতজোড়া চোখের সামনে। কিছুই করতে পারলাম না আমরা, একটি আঙুলও তুলতে পারলাম না। পাষণ হয়ে চেয়ে রইলাম সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্যের দিকে।

একটা প্রাণফাটা চীৎকার করে উঠল কুস্তী। সেই চীৎকার আমাদের সকলকে সঙ্গে করে ধাক্কা মারলে। ধাক্কা বেয়ে সবাই ছিটকে পড়লাম পিছন দিকে, তার ফলে সেই মাটির পাহাড়ের গড়ানে গা বেয়ে গড়িয়ে হড়কে হড়মুড় করে সকলে এসে পৌঁছে গেলাম নীচে। হাড়গোড় ভাঙল-চুরল কিনা সেদিকে কারও খেয়াল নেই। উঠে দাঁড়িয়েই আবার দৌড়। উচুনিচু টিবি-টিলা, খাল-খন্দ টপকে ডিঙিয়ে ছুটেতে লাগলাম সবাই।

আর কিছু খেয়াল নেই। কি ভাবে কেমন করে বে উটের কাছে গিয়ে পৌঁছলাম আর তারপর সামনের কুমার ধারে কখন গিয়ে উপস্থিত হলাম—

সে-সব কিছুমাত্র মনে নেই। শুধু মনে আছে, সেখানে পৌঁছেই চাদর মুড়ি দিয়ে একটা গাছতলায় আমি শুয়ে পড়ি।

যথাসময়ে সেই সর্বনেশে অন্তত দিনটা যথাস্থানে গড়িয়ে চলে গেছে, এসেছে সর্বহুঃখহারিণী শান্তিময়ী রাত্রি। এসে গায়ে-মাথায় সর্বাঙ্গে শীতল হাত বুলিয়ে সেই কালনিদ্রা থেকে জাগিয়ে তুললে। চাদর ফেলে চোখ মেলে উঠে বসলাম। কি হয়েছে, কোথায় ছিলাম, এখন কোথায় এসেছি, এ-সব কোনও কিছুই খেয়াল করতে পারলাম না। মাথার ভিতরটা যেন ফোঁপরা হয়ে গেছে। বেশ কিছুক্ষণ লাগল নিজেকে নিজে খুঁজে ফিরে পেতে। একটু একটু করে সবই আবার উদয় হল মনে। তখন চতুর্দিকে চেয়ে দেখলাম।

একটিমাত্র মূর্তি স্থির হয়ে বসে ছিল মাথার কাছে। আর বাকি সবাই চারিদিক ঘিরে শুয়ে পড়েছে। রাত যে তখন কত তা ঠিক ঠাণ্ডর করতে পারলাম না। উপর দিকে চেয়ে দেখলাম সন্ধ্যাতারাটা প্রায় মাথার উপর এসে পড়েছে।

আমাকে ঘেঁষে আমার ডানপাশে যে শুয়ে ছিল সে তড়াক করে লাফিয়ে উঠে বসল। সবিস্ময়ে দেখলাম, সুখলাল—আমাদের ছোট ঠাকুরমশাই, পণ্ডিত সুখলাল পাণ্ডা, হিংলাজকা ছড়িওয়ালে। এতকণে মনে পড়ে গেল, সেখানে সেই চন্দ্রকূপের মাথায় আমাকে জড়িয়ে ধরে শ্রীমান ভিরমি ধায়। তারপর তাকে বুকে তুলে নিয়ে যে কেমন করে আমি নীচে এসে পৌঁছই সে-কথা কিছুতেই মনে করতে পারলাম না। উঠের কাছে পৌঁছে তাকে বুড়ো গুলমহম্মদের হাতে দিয়ে তার কথা একেবারে তুলেই গিয়েছিলাম। সুখলাল আমার একখানা হাত তার ছোট দুহাতে চেপে ধরে মুখের দিকে তাকিয়ে চুপ করে বসে রইল। একটিও কথা বেরুল না তার মুখ দিয়ে, শুধু তার কালো কালো চোখ দুটো অন্ধকারের মাঝে জল জল করে জলতে লাগল।

ছেলেটার একমাথা কৌকড়া চুলের মধ্যে নিঃশব্দে আঙুল ঢালাতে লাগলাম।

তখন চাদর মুড়ি দিয়ে বসা মূর্তিটি নড়ে উঠল। চাদরের ভিতর থেকে চাপা গলায় শোনা গেল—“গৃহাতিগৃহগোপ্ত্রী স্বঃ গৃহাণামংকৃতং জপং।” মন্ত্র-পাঠ সমাপ্ত করে চাদর খুলে ভৈরবী মালা-ঝুলি গলায় ঝুলিয়ে পাশের আলোটা উসকে দিলেন। সেই আলো তাঁর মুখে পড়াতে ভাল করে দেখতে পেলাম তাঁর মুখ। মনে হল তাঁর চোঁট খরখর করে কাঁপছে আর সেই অবাধ্য চোঁটের কাঁপুনি তিনি কামড়ে ধরে থামাবার চেষ্টা করছেন।

ততক্ষণে সুখলাল হাত ধরে টানাটানি জুড়ে দিয়েছে। এখনই কুয়োঁর কাছে যেতে হবে। সে জল তুলে দেবে আর সেই জলে আমি স্নান করে আসব।

গলাটা কেসে পরিষ্কার করে নিয়ে ভৈরবী বললেন—“জল ওখানে তোলা আছে,” বলে আলোটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন।

বললাম, “আমায় জাগাও নি কেন?”

কোনও উত্তর নেই।

আবার জিজ্ঞাসা করলাম, “খেয়েছে সবাই?”

উত্তর দিলে সুখলাল—“আর-সকলের খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেছে, আপনি আর মাতাজী শুধু বাকি।”

ভৈরবী একভাবে আলোর দিকে চেয়ে আছেন।

উঠে পড়লাম। শরীর বেশ করবারে বোধ হচ্ছে। মাথাটাও বেশ হাল্কা হয়ে গেছে। বললাম—“তোমাদের আর যেতে হবে না। কুয়োঁটা কোন্ দিকে?”

সুখলাল হাত ধরে টানতে লাগল—“চলুন দেখিয়ে দিচ্ছি।” বিনা বাক্যব্যয়ে ভৈরবী আলোটা হাতে করে পিছু পিছু চললেন।

কাছাকাছি ঘেঁষাঘেঁষি সবাই শুয়ে ঘুমচ্ছে। একটু দূরে উট দুটো বসে আছে। ওদের কাছ দিয়ে যাবার সময় বুড়ো একবার উঠে বসল, নিজের কপালে হাতটাও ঠেকালে—কিন্তু মুখে কোনও সন্তোষ নেই।

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে দুটো পা আড়ষ্ট হয়ে গেল। কই—সে কই?

পিছন থেকে ভৈরবী বললেন, “কি হল আবার, দাঁড়ালেন কেন ?”

“কুস্তী—কুস্তী কই ?” কোনও রকমে কথাটা বেরল গলা দিয়ে ।

ভৈরবী বললেন, “ভালই আছে । ওই ওখারে একলা শুয়েছে আজ । মেয়ে জাত—সহজে মরে না ।”

“কিছু খাওয়া-দাওয়া ? খেয়েছে ও কিছু ?”

সুখলাল উত্তর দিলে—“একখানা রুটি খেয়েছে । পোশটলাল জোর করে খাইয়েছেন ।”

অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়ে আবার পা চালালাম । কুরোটা বেশ দূরে কয়েকটা বড় বড় গাছের আড়ালে । সেখানে পৌঁছে দেখা গেল উট-ছাগলের জল খাবার কাঠের ডোঙাটা পরিষ্কার করে ধুয়ে জল ভরতি করে রাখা হয়েছে । সুখলাল আর ভৈরবী গাছতলায় বইল আলো নিয়ে, আমি স্নান-টান সেরে নিলাম ।

কিরে আসতে আসতে ভৈরবী বললেন—“চা খেতে খেতে ভাত হয়ে যাবে, আধ ঘণ্টাও লাগবে না । আজ দু'হুটো দিন ত পেটে কিছু পড়েনি ।”

“সে কি ! এখনও রান্না হয় নি তোমাদের ?”

ভৈরবী চুপ করে রইলেন । সুখলাল বক বক করতে লাগল । তার কথা থেকে এইটুকু বুঝলাম যে এখানে পৌঁছে সেই যে ভৈরবী মুখ বন্ধ করে চাদর মুড়ি দিয়ে বসেছেন আর এই এতক্ষণে মুখ খুললেন । কারও সঙ্গে একটি বাক্যালাপ পর্বত করেনি, কেউ আসেও নি শুঁকে ঘাঁটাতে । সন্ধ্যার সময় একবার মাত্র উঠে গিয়েছিলেন স্নান করে আসতে,—কিরে এসে আবার ঠিক সেই এক জায়গাতেই বসেন চাদর মুড়ি দিয়ে । আমি উঠে বসতে তবে চাদরের ভিতর নড়ে উঠেছেন ।

হাসি গেল । আশ্রয় করে পড়ে ঘুমিয়েছি আমি আর একজন ঠায় বসে কাটিয়েছে একভাবে, জল পর্বত মুখে না দিয়ে । খাবকা ছুঁতোগ ভোগা আর কাকে বলে ।

উট দুটোর এপাশে এসে দেখা গেল গাছতলার আগুন জ্বলে কে যেন কি চড়িয়েছে। ভৈরবী বললেন, “এখন আবার কার কি রান্নার দরকার হল শুধানে?”

আরও কাছে এসে দেখা গেল চুলো জালিয়ে তার উপর ডেকচিটা বসানো হয়েছে আর তার সামনে দু'হাটুতে মুখ গুঁজে যে বসে আছে সে অল্প কেউ নয়—কুস্তী।

কাছে গিয়ে ভৈরবী বললেন, “তুই আবার উঠে এলি কেন? দুটো ভাত ত আমিই রেঁধে নিতে পারতাম!”

কুস্তী গিল খিল করে হেসে উঠল। হাটুতে মুখ গোঁজা অবস্থাতেই জবাব দিলে, “কেন—হয়েছে কি আমার? আমি রান্না করে দিলে আপনারা খাবেন না নাকি?”

সেই ভাসি কানে যেতে চমকে উঠলাম। সত্যি তাহলে কিছু হয়নি ওর। সবই সম্ভব—সৃষ্টিকর্তার সবচেয়ে আজব সৃষ্টি হচ্ছে মেরেবা।

একে একে উঠে এল রূপলাল পোপটতাই গুলমহম্মদ আরও অনেকে। ওরা তাহলে কেউই ঘুমোয় নি। শুধু মটকা মেরে পড়ে ছিল এতক্ষণ। সবাই একে একে এসে বসল সামনে। কিন্তু মুখে কারও কথাটি নেই।

বিল্লী কাণ্ড। এতগুলো লোক মুখোমুখি বসে আছি কিন্তু একটি কথা নেই কারও মুখে। শেষে গুলমহম্মদকে জিজ্ঞাসা করলাম, “কি শেখ সাহেব, আর কদিন লাগবে হিংলাজ পৌছতে?”

এতক্ষণ পরে শেখ সাহেবের তত্ত্বা ছুটে গেল। ‘জী হুজুর’, বলে কপালে হাত ঠেকালে। আবার সেই একই প্রশ্ন করলাম তাকে, এবার মগজের মধ্যে ঢুকল কথাটা। একবার সকলের মুখের উপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে আরম্ভ করলে—“এই ধরুন না, কাল আমরা যেখানে পৌছব সেখান থেকে আমার বাড়ি বেশি দূর নয়। রাতে গিয়ে আবার ভোর বেলায় ফিরে আসা যায়—”

রূপলাল তেরিয়া হয়ে উঠল, “তা বলে আমরা একদিন দেবী করতে পারব

না সেখানে। সোজা চলে যাব হিংলাজ। এবার আর ও-সমস্ত আবদার চলবে না তা আগেই বলে রাখছি।”

বুড়ো একেবারে চুপ করে গেল। রূপলাল এবার আমার কথার জবাব দিলে।

“কাল বেলা থাকতে থাকতে এখান থেকে ওঠা যাবে। বেশি রাত হবে না সামনের কুয়োর কাছে পৌছতে। সেখানে রাতটা ঘুমিয়ে ভোরবেলা আবার চলতে আরম্ভ করলে বেলাবেলি যেখানে পৌছব আমরা, সেখান থেকেই উট ছেড়ে দিতে হবে। তারপর—”

এবার পোপটভাই খামালেন তাকে—“এবার থাম। আগে উঠি এখান থেকে, তারপর যা হবার তখন হবে।”

কে একজন জিজ্ঞাসা করলে, “আজ ভোর রাতে এখান থেকে ওঠা হবে না কেন?” রূপলাল খিঁচিয়ে উঠল—“দেখতে পাচ্ছ না একটা লোক অস্থস্থ, কাল সকালে যাওয়া যায় কি করে?”

বেশ ঘাবড়ে গেলাম। আবার আর-একজন পড়ল না কি। লোকটি কে?

গুলমহম্মদ খাড়া হয়ে বসে এতক্ষণ পরে আবার কথা বললে, “জরুর, আলবত! স্বতন্ত্র না বাবার তব্বিত ঠিক হচ্ছে ততক্ষণ এখান থেকে উঠছে কে।”

এবার সত্যই আশ্চর্য হয়ে গেলাম।

“তার মানে? কার তব্বিত খারাপ? কার জন্তে কাল সকালে যাওয়া বন্ধ থাকবে?”

একান্ত বিনীত ভাবে পোপটভাই জবাব দিলেন, “আজ্ঞে আপনার কথা আমরা ভাবছিলাম।”

এতক্ষণ পরে সমস্ত বুঝতে পেরে হো হো করে হেসে উঠলাম। “আমার হয়েছে কি যে তোমরা এত মাথা ঘামাচ্ছ? সারাটা দিন ঘুমিয়ে এখন আমি এমন চাঞ্চা হয়েছি যে, বল ত এখনই রওয়ানা দিতে পারি। আচ্ছা মুশকিল যা হোক—আমার জন্তে তোমরা এমন মনমরা হয়ে আছ!”

এইবার রূপলালও চাকা হয়ে উঠল। হঠাৎ সেই অর্ধেক রাতে এক বিকট হুকার দিয়ে উঠল সে—“জয় হিংলাজ মাতা রাণী কি—”

যারা শুয়ে ছিল তারাও লাফিয়ে উঠে বসে উত্তর দিলে—“জয়!”

তারপর ওরা কলকে ধরালে, আর সুখলাল এসে ডাক দিলে—ভাত বাড়ি হচ্ছে গেছে।

খেতে বসলাম – সুখলালকে নিয়ে। সে ত কিছুতেই থাকে না। একবার সন্ধ্যার সময় রুটি খেয়েছে যে। তৈরবী তাকে জোর করে বসালেন। সন্ধ্যা কেন, দিনের বেলাতেও কিছু খায় নি ছেলেটা, ঠার আমার গা ঘেঁষে শুয়ে ছিল। পোপটলাল জোর করে বোধহয় একখানা রুটি খাইয়েছেন।

পরিবেশন করছে কুস্তী। অনেকদিন পরে আজ আবার সে মাথা ঘষে স্নান করেছে। কক চুল শুকনো মুখের হুপাশ দিয়ে এসে পড়েছে তার বুকের উপর। লালপাড় শাড়িখানা পরেছে আবার আজ। আধা-অন্ধকারে চলছে কিরছে, কাজকর্ম করছে। লক্ষ্য করে দেখলাম যেন কোনও কিছুই হয় নি তার। এতটুকু আড়ষ্টতাব বা অবসাদ নেই তার চলাফেরায়। বত দেখছি ততই একটা চিন্তা মাথায় আসছে আমার—এই স্বচ্ছন্দ চলাফেরার আড়ালে অস্ত কিছু নেই ত? এই হাসিখুশি ভাবটার ঠিক তলায়—একটি অস্তঃসলিলা বিষের নদী বইছে না ত? ‘বাকু বাঁচা গেল’, বলে কুস্তী কি তার মন থেকে সেই মধ্যান্তিক ছবিটা মুছে কেগতে পেরেছে? কি জানি—মেয়েরা হচ্ছে বিধাতার আজব সৃষ্টি।

তারপর তৈরবী কুস্তীকে নিয়ে খেতে বসলেন।

সবাই শুয়ে পড়েছে। আমার মাথার কাছে কবল বিছিয়ে শুয়েছেন তৈরবী। চাপা গলায় তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, “আচ্ছা এখান থেকে ফেরবার কি কোনও উপায় নেই?”

এ আবার কি কথা! জিজ্ঞাসা করলাম, “কোথায়?”

“একেবারে করাচী।”

“তার মানে?”

“মানে, আর এক পা এগোবার ইচ্ছে নেই আমার। যা হিংলাজ মাথায় থাকুন। এখন ভালয় ভালয় ফিরতে পারলে বাঁচি।”

“কেন? আমাদের কোন্ কতিটা হয়েছে? এ পর্যন্ত যা হিংলাজের দরায় গায়ে আঁচড়টুকু পর্যন্ত লাগে নি। বার কপালে বা ঘটবার ঘটছে, তাতে আমাদের কি?”

“এইবার আমাদের কপালেও ঘটবে। দরকার নেই আর তীর্থ করে। কাল সকালে উটগুলোদের বলুন যে একটা উট নিয়ে আমাদের করাচী পৌঁছে দিক। একটা উটের ভাড়া ত আমরাই দিয়েছি।”

“আমার ত আর মাথা ধরাপ হয় নি যে হিংলাজের দরজায় এসে থাকে দর্শন না করে ফিরে যাব। আর তা ভিন্ন দু-হুটো মেয়েমানুষ নিয়ে এই পথ দিয়ে মাত্র একজন লোকের সঙ্গে যাওয়া—এতবড় বুকের পাটাও আমার নেই।”

একটু চুপ করে থেকে ভৈরবী বললেন, “তবে আগে মাথাটা ধরাপ হোক বোল-আনা। তখন ফেরা যাবে। দু-হুটো মেয়েমানুষ আবার কে? আমরা কাকেও সঙ্গে করে আনি নি, কারও ভার দায়িত্বও নেই আমাদের কাঁধে। যেতে হয়, কাল আমরা দুজনেই যাব ফিরে। ডাকাতে মারে রাস্তায় সেও ভাল, তবু এ-যাত্রা আর একপাও আমি বাচ্ছি না। ঐ আপদের হাত থেকে রেহাই না পেলো সর্বনাশ হয়ে যাবে, এ আমি আজই ভাল করে বুঝেছি।”

আবার একটু চুপ করে থেকে ভৈরবী আরম্ভ করলেন, “মাথা ধরাপ হয় নি—আর হবার বাকি আছে কতটুকু? সাঝাটা দিন হ'ল ছিল কোথায় আপনার? দলস্থল সবাইকে ডেকে জিজ্ঞাসা করুন না, সকলের প্রাণ উড়ে গিয়েছিল আপনার অবস্থা দেখে। একজন মাথা ধরাপ হয়ে বেধানে যাবার গেছে, এবার আপনার পালা। ওই সর্বনেশে-মেয়ে বার কাঁধে ভর করবে তারই সর্বনাশ হবে এ আমি বলে রাখলুম।”

কাঠ হয়ে শুয়ে শুয়ে শুনিছি। বলে কি! এবার কুন্তীকেও ফেলে যাবে না কি?

একটু দম নিয়ে আবার বলতে লাগলেন ভৈরবী, “সারাটা দিন এক আসনে বসে জপ করেছি আর মাকে জানিয়েছি। মা একবার মুখ তুলে চেয়েছেন। দলহুহু সবাই, এমন কি উটওলারা পর্যন্ত, একেবারে আশা ছেড়ে দিয়েছিল অবস্থা দেখে। হুহু মাহুহু, কারও সঙ্গে কথাও বলে না, কোনও দিকে চেয়েও দেখে না, এতখানি পথ ঘুমতে ঘুমতে চলে এল—ঠিক এই রকম অবস্থাই হয়েছিল সেই ছোড়ার। সারাটা পথ আমি হাত ধরে নিয়ে এলাম আপনাকে, একবারের জন্যে আমাকেও চিনতে পারলেন না। মাথা খারাপ হতে আর বাকি আছে কতটুকু আপনার?”

ততক্ষণে আমি উঠে বসেছি। বসে হাঁ করে শুনিছি সব কথা। এবার একটু একটু মনে হতে লাগল—আজ সারাদিন আমি কি করেছি, কি দেখেছি, কি শুনেছি। কিছু না, কিছুই করিনি দেখিনি বা শুনিনি—সুখলালকে গুলমহম্মদের হাতে দিয়ে শ্রেফ ঘুমিয়ে পড়েছি। হাঁ, হাঁ—এইবার সব মনে পড়ছে। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখেছি। স্বপ্ন দেখেছি শুধু আমার মাকে। একেবারে ছোটবেলাকার সব ঘটনা। বেদম দুর্বস্তুপনা করছি। তুটো ছাগলছানা নিয়ে বাড়িঘর তোলপাড় করে বেড়াচ্ছি। মা এসে ধরলেন। ধরে বেঁধে রাখলেন খাটের পায়ায় সঙ্গে দুখানা গামছা পাকিয়ে। কঁদতে কঁদতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি। ঘুম ভাঙতে দেখি মার কাছে শুয়ে আছি, তখন অনেক রাত। ভয় পেয়ে মাকে জড়িয়ে ধরে আঁতকে উঠলাম। মা বলছেন—“পাজী ডাকাত—সারাদিন দস্তিপনা করে বখন আলাস আমাকে, তখন মনে থাকে না রাতের কথা? অন্ধকার হয়েছে কি ছেলে একেবারে আলাদা মাহুহু হয়ে গেল। আঁচলের তলায় ঢুকে একেবারে কত ভালমাহুহুটি এখন। যা না, যা ছাগলছানা নিয়ে দৌড়োদৌড়ি করে সব ভেঙেচুরে তছনছ করবে যা।”

আমার মায়ের মুখখানি চোখের উপর ভেসে উঠল। সেই আধ হাত চওড়া লাল পাড় শাড়ির ঘোমটার ভিতর এতবড় সিন্দূরের টিপ। সেই চোখ দুটি। যখন আমার শাসন করতেন মা, তখনও সেই চোখদুটির দৃষ্টি আমার গায়ে মাথায় সর্বদা সে কি মিষ্টি স্পর্শ বুলিয়ে দিত। চোখ বুজে মনে করলে আমার মায়ের সেই দৃষ্টির পরশ আজও সর্বদা অহুতব করি। আজও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি মায়ের দু কানের উপর থেকে নীচে পর্যন্ত অনেকগুলো সোনার মাকড়ি, আর একমুখ পান স্নান মায়ের সেই হাসি।

ভৈরবীর কথার আর কান ছিল না। মাকে চাক্ষুষ দেখতে দেখতে কোথায় কতদূরে চলে গিয়েছিলাম। স্পষ্ট, একেবারে স্পষ্ট মার গলার আওয়াজ কানে গেল। বলছেন, “এতদূর এসে তুই একবার আমাকে দেখা না দিয়ে ফিরে যাবি?”

হঠাৎ তন্দ্রা ছুটে গেল। চীৎকার করে উঠলাম, “গুলমহম্মদ, গুলমহম্মদ!”

চীৎকার শুনে অনেকে উঠে বসল। বুড়াও ওখার থেকে চীৎকার করে লাড়া দিলে। রূপলাল এসে সামনে দাঁড়াল।

আকাশের পশ্চিম দিকে চেয়ে দেখলাম। এখনও জল জল করে জলছে বড় তারাপটা। জলুক—আর দেরি করা কাজের কথা নয়। বললাম, “রূপলাল, দশ মিনিটের মধ্যে তৈরী হও সবাই। ওদের বল, মালপত্র তুলুক। এখনই যাত্রা আরম্ভ হবে। আর একমিনিটও কোথাও দেরি করা চলবে না। একেবারে সোজা চল হিংলাজ!”

একসঙ্গে অনেকে চীৎকার করে উঠল, “হিংলাজ মারীকি—”

একমাত্র আমিই শেষ করলাম কথাটি, “জয়!”

সোজা চল হিংলাজ।

কিন্তু হিংলাজের পথ সোজা নয়। সোজা নয় মার কোলে ওঠা, সহজ নয় মায়ের মুখের হাসি দেখা। তখন সবই সোজা সবই সহজ ছিল যখন

নিবিচারে ছুটামি করে মাকে সারাদিন আলিয়েছি বিরক্ত করেছি - আবার ভয় পেয়ে দৌড়ে গিয়ে মাকেই আঁকড়ে ধরেছি। সে সময় এ-সমস্ত সহজ ছিল, সোজা ছিল। তারপর জ্ঞানবুদ্ধি বাড়তে লাগল,—মাতৃভক্তি সবচেয়ে ভাল রচনা লিখে খুলে ভাল নম্বর পেলাম, বেশ করে শিখলাম কি ভাবে মায়ের সঙ্গে ব্যবহার করলে লোকে নিন্দে করবে না। মার সঙ্গে মেপেজুখে হিসেব করে কথা বলতে শিখলাম। খুবই সাবধান হয়ে চলতে শিখলাম বাতে মায়ের মর্মান্বয় আঘাত দিয়ে না কেলি। আর সেই সঙ্গে এও শিখলাম যে, ভয় পেলে মাকে গিয়ে আঁকড়ে ধরা কতখানি লজ্জার কথা। তার চেয়ে ঢের ভাল, ঢের বড় কথা হচ্ছে—মার কাছ থেকে দূরে সরে গিয়ে নিজের বিচার বুদ্ধি ক্ষমতার উপর নির্ভর করে চলা। তাইই এতকাল করেছি, এড়িয়ে চলেছি মাকে, মাকে লুকিয়ে মায়ের চোখে ধুলো দিয়ে অনেক দূরে চলে এসেছি। কাজেই আর কিছুই সহজ নয়, কিছুই সোজা নয়। সবই গোলমালে বাঁকাচোরা গোলকথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিজ্ঞানবুদ্ধি হয়েছে যে, জ্ঞানবিচার করতে শিখেছি কিনা—তাই মাও নিশ্চিত হয়ে একেবারে হাল ছেড়ে দিয়েছেন; নিজের ভালমন্দ বুঝতে শিখেছি কিনা, তাই আর গামছা পাকিয়ে খাটের পায়ের সঙ্গে বেঁধে রাখবার প্রয়োজন নেই মায়ের। ‘চরে খেতে শিখেছে, এবার চরেই থাক’ বলে, জননীও নিশ্চিত হয়ে মুখ ফিরিয়ে বসেছেন।

তাই হাতড়ে বেড়াচ্ছি—কোনটা ভাল আর কোনটা মন্দ, কোনটা পথ আর কোনটা বিপথ। পথ দেখাবার, ভাল মন্দ চিনিতে দেবার ভার যার উপর, সেই মা-ই নিশ্চিত হয়ে মুখ ফিরিয়ে বসেছেন। সোজা পথ আর সোজা নেই, বেকতে বেকতে করাচীর হাব নদী পার হয়ে এত বড় মরুভূমিটা ডিঙিয়ে অঘোর নদীর কিনারায় গিয়ে শেষ হয়েছে।

নদীর নাম অঘোর।

সেই নদী পার হলেই মায়ের স্থান। সেই নদীর এপারে সবই ঘোর

সবাই ভীষণ, সবাই বেহঁশ সবাই অশান্ত। ওপারে শান্তিময়ী মায়ের স্থান। শান্তিময়ী জননী এপারে নেই—অঘোর নদীর ওপারে আছেন। সেই অঘোর নদীতে স্নান করে এপারের ধুলো-ময়লা সব ধুয়ে ফেলে তবে মায়ের স্থানে গিয়ে উঠতে হবে।

কিন্তু এখনও অঘোর নদী বহুদূর।

পূর্বদিক ফর্সা হয়ে উঠছে। পূর্বমুখোই চলেছি আমরা। বালির মধ্যেও চাব-আবাদ চলছে। বেঁচে থাকার তাগিদে চেষ্টার ক্রটি করছে না মানুষ। বালি সরিয়ে মাটি বার করেছে। কুয়ো খুঁড়ে জল বার করেছে। পায়জামা হাঁটুর উপর তুলে নিচু হয়ে কোদাল চালাচ্ছে। উট দিয়ে আর বাই হোক লাঙল টানানো বার না নিশ্চয়ই। এখানে-ওখানে চাব ত চলছে দেখছি— একজোড়া উটকে লাঙল টানতে ত দেখলাম না কোথাও। উট ত আর গোকন নয়, লাঙল টানলে উটের মর্যাদায় আঘাত লাগবে হয়ত।

লাঙল না টানুক, কিন্তু দুধ দেয়। কয়েকঘর লোকের বলতির পাশে এক কুয়া, তার ধারে এক মত্ত তেঁতুলগাছ। পরে অবশ্য বুঝেছিলাম ওগুলো তেঁতুলগাছ নয়, ঠিক তেঁতুলপাতার মত ছোট ছোট পাতাওয়ালা আর-এক জাতের গাছ। সেই গাছতলার খামা হল চা বানাবার জন্তে আর কলকে সাজাবার জন্তে। এক কলনী দুধ নিয়ে এক খুখুড়ে বুড়ি উপস্থিত। এক কলনী উটের দুধ। দাম একসের আটা। জলের মত পাতলা দুধ। কেনা হয়ে গেল। কিন্তু তারপর? দুধ নেওয়া হবে কিসে? একটা কুঁজো খালি করে দুধ নেওয়া হল। সামনের আন্তানায় পৌঁছে জাল দেওয়া হবে।

এপারের মানুষ কন্টকগৃহে বাস করে না। কন্নাত চালিয়ে কাঠ চিরে তাই দিয়ে ঘর বানিয়েছে। দেওয়াল চাল সব কাঠের তৈরী। কন্টকগৃহ না হোক, আদর্শ জতুগৃহ বললে অম্ভার বলা হবে না।

চাব-আবাদ গৃহকর্ম করতে করতে অনেকেই স্তলমহম্মদের সঙ্গে 'সালাম-

আলেকুম' সারতে লাগল। হেঁকে হেঁকে ওদের মধ্যে আলাপ চলতে লাগল। কি বলছে ওরা? দিলমহম্মদ বুঝিয়ে দিলে যে ওরা প্রত্যেকেই আমাদের সবাইকে আজকের মত এখানেই বিশ্রাম করতে সাদর আহ্বান জানাচ্ছে। তার হেতুটি কি তাও খুলে বললে রূপলাল।

“এত আদর-অভ্যর্থনা কেন জানেন ত—এখানে থেমে যদি আমরা কুটি পাকাই ত ব্যাটারা সকলের কাছ থেকে একখানা করে কুটি আদায় করবে। ব্যাটারা একেবারে ছিনে জেঁক। কুটির জন্তে এমন বামেলা জুড়বে তখন যে প্রাণ নিয়ে পালানো হবে দার।”

হৈ হৈ করতে করতে চলেছে সবাই। রাস্তা নেই কোথাও—কোথাও মাটি, কোথাও বালি, কোথাও কাঁটা, কোথাও কাদা। সব রকমের উচু-নিচু খানাখন্দ সোজা পার হয়ে চলেছে উট। চবা জমি—তাই তাই নই। জমির চার ধারে কাঁটার বেড়া দিয়ে সীমানা নির্দেশ করা হয়েছে—কুছ পরোয়া নেই। সোজা চলল উর্বশীর মা, তার পিছন পিছন উর্বশীও। বেড়া ভেঙে রাস্তা করে চলেছে। তাদের পিছন পিছন আমরাও। কেউ কিছু বলেও না। আহা, কি দেশ! আর, আমাদের ওখানে? চাবের পর আল থেকে ক্ষেতে নামলে কি আর রক্ষে আছে। একেবারে রান-না লড়কি লাঠি সব বেকরবে।

মাহুঘের বসতি চারিদিকে। মাহুঘের চেয়ে ঢের বেশি অবশ্য ছাগলের বসতি। ছাগল সর্বত্র—রাবণ ছাগল। আমাদের দেশে যাদের আমরা রানছাগল বলি তাদের তিনগুণ বড়। স্ততরাং এরা হচ্ছে রাবণ-ছাগল। এর একজোড়ার কাঁধে লাঙল জুড়লে অনায়াসে চাব করা চলে। পালে পালে রাবণছাগলরা ঘুরে ঘুরে কাঁটাগাছের বোপ চিবোচ্ছে।

কুন্তী চিবোচ্ছে কুল—সুখলাল তার সহকারী। যেতে যেতে যে কুলগাছগুলো হাতের কাছে পড়ছে তা থেকে নিজেই ছ-হাতে ছিঁড়ে নিচ্ছে কুন্তী, আর দূরের গাছগুলো থেকে দৌড়ে গিয়ে ছিঁড়ে আনছে সুখলাল।

একলা কুস্তা নয়, আরও অনেকের মুখ নড়ছে। জীবন-ভাঙ্গা মাসে এখানে কুল ফলে। একটার এক কামড় দিয়ে দেখলাম—না টক, না মিষ্টি—তুখু কষাটে। উটের উপর থেকে ভৈরবী ওদের খয়ক দিলেন। অত কাঁচা কুল খেলে পেট কামড়ে মরবে যে। তৎক্ষণাৎ মিলমহম্মদ সে কথার প্রতিবাদ করলে, “না না—বহুত হজমি জিনিস। এ ফল খেলে বোখার পথস্ত ছুটে যায়।” কাজেই কুল চিবোনো চলতেই লাগল।

কিন্তু আরও আগে আরও ভাল ফল পাওয়া গেল। সাদা সাদা ছুটি। দশ-বারোটি কিশোরকিশোরী ছুটতে ছুটতে এসে উপস্থিত। তাদের প্রত্যেকের হাতে দুটি তিনটি করে ঐ ফল। সব কটি কিনতে হবে। প্রায় আধ ক্রোশ দূর থেকে ছুটে আসছে তারা। গুলমহম্মদ দেখিয়ে দিলে ঐ যে ডান ধারে উচু বালির পাহাড়টা দেখা যাচ্ছে ওটার ওপারে নেমে গেলে এদের গ্রাম পাওয়া যাবে। সেখান থেকেই আসছে ওরা ওই ফল নিয়ে। কি করে সংবাদ পৌঁছল ওদের কাছে যে, একদল হিংলাজ-বাদী আসছে? নিশ্চয়ই কেউ ঐ বালির টিলার উপর থেকে আমাদের দেখতে পেয়েছে। আমরা ত আর ওদের গ্রামের পাশ দিয়ে বাব না—কাজেই আধ ক্রোশ ছুটতে ছুটতে এসে ওরা আমাদের পাকড়াও করেছে।

তখন দরদস্তুর করা চলতে লাগল। চলতে চলতেই অবশ্য চলতে লাগল দরদস্তুর করা। আরও মাইল খানেক পথ তারা এল আমাদের সঙ্গে সঙ্গে। মাল গছাতে গেলে আসতেই হবে। কারণ আমরা ত আর ধামব না। তারা যা চায় আমরা তা বুঝতেই পারি না। তাদের হিসেব খুব সোজা—সবাইকে এক আনা করে দাও তাহলেই সকলে মাল দিয়ে ফিরে যাবে। কিন্তু আমরা এত সহজে মাল কিনি না। কুস্তী দর করছে ছোটগুলো এক পয়সা করে বড়গুলো দু পয়সা করে আর তার চেয়ে যে-কটা বড় তার দাম তিন পয়সা। কিন্তু তাতে হচ্ছে মহা গুণগোল, মানে বিক্রেতারা সবাই সমান পাচ্ছে না। দুটি ছোট ফল যে এনেছে সে পাচ্ছে মাত্র দু-পয়সা আর যে

এনেছে দুটো বড় কল সে পাচ্ছে ছ-পরগা। কাজেই ওদের মুখ আরও লাল হয়ে উঠছে। আরও বেশি করে মাথার সোনালী চুল ছ'হাতে চুলকোতে লাগল ওরা। শেষ পর্যন্ত ওদের মধ্যে চার-পাঁচটি মেয়ে কুস্তীর কাপড় টেনে ধরল। একটা নিষ্পত্তি না হলে আর পা বাড়াতে দেবে না।

তখন পোপটভাই এগিয়ে গিয়ে মধ্যস্থতা করে দিলেন। ওদের প্রত্যেককে এক আনা করে দিয়ে কিছুতেই আমরা কিনব না তাদের মাল। আমাদের হিসেব আরও সোজা। আমরা সবাই এক আনা করে দেব। ইচ্ছে হয় ওদের মাল দিক, না হয় আবার দৌড়োক এই এক ক্রোশ পথ ওদের মাল নিয়ে।

কিন্তু তাতে বাধল আরও ক্যাসাদ। আমাদের সবাইএর কাছ থেকে এক আনা করে নিয়ে হল মোট চৌত্রিশ আনা। কিন্তু ওরা হচ্ছে তের জন। পোপটভাই চৌত্রিশ আনা ওদের একজনের হাতে দিতে গেলেন। তা সে কিছুতেই নেবে না। সবাইএর হাতে সমান করে ভাগ করে দাও। সহজে কিছুতেই কোনও মীমাংসা হয় না। ওরা কুস্তীকে প্রাণপণে বোঝাবার চেষ্টা করছে এর চেয়ে ঢের সোজা ওদের সবাইএর হাতে এক আনা করে দেওয়া। কুস্তীর কাপড় ধরে টানাটানি করছে। শেষে সুন্দরলাল আরও পাঁচ আনা দিয়ে দিলেন। তখন কুস্তী তিন আনা করে ভাগ করে দিয়ে তবে ছাড়া পেল। হাতের কলগুলো কুস্তীর সামনে ফেলে চক্কর নিয়েবে তারা অদৃষ্ট হয়ে গেল। ওদের বোকামি দেখে ত সুন্দরলাল হেসে লুটোপুটি।

দিলমহম্মদ বললে, ফেরবার সময় আমরা ওদের গ্রামের ওপাশ দিয়ে কিনব। তখন আবার ওরা এসে পাকড়াও করবে।

সুন্দরলাল বললেন—“সে সময় আমরা এক রাত ওদের সঙ্গে থাকব।”

ভৈরবী আর পোপটভাই একবাক্যে সুন্দরলালকে সমর্থন করলেন। ছেলে-মেয়েগুলিকে দেখে ওদের নেশা চড়ে গেছে। অমন রূপ অমন স্বাস্থ্য, সোনালী চুল, টকটকে মুখ আর কটা-কটা চোখ, আর সেই চোখের দৃষ্টিতে মক্কাভীর্থের মরলতা—সবকিছু একসঙ্গে করলে যা হয় তা আমরা আমাদের

সভ্যজগতের শহরে ছেলেমেয়েদের কাছে পাই না। তেবো আনার চেয়ে চৌত্রিশ আনা চেয়ে বেশি এ তারা হামাগুড়ি দিতে দিতেই শেখে। শিখে যখন পায় হেঁটে চলতে আরম্ভ করে তখন তেবো আনার চেয়ে কম, মাত্র পাঁচ আনা হাতে পেলেই দুপুর বেলা সিনেমার সামনে গিয়ে লাইনে দাঁড়ায়।

এতক্ষণ আমরা গাছপালা বোশজলের ভিতর দিয়ে চলছিলাম। এবার আবার ফাঁকায় বেরিয়ে এলাম, আরম্ভ হল মাঠ। বীরভূমের সব চেয়ে বড় মাঠ বেগুলি, পাঁচকোশ জমি ভাঙলে যে সব মাঠ পার হয়ে ওপারের গ্রামে গিয়ে ওঠা যায়, সেই রকমের সব মাঠ। শুধু বালি আর বালি। মস্ত বড় বড় ঢেউ তুলেছে সেই বালির সমুদ্র। একটা ঢেউয়ের মাথার উঠে গুলমহম্মদ দেখালে—ঐ যে ঐ কালো-মত এতটুকু দেখা যাচ্ছে, ঐ বস্তুতে গিয়ে উঠব আমরা। ওখানে পৌঁছেই আজকের মত চলার বিরতি। তার মানে, এই মাঠখানা ভাঙতে আরও মণ্টা চারেকের খাকা। তা হোক, আজ আর কারও দেহে-মনে বিন্দুমাত্র ক্লান্তি নেই প্রাণ্ডি নেই। সবাইএর মুখ জল জল করছে। সবাইকে মাতিয়ে নিয়ে চলেছে একলা কুস্তী। গোমড়ামুখো গোকুলদাসও মাঝে মাঝে সবাইএর সঙ্গে হাস্ত-পরিহাসে যোগ দিচ্ছে। অস্ত্রদিন কুস্তী ভৈরবীর উর্টের পাশে পাশে হাঁটে। আর ভোর থেকেই সে চলেছে দলের সঙ্গে অনেক আগে হৈ হৈ করতে করতে। তার হাঁটা-চলা কথাবার্তা হাস্ত-পরিহাস সবকিছুই সহজ সরল এবং স্বাভাবিক। অনেক পিছন থেকে দেখে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম।

তবু একবার পিছন ফিরে চেয়ে দেখলাম সেই উঁচু বালির ঢেউটার মাথা থেকে নেমে যাবার আগে। চেয়ে রইলাম সেই দিকে আকাশ যেখানে বালির সঙ্গে মিশেছে সেইখানটার। কিছুই দেখা গেল না। শুধু আকাশ আর বালি, বালি আর আকাশ ভিন্ন কিছুই চোখে পড়ল না। দশ-পনেরো কোশ—হয়ত তারও বেশি—পিছনে ফেলে এসেছি সেই মস্তবড় চেপ্টা-মাথা মাটির নৈবেদ্যটাকে—আর, আর—তার পেটের মধ্যে তাকে, যাকে আরও কোশ

আঠেক পিছনে এক পাহাড়ের মধ্যে দলহুঙ্ আমরা সবাই ঢিল ছুঁড়ে ছুঁড়ে তাড়িয়েছিলাম। পা খেমে গেল, চোখ বুজে গেল, আচম্বিতে চোখের উপর ভেসে উঠল আকাশের দিকে উচু করা হাঁটু পর্যন্ত দুখানা পা। পা দুখানা ধর ধর করে কাঁপছে। কাঁপতে কাঁপতে তলিয়ে গেল কাদার মধ্যে।

দিলমহম্মদ হাত ধরে টান দিলে। চোখ মেলে দেখলাম—উটের উপর থেকে ভৈরবী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন আমার দিকে।

বললাম, “চোখে আবার কি পড়ল।” বলে চোখ রগড়াতে রগড়াতে উৎসীহ পিছু পিছু নেমে গেলাম।

অনেকটা জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে বসা হয়েছে। বেশ একটা বড় ভোবার চারপাশে পাছের ছাওয়া। ভাগে ভাগে গাছগুলোর তলায় রান্না চাপানো হল। ভোবাটায় জল নেই, আছে শুধু বালি। জল আনা হল, খানিকটা দূরের এক কুয়ো থেকে। কুয়োওয়ালা এসে লোক গুনে গেল। বতগুলো লোক ততখানা রুটি। আধ পোয়া ওজনের ভাল করে সৈঁকা রুটি চাই। উটওয়ালারা ছুঁজন আর পাণ্ডা ছুঁজন এই চারজনের বাদ দিলে মোটমোট দাঁড়ায় ত্রিশখানা। একবার দুবার তিনবার গুনলে সে আমাদের। তিনবার তিন রকম ফল বেরুল—আটাশ, ত্রিশ, তেত্রিশ। শেষে হাল ছেড়ে দিয়ে গুলমহম্মদের শরণাপন্ন হল। গুলমহম্মদ তখন খাঁটি কথা বললে। দলের ছুঁজন মরে কয়েছে, স্তূতরাং এখন রুটি পাবে সে মাত্র আটাশখানি। রুটি আদায়ের ভার গুলমহম্মদের উপর দিয়ে সে চলে গেল।

এল তার গিন্নী মূরগীর আঙা বেচতে। দিলমহম্মদ দশটা নিলে, নিয়ে বাপ-বেটা ছুঁজনে কাঁচা সেগুলোকে খেয়ে ফেললে। দশটা মূরগীর ভিমের মূল্য—আরও চারখানা রুটি অথবা আধদের আটা। রুটি বানানো হলে চারখানা রুটিই দেবে এই বলে দিলমহম্মদ তাকে বিদেয় করলে।

কিন্তু রুটি সেদিন তাদের ভাগ্যে জুটল না। জুটল কয়েকমুঠো ভাত।

অন্তদিন রুটি বানিয়ে দেয় কুস্তী। সে বেকে বসল। আর সে আমাদের সঙ্গে থাকে না, আমাদের জিনিসপত্র হোঁবে না, সে ভিক্ষা করবে সকলের কাছে এক টুকরো রুটি। কতটুকুই বা তার প্রয়োজন। জনকতক তাদের রুটি থেকে এক টুকরো করে ছিঁড়ে দিলেই তার দিন চলে যাবে।

অন্তদিনের মত ভৈরবী নিশ্চিন্তে শ্রান করে এসে চাদর মুড়ি দিয়ে জপে বসলেন। তিনি জানেন—কুস্তীই রাগাবার। করবে, সুখলাল করবে তাকে সাহায্য। উটওয়ালারা দু'জন আর আমরা চারজন একসঙ্গে থাক। জপ থেকে উঠে তিনি দেখলেন—উত্থন জলেনি, রাগা চড়েনি। ওই ওখারের এক গাছতলায় কুস্তী শুয়ে আছে একলা—আর সুখলাল তার দাদার সঙ্গে কাছের বস্তিতে গেছে বেড়াতে।

তাড়াতাড়ি তিনি গেলেন কুস্তীকে দেখতে। আবার অস্থখ-বিস্থখ হল না ত! কুস্তীর কাছে গিয়ে তার গায়ে-মাথায় হাত দিলেন, কই! কিছুই হয়নি ত। ডাকাডাকিতে কুস্তী চোপ মেলে উঠে বসল আর জানাল যে সে আর আমাদের সঙ্গে থাকে না, আমাদের জিনিসপত্র হোঁবে না, সকলের কাছ থেকে ভিক্ষা করে নেবে তার রুটি। সকলের উচ্ছিষ্ট খেয়েই তার দিন চলে যাবে।

রাগে অভিযানে কোণে ভৈরবীর বাক্যরোধ হয়ে গেল। তিনি খানিকক্ষণ ওর হাত ধরে ওর মুখের দিকে চেয়ে চূপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন—তারপর ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন। তবু কুস্তীর মন গলল না। সে কিছুতেই উঠে এল না, তখন চোখ মুছতে মুছতে ফিরে এসে ভৈরবী আমাকে জানানেন ব্যাপারটা। বললেন—

“এইজন্তে আজ দশ-দশটা দিন আর রাত ওকে বুক দিয়ে আগলাচ্ছি, এই জন্তে দু'হাতে ওর গা থেকে রক্ত বুরে দিয়েছি, এইজন্তে নিজের মুখের গ্রাস ওকে খাওয়াচ্ছি। এতবড় বেইমান যে, সব ভুলে গেল!”

কি বলব? আর বলবারই বা আছে কি। কুস্তীর উপর জোর খাটাবার

কোন অধিকার আছে আমাদের ? জোর করতে গেলে উণ্টো উৎপত্তি হবে, একবার তা হয়েওছিল। শেরদিলের আড্ডায় কুস্তীকে থিকমলের জন্তে রেখে আসতে চেয়েছিলাম বলে এতগুলি হিন্দুসন্তানের মুখপাত্র হয়ে রূপলাল চোখ বাড়িয়ে দাঁড়িয়েছিল। কুস্তী ত শুধু আমার উপর নির্ভর করে যাচ্ছে না। সবকটি হিন্দুসন্তানের উপর নির্ভর করে সে যাচ্ছে। দলস্থল সবকটি হিন্দু সন্তানই তার অভিভাবক। সুতরাং চুপ করে রইলাম।

ভৈরবী কান্ডতে কান্ডতে ভাত চড়াতে গেলেন। গুলমহম্মদ দিলমহম্মদ সুখলাল সবাই ভাতই খেল। ভৈরবীও খেতে বসলেন। কিন্তু চোখের জলে ভাতে মিশে এমন একাকার হয়ে গেল যে, সে ভাত আর তাঁর গলা দিয়ে নামল না। দূর থেকে লক্ষ্য করলাম কুস্তী ছ'তিনজনের কাছ থেকে ছ'তিনখানা রুটি ত্রিকে করে নিলে, কিন্তু কখন খেলে তা আর দেখতে পেলাম না।

রাতের আধার আগেই ঢুকে পড়ল গাছতলার। বহুদিন পরে কুকুরের ঘেউ ঘেউ কানে এল। কাছাকাছি মাহুকের বাস আছে। এখান থেকেই খুব কাছে গুলমহম্মদের বাড়ি, এক রাতের ভিতর যাওয়া-আসা যায়। কিন্তু ওরা আর সে কথা তুলতে সাহস পেলেন না। আমিই বুড়োকে ডেকে কাছে বসিয়ে বললাম, ফেরবার পথে আমাদের সবাইকে তার বাড়ি নিয়ে যেতে হবে। বুড়া বারকতক 'আলবত' আর 'জরুর' বলে মাথা নাড়লে।

শুয়ে পড়লাম সবাই। কুস্তী তার শাড়ির আঁচল পেতে শুয়ে রইল ওই ওখায়ের গাছতলার। বুড়া গুলমহম্মদ গিয়ে তাকে বোঝাবার চেষ্টা করলে যে, একলা ওভাবে শোওয়া উচিত নয়, উঠে গিয়ে মাইজীর কাছে শুয়ে ঘুমাও। কুস্তী উত্তরও দিলে না। চোখ বুজে পড়ে রইল।

চাদর মুড়ি দিয়ে আমিও পড়ে রইলাম। মাথার কাছে ভৈরবী শুলেন সুখলালকে নিয়ে। অনেককণ ফোঁস ফোঁস শব্দ শুনতে পেলাম তাঁর চাদরের ভিতর থেকে, তারপর আঙুলে আঙুলে তাঁর নাক-ডাকা আরম্ভ হল। ছ'দিন ছ'রাত পরে তিনি ঘুমালেন।

ভয়ানক হাসি পেতে লাগল। অনর্থক ভৈরবী কুংখ ভোগ করছেন। যেচে মান আর কেঁদে সোহাগ আদার করা যায় না, উন্টে গাল বাড়িয়ে চড় খেতে হয়। ভালবাসার মর্যাদিক বিরোগান্ত একটা দিক আছে। তা হচ্ছে—বাকে নিজের গরজে ভালবাসলাম তার কাছ থেকেও ভালবাসার আশা করা। সে আমার মনের মত হয়ে চলুক, একমাত্র আমার উপরেই নির্ভর করুক, আমাকে ছাড়া সে যেন অন্য কিছু না জানে, এই স্বপ্নের সব দুঃখ মনে মনে পোষণ করলে তার অনিবার্য কল হাতে হাতে পেতেই হবে। তখন চোখের জলে নাকের জলে ভাসতে ভাসতে মাথা-খোঁড়া আর চুল-ছেঁড়া ভিন্ন গত্যন্তর নেই।

ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঘুম ভাঙল কিল-চড়-ঘুঘো এই সমস্তর শব্দে। তার সঙ্গে চাপা গলার শাসন—“খবরদার—টু” শব্দটি করেছিল কি একেবারে মেরে ফেলব!” ভোবাটার ওপারে ষটছে ব্যাপারটা। দিল-মহম্মদের গলার আওয়াজ পেলাম। সবাই চুপি চুপি কাজ সারছে। আর একজনের গলাও কানে এল, “যদি এতটুকু জানতে পারেন আমীজি মহারাজ, তাহলে তোকে এখানে পুঁতে ফেলব বালির মধ্যে।” আবার গোটা কতক কিল চড় ঘুঘোর শব্দ কানে এল।—কি ব্যাপার?

চামরটা মুখের উপর থেকে সামান্য সরিয়ে নজর করে দেখবার চেষ্টা করলাম। একটা গাছের আড়াল পড়ায় কিছুই দেখা গেল না। কিন্তু আবার কানে এল দিলমহম্মদের চাপা গলার আওয়াজ। সে হুকুম করলে, “যাও—এখনি গিয়ে শুয়ে পড় মাইজীর কাছে।” আবার গোটাকতক চড় খাল্লড়ের শব্দ কানে এল। এবার শুনেতে পেলাম পোপটলালের গলা—“বা ব্যাটা, মুখ বুজে শুয়ে থাকগে বা। খুব সাবধান, সাধু মহারাজের এখন মাথার ঠিক নেই, এ সময় যদি তিনি এ সব কথা শুনেতে পান তবে আবার অসুস্থ হয়ে পড়বেন।”

অন্ধকারের মধ্যে চেয়ে দেখলাম ভোবার ওখার দিগে ঘুরে কে আসছে

এদিকে । বে এল সে ভৈরবীর ওপাশে হাঁটুতে মুখ ঝুঁজে বসে রইল । ওখারের কথাবার্তা চড়-চাপড়ের আওয়াজ ধেমের গেল । কান খাড়া করে শুয়ে রইলাম, শেষে শোনা গেল শেঁ। শেঁ। শব্দ । বড় কলকের টান দেওয়া হচ্ছে ।

টান টান হয়ে মড়ার মত পড়ে রইলাম । কি দরকার আমার জানবার কি ঘটে গেল ওখানে । বে ব্যাপার এত বড় করে আমার কাছ থেকে লুকোবার চেষ্টা করা হচ্ছে তা না-জানাই না হয় রইল আমার । আমার সহবাত্রীরাও মাহুষ, পাছে আমার মনের শাস্তি নষ্ট হয় এই জন্তে ওরা এত সচেষ্ট । ওদের বুদ্ধিবিবচনা আর আমার উপর ভক্তিশ্রদ্ধার পূর্ণ মর্যাদা দিতে গেলে আমি কিছুই জানতে পারিনি এইটুকুই দেখানো উচিত । বড় বে, সে চিরকালই বড় থাকতে পারে যদি-না সব ব্যাপারে নাক গলাবার চেষ্টা করে । অনেক সময় দেখেও না দেখা, জেনেও না জানা, এই দুটি মিথ্যা ভান সংসারে বহু অশান্তির হাত থেকে রেহাই দেয় ।

পরদিন বেশ বেলায় ঘুম ভাঙল কুস্তীর ডাকাডাকিতে । চোখ চেয়ে দেখলাম এক গেলাস চা হাতে নিয়ে সে দাঁড়িয়ে আছে । এত সকালেই সে জ্ঞান করে কৈলেছে । ভিজ়ে চুলে আর ভিজ়ে চোখে তার মুখ বর্ষপমুখর বলে মনে হচ্ছে । একবার মাত্র তার মুখের দিকে চেয়ে চায়ের গেলাসটা হাতে নিলাম । একটিও কথা বললাম না তাকে, পাছে তার জোর করে আটকে রাখা চোখের জল বীথ ভেঙে ছোটে ।

চায়ের গেলাসটা হাতে করে উঠে গেলাম ভোবার ওখারে । সবাই উঠে পড়েছে । বড়-কলকের আগুন চড়েছে । সকলকেই দেখতে পেলাম, শুধু একজন তখনও চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে । কে ও ? এখনও শুয়ে কেন ?

রূপলাল একান্ত তাজ্জিল্যের সঙ্গে জবাব দিলে—“ও হচ্ছে লম্বু গোকুল-দাস । কাল রাতে অন্ধকারে গাছের ডালের সঙ্গে ওর মুখের খাকি লীগে ।

উঁচু ত কম নয়। মাথা হেঁট না করে অঙ্ককারে চলাফেরা করবার ফল। মুখ একেবারে ধোঁতলে গেছে ব্যাটার। তাই চাদর মুড়ি দিয়ে পড়ে আছে।

আর সকলের মুখের দিকে চেয়ে দেখলাম। কেউই আমার দিকে চোখ তুলে চায় না। পোপটলাল আকাশের দিকে চেয়ে আধখানা বিড়িতে কষে টান দিচ্ছেন। গুলমহম্মদ যথারীতি পাগড়ির মধ্যে আঙুল চালিয়ে উকুন খুঁজছে। দিলমহম্মদ একটা গাছের ডাল নিয়ে তার উপর টাঙি দিয়ে সূক্ষ্ম কারুকার্য করতে ব্যস্ত।

আর দাঁড়ালাম না। রূপলালকে বললাম—“খাও ওখানে গুলমহম্মদকে নিয়ে, চা খেয়ে এস তোমরা।” বলে চলে গেলাম কুয়োর ধারে।

কথা ছিল আজ ভোরবেলা যাত্রা আরম্ভ হবে, কিন্তু তা হল না। সেখান থেকে আমরা উঠলাম দিনের অর্ধেকটা পার করে। খাওয়া-দাওয়ায় দেরি হয়ে গেল। কুস্তী আমাদের সঙ্গেই খেলে, কাজকর্মও সব করলে। ভৈরবীর মনে আর কোনও ছঃখ নেই। কারও মনেই কিছু নেই। আগের মতই সব ঠিক চলছে। তবে গোকুলদাস অত্যধিক লম্বা মাছুষ বলে গাছের ডালের সঙ্গে অঙ্ককারে ঠোঁকর খেয়ে মুখ ঢেকে বেড়াচ্ছে। লোকে পায়ে ঠোঁকর খায়, গোকুলদাস খেয়েছে মুখে। ও একই কথা। কিন্তু অতগুলো গাছের ডাল কি পর-পর ঝুলে আছে কোথাও? গোকুলদাসের মুখের দিকে চেয়ে মনে হল, অন্তত পনেরো-বিশ বার ঠোঁকর না খেলে তার সারা মুখখানা অমন ভাবে ফুলে কালশিটে পড়ে যেত না। কিন্তু গোকুলদাসকে ত কিছু জিজ্ঞাসা করা যায় না। সে সবাইকে এড়িয়ে ঘোমটা টেনে চলেছে একা একা নিজের কুঁজো নিজে বয়ে নিয়ে। কি জানি কেন তার একান্ত অসুগত চিরঞ্জীও আজ তাকে এড়িয়ে চলছে।

সেই কথাই হচ্ছিল পোপটলালের সঙ্গে। বললাম, “পোপটলাই, আমি থাকলে অতগুলো ঠোঁকর কিছুতেই খেতে দিতাম না গোকুলদাসকে। ওর উঁচু মাথা নিচু করিয়ে মুখখানাকে বাঁচিয়ে দিতাম। মাছুষেই ভুল করে, অঙ্কার

করে, পাপ করে, আবার মাহুযেই এই দুনিয়ার কত ভাল ভাল কাজ করছে। কিন্তু তুল অস্তায় বা পাপ করলেই যদি সেই মাহুযটাকে খতম করে দেওয়া হয় তবে দুনিয়ার ভাল ভাল কাজগুলো করবার জন্তে শেষে যে আর একজনকেও খুঁজে পাওয়া যাবে না।”

মিনিটখানেক পোপটলাল আমার মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইলেন। তারপর একটা ঢোক গিলে বললেন—“ও ব্যাটার কথা ছেড়ে দিন। ও একটা আস্ত জানোয়ার। নিজের কর্মকল হাতে হাতে পেয়েছে, বেশ হয়েছে।”

বললাম, “তাদের ভাগ্য ভাল যারা হাতে হাতে কর্মকল পায় না। তা যদি সবাই পেত তবে গোকুলদাসের মত জানোয়ারকে কর্মকল দেবার জন্তে একখানা হাতও খুঁজে পাওয়া যেত না।”

পোপটলাল কিছুক্ষণ নির্নিমেব নেড়ে চেয়ে রইলেন আমার মুখের দিকে। তারপর ভেবেচিন্তে জবাব দিলেন, “কিন্তু হাতে হাতে কল পেলে একটা কাজ হয়, যখন তখন যেখানে-সেখানে ছাংলায়ো করবার দুঃসাহস থাকে না।”

হেসে ফেললাম। তারপর একটি বিড়ি দিলাম পোপটলালকে। ছুজনের বিড়ি ধরানো হলে ধোঁয়া ছেড়ে বললাম, “ঠিক বলেছেন—যখন-তখন যেখানে-সেখানে দুঃসাহস যদি কেটে না দেখায় তাহলেই হল। আর একেবারে কবিন্ কালে কোথাও যাদের কোনও কিছু করবার সাহস নেই তাদের ত আমরা মাথায় তুলে নাচি। লোকলজ্জা সমাজ পুলিশ আইনকাছন পাপপুণ্যের জ্ঞান—আর সবচেয়ে মারাত্মক যেটি, ঐ ঠোঁটের খেয়ে হাড় ভাঙে হবার ভয়—এই এতগুলো শক্ত লাগায় কবে টেনে ধরে যে-ভাগ্যবান তার ছ-বোড়ার বখখানাকে ওপারে নিয়ে পৌঁছতে পারল, তাকেই আমরা বাহবা দিই। তখন তার একটা সাদা পাখরের মূর্তি গড়িয়ে চৌরাস্তার মোড়ে বসিয়ে সেই পাখরের মাহুযের গলায় ফুলের মালা ঝোলাই। কিন্তু যতকাল সে ছিল রক্তমাংসের গড়া মাহুয ততক্ষণ বিন্দুমাত্র সহায়ত্ব তাতে দেখাই না। ‘আহা—বেচারি! এতগুলো

লাগাম টানতে টানতে আজীবন দাঁড়ে ম'ল, এ কথা একবারও আমাদের মুখ দিয়ে বেরোয় না। বরং একটি বারের ভয়েও যদি তার হাতের মুঠি শিথিল হয় তাহলে আর দাঁড়ে নেই। চৌকর মারতে মারতে তার অবস্থা এমন করে ছাড়ি যে তখন বেচারার নিজের পায়ে খাড়া হবারই আর সামর্থ্য থাকে না ত সে বাগিয়ে লাগাম টানবে কি করে।”

পোপটভাই মাথা নিচু করে হাঁটতে লাগলেন। অনেকক্ষণ পরে তিনি বললেন, “ঠিক তাই, সাহস হুঁসাহস এর একটাও যে সারাজীবনে দেখালে না সেই হয়ত সবচেয়ে সাংঘাতিক পাপী। শুধু বৃত্ত্য পর্যন্ত ভিতরে ভিতরে জলে পুড়ে ম'ল।”

বললাম, “আবার এমন অনেকেও রয়েছেন যে সারাজীবন হেসে-খেলে কাটিয়ে গেলেন। তাঁদের কিছুতেই লকলকে জিব দিয়ে লাল গড়াল না। সাহস হুঁসাহস এসব কোনও কিছুই দেখাবার তাঁদের দরকারই হল না।”

পোপটভাইয়ের কপালের পাঁচ-পাঁচটা রেখা পরস্পর জড়িয়ে গেল। তাঁর ডাগর চোখ দুটো কঁচকে এতটুকু হয়ে গেল। তিনি হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে আমাকে সিজ্ঞাসা করলেন—“কিন্তু তাঁদের চেনা যায় কি করে? দেখেছেন তেমন একজনকে যার ঐ বিবের জালা নেই?”

বিড়িতে শেষ টানটা দিয়ে বললাম, “দেখেছি প্যাটেল, তেমন লোক অনেক আমার চোখে পড়েছে। শুধু ঐ ছাংলানো ব্যাঘিটাই যে তাঁদের নেই তা নয়। তাঁদের রাগঘেঁষও নেই। নিজে যা করতে পারছি না অপরে তা করে কেললে তাঁরা হিংসের কপে ওঠেন না। উন্টে দুখে তাঁদের চোখ দিয়ে জল গড়ার। “আহা রে, ও বেচারী নিজেকে সামলাতে পারলে না,” এই ভেবে তাঁরা তখন তাকে সাহস দিয়ে অভয় দিয়ে বলেন—“তাই, খাবড়ে বাগ নে, চেষ্টা কর, আরও চেষ্টা কর—একদিন তুই ওই ছাংলাপনা ব্যাঘিটা থেকে মুক্তি নিশ্চয়ই পাবি।” তখন সেই হতভাগাকে সুখিয়ে কিলিয়ে খেঁতো না করে তার হাত

থরে তাকে পাকের ভিতর থেকে টেনে তোলেন তাঁরা। নিজেরা ব্যাধিমুক্ত, তাই তাঁরা অপরকেও ব্যাধিমুক্ত করতে পারেন।”

গোপটলাল আবার ঘাড় হেঁট করে কি ভাবতে লাগলেন। উর্টের উপর থেকে ভৈরবী টেঁচিয়ে বললেন—“আবার পাহাড় দেখা যাচ্ছে।”

আবার পাহাড়! শুনেই মনটা কেমন হয়ে গেল। চারিদিকে নজর করে দেখলাম কুন্ডী কোথায়। ওই যে চলেছে স্খলালের সঙ্গে। আঁচল জড়িয়ে নিয়েছে কোমরে। মাথায় ঘোমটা নেই। পিঠের উপর পড়ে আছে লম্বা বেলী। রঙচঙে জামাটা গায়ে দিয়েছে, পরেছে ওর ছাপানো শাড়িখানা। পিছন থেকে ওদের দুজনকে দেখে মনে হল দুটি তাই-বোন—নিম্পাপ, নিষ্কলঙ্ক—দুটি ফুলের ছেলেমেয়ে আপন মনে গল্প করতে করতে আর কি চিবোতে চিবোতে চলেছে।

ভৈরবী উপর থেকেই টেঁচিয়ে টেঁচিয়ে ধমকাচ্ছেন ওদের—“আর খাস নে ওগুলো—হজম হবে না। যেমন হয়েছে ছেলেটা তেমনি মেয়েটা—একটাও যদি কথা শোনে।”

তাঁর গলার আওরাজ শুনে মনে হল ওরা যে তাঁর বারণ শুনছে না এতেই তিনি খুশি। ওরা কিরেও চাইলে না। স্খলালের পকেটে হাত ঢুকিয়ে কুন্ডী আবার কি বার করে নিলে।

রূপলাল আরও সামনে থেকে টেঁচিয়ে বললে—“আমাদের বোন নেই, সেজন্তে আমাদের মা-বাপের দুঃখের অন্ত নেই। ভেবেছিলাম ফিরে গিয়ে মার কাছে বলব ‘এই দেখ মা, একটা বোন নিয়ে এসেছি এবার হিংলাজ থেকে,’ কিন্তু দেখছি তা আর হবে না। কাঁচা কুল খাইয়ে খাইয়ে স্খলাল বোনটাকে মেরে ফেলবে।”

স্খলাল তৎক্ষণাৎ তীব্র প্রতিবাদ করলে, “কুল নয়, আখরোট।” মণিরাম, হুম্মরলাল, আরও পাঁচ-সাত জন একসঙ্গে গোলমাল করে উঠল—“কুন্ডী বহিন—তুমি একলা তোমার ছোট তাইটিকে নিয়ে আখরোট

খাচ্ছ আর আমরা কি তোমার ভাই নই? আমাদের কথা ভুলে গেলে কি করে?”

শোপটভাই বললেন—“যে বহিন ভাইদের না দিলে খার তাকে কি বলে?” সবাই হৈ হৈ করে একসঙ্গে কি বললে বোঝা গেল না।

কুন্তী দৌড়ে ফিরে এল ভৈরবীর উটের পাশে। বললে, “দাও ত যা ঝোলাটা নামিয়ে। ভাইদের না দিলে ওরা আমাকেই চিবিয়ে খেয়ে কেলবে যে।”

ভৈরবী ঝোলাটা নামিয়ে দিলেন। দিলমহম্মদ সেটা ধরে নিয়ে কুন্তীর হাতে দিয়েই নিজে হাত পেতে দাঁড়াল। তার হাতে একমুঠো দিয়ে কুন্তী ছুটল সামনে, তার সব ভাইকটিকে ভাগ করে দিতে।

বেশ খানিকটা সামনে দৌড়ে গিয়ে তবে কুন্তী তার ভাইদের পাকড়াও করলে। তারপর ওরা কাড়াকাড়ি করে কুন্তীর কাছ থেকে আথরোট বাগান নিয়ে খেতে খেতে চলল। পিছন থেকে দেখলাম অতগুলো ভাইএর একটি-মাত্র বোন হওয়া সহজ কথা নয়—অতগুলো ভাইএর আকার-অত্যাচার হাসি-মুখে সহ্য করতে হয়। তা কুন্তী সে কাজটি হৃৎকালে করছে। কাউকে ধমকে, কাউকে চোখ রাঙিয়ে, কারও হাতের উপর চড় মেরে সবাইকে শাস্ত করছে। দেখতে দেখতে কেন জানি না আমার হুচোখ জলে ভরে উঠল। ওদের হাসি ওদের ঝগড়া পিছনে ভেসে এসে কানে ঢুকছে। আর ভাবছি—অনেকগুলো বছর পিছনে ফেলে আসা দিনগুলির কথা। নাঃ, আর-একবার এ জীবনে কারও ভাই হবার যোগ্যতা একেবারে হারিয়েছি। বাবা, খামীজি মহারাজ—এই পদবীগুলি পাবার লোভে সে যোগ্যতা অনেকদিন আগে বলিদান দিয়ে এসেছি। এখন লোকে ভয় করে, ভক্তি করে, হরত সন্মানও করে, কিন্তু ভাই বলে কেউ আর ভালবাসতে সাহস করে না।

ভৈরবী বললেন—“এইভাবে হেসে-খেলে ঘেরেটা করাটা পর্বত গিরে পৌছন্ন ত বাঁচি।”

বললাম—“কেন? আমরা কাকেও সন্দেহ করে আনি নি, কারও দার-

দায়িত্ব নেই আমাদের কাছে। করাচী আমরা হুজনেই ফিরে যাব। বা হয় হোক ওর—”

ভৈরবী মুখকামটা দিয়ে উঠলেন, “বামুন ত। অমন অলক্ষণে কথা মুখে আনবেন না।”

হুতরাং মুখ বন্ধ করে একটি বিড়ি ধরালাম।

শূৰ্ভদেব অস্তাচলে বিজ্ঞান নিতে গেলেন। পাঁচদিন আগে যে শূৰ্ভদেব আসতেন-বেতেন, এ তিনি মন। আজ আর কাল যে শূৰ্ভদেবের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হল ইনি যেমন ভদ্র তেমনি নিরীহ। একে “আবার কাল এস” বলতে সাহস হয়। ইনি হলেন সেই বাবু-শ্ৰেণীর শূৰ্ভিঠাকুর যিনি হুগলী চব্বিশ-পরগনা নদীয়া জেলাগুলির উপর ঘোরাফেরা করেন।

আরও ঘণ্টাখানেক পরে অনেকগুলো কুকুর ঘেউ ঘেউ করে তেড়ে এল। আবার ঘেউ ঘেউ করতে করতে কিরেও চলল আমাদের সঙ্গে। তারপর ‘সালার আলেকুম’ আর ‘আলেকুম সালার’ কানে এল। মানে, গুলমহম্মদ উর্বশীর হাবের নাকের দড়ি ধরে ঠিক জায়গার পৌছে গেছে। অন্ধকারের ভিতর চলতে চলতে আমরাও এসে দাঁড়িলাম এক গৃহস্থের উঠানে। গৃহকর্তা অন্ধকারের মধ্যেই সকলকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন, অনেকের সঙ্গে হাতে হাত মেলালেন। সেই উঠানেই আমরা কবল পাতলাম।

কাল সকালে আমরা চলে যাব অঘোর নদীর পারে। এখান থেকে ঘণ্টা তিনেকের পথ। কিন্তু উট আর বাবে না। উট এখানেই থাকবে হালপত্র সমেত। এর আগে উট নিরে বাবার হুকুম নেই সরকারের। হিংলাজ দর্শন করে এখানে ফিরে এসে তবে আবার হালপত্র উট কুঁজো সব পাওয়া যাবে। যা হিংলাজের পূজার উপচার আর সেখানে নিজেদের পয়বার জন্তে একখানা করে নতুন কাপড় সঙ্গে যাবে। তবে ইচ্ছা করলে একদিনের খাওয়ার মত আটাও নেওয়া যায় সঙ্গে। কে নেবে? কেউ নিলে না কিছু। সারা

দিনরাত নিরন্তর উপোস করে ভোর রাতে ব্রাহ্মসমূহেরে যাতৃদর্শন। তারপর
মাগের প্রসাদ মুখে দিয়ে এখানে ফিরে আসতে বেলা এগারোটাও বাজবে না।
হুতরাং কে আবার আটা করে নিয়ে যাবে মাগের স্থানে।

সে রাতেও আমাদের আর রান্না করতে হল না। শেঠ স্বকৃতীর্থ নিষেধ
করলেন আমাদের ছ'জনকে।

মাগের স্থানে নিয়ে যাবার পূজা-উপচার শুধিয়ে রেখে স্বকৃতীর্থের ভাল-
কটি আর চাটনি খেয়ে বখন শুনার তখন মাথার মধ্যে গুন গুন করে যে গানের
স্মৃতি বাজতে লাগল তা হচ্ছে এই—

“দুঃখপন কোথা হতে এসে

জীবনে বাধায় গড়গোল,

কৈদে উঠে ভেগে দেখি শেষে—

কিছু নাই, আছে মার কোল।

ভেবেছিলাম আর-কেহ বুঝি,

ভয়ে তাই প্রাণপণে বুঝি,

তব হাসি দেখে আজ বুঝি

তুমিই দিয়েছ মোরে কোল।

এ জীবন গঙ্গা দেয় নাড়া—

লয়ে তার স্বপ্ন ছপ ছপ ভয়;

কিছু যেন নাই গো সে ছাড়া,—

সেই যেন মোর সমুদ্র।

এ মোর কাটিয়া যাবে চোখে

নিষেবেই প্রভাত-আলোকে,

পরিপূর্ণ তোমার সমুদ্রে

খেমে যাবে সকল কদোল।”

—স্বকৃতীর্থ

তখনও প্রভাত হতে অনেক দেরি।

আমাদের সব শেষের পথটুকু শেষ করবার জন্যে আমরা তৈরী হলাম। এইবার আমাদের পথ দেখাবে আমাদের ছড়িওয়ালা। তার কাঁধের ছড়ির উপর লক্ষ্য রেখে আমরা চলব তার পিছু পিছু। আত পবিত্র হিংলাজের ছড়ি, নানা রঙের কাপড়ের ফালি ঝুলছে সেই ছড়িতে। ছড়ির মাথাটা জিশুলের মত আর উগড়গে করে সিন্দুর মাখানো তাতে।

কারও কাঁধে কুঁজো নেই। তার বদলে ঝুলেছে ঝুলি প্রত্যেকের কাঁধে। মায় আমাদের সুখলালের কাঁধে পর্যন্ত। তাকে সাজিয়ে দিলে তার দাদা। আরও কয়েকটা বছর পরে এই ছোট্ট সুখলাল বড় হয়ে কত বাজীকে এখানে নিয়ে আসবে। এখান থেকে তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে হিংলাজের গুহার, ময় পড়বে, পিঠ চাপড়ে সুফল দান করবে, আশীর্বাদ করবে। আজ হচ্ছে তার প্রথম হাতেখড়ি। বড়তাই ছোটতাইএর ঝুলিতে গুছিয়ে দিলে ওদের নিজেদের সব পূজার সামগ্রী। লাল সালু, সিন্দুর, মাটির প্রদীপ, তেল-সলতে ধূপ-ধূনা, ঝি, নারকেল, শুকনো মেওয়া, মিছরি আর দুছড়া পাথরের মালা। এই পাথরের মালা দু'ছড়া করে কিনে আনতে হয়েছে প্রত্যেক বাজীকে করাচী থেকে। এই জিনিগটিই হচ্ছে বিখ্যাত হিংলাজের চোংরা। ছোট ছোট লালচে পাথর। এক জাতের বেঁটে লালচে চাল হয় বীরকুম বর্ধমানে, পাথরগুলো অনেকটা সেই-রকম দেখতে। একগাছি সরু সুতো বেতে পারে এই রকম ছোঁকা করে সেই মালা গাঁথা হয়। অতটুকু পাথরে কি বস্ত্র দিয়ে এই রকম সরু ছোঁকা করে তা ভেবে আশ্চর্য হতে হয়। মা হিংলাজের গুহা থেকে বেরিয়ে এসে তবে ঐ মালা গলার ধারণ করতে হবে। তার আগে গলার দিলে নাকি মুখ দিয়ে রক্ত ওঠে। আরও বহু রকমের বিধিনিষেধ আছে, অনেক ব্যাপার করতে হয় এই মালা ধারণ করবার আগে। কিন্তু সে সব করা হবে কাল, ব্রাহ্মমূর্ত্তে ব্রহ্মময়ীর ব্রহ্মরত্ন-মহাপীঠে জ্যোতি দর্শন করে বেরিয়ে আসা বখন, তখন। এখন খুব সাবধান, আরও একবার না হয় ভাল করে দেখে শুনে নাও—কারও কিছু সন্দেহ

নিতে তুল হল কি না। সব নেওয়া হয়েছে ত ? মা হিংলাজের ভোগের জিনিসপত্র, আটা ঘি চিনি কিসমিস পেস্তা বাদ্যার নাবকেল নেওয়া মিছরি। সবই ত আলাদা করে পবিত্রভাবে আনা হয়েছে। ঠোংরার মালা ছগাছা আর নতুন কাপড়খানা। জান করে নতুন কাপড় পরে হিংলাজের গুহার ঢুকতে হবে। কাঁচের বোতল একটা করে সকলেই সঙ্গে এনেছে। ওটাও যেন নিতে তুল না হয়। হিংলাজ দর্শনের পর আকাশগঙ্গার গিরে সেখানকার পবিত্র জল ভরে নিতে হবে ঐ বোতলে।

শুলমহম্মদ আর তার ছেলে বার করে দিলে ওদের নিজের পূজার সামগ্রী।

একখানা লাল সালু, একগোছা মহানুগন্ধি ধূপবাতি আর অনেকগুলো লম্বা মোমবাতি। তার সঙ্গে খাতর, এলাচখানা আর নগদ পাঁচসিকা। নানী-কি হজে চড়াতে হবে। ওরা ত আর বাবে না, ওদের শিষি রূপলালই চড়াবে।

ভৈরবী সাজিয়ে দিলেন কুস্তীকে। একখানা নতুন গামছা দিয়ে ঝুলি বানানো হল কুস্তীর। তার ভিতর কুস্তীর জন্তে সবকিছু আলাদা করে দিয়ে নেওয়া হল, এমন কি ছ'ছড়া মালা পর্যন্ত। কুস্তী আপত্তি করলে, তাকে ছ'ছড়া মালা দিলে আমাদের যে কম পড়বে। বললাম, “আমি সন্ন্যাসী মানুষ—আমাকে ও মালা গলার দিতে নেই।”

“তবে সঙ্গে এনেছেন কেন চার ছড়া মালা ?”

“কি করি বল—যে শেঠজি আমাদের জিনিসপত্র দিয়েছেন তিনি কিছুতেই ছাড়লেন না। কাজেই চারগাছা মালাই সঙ্গে এসেছে।”

দক্ষিণার পাঁচসিকে পরসাত্ত দিতে তুললেন না ভৈরবী কুস্তীর ঝুলিতে। তারপর নিজের ঝুলি নিজের কাঁখে ঝুলিয়ে কুস্তীর হাত ধরে ভৈরবী হয়ে পাড়ালেন।

এমন সময় কুস্তীর মনে পড়ে গেল বোতলের কথা। কই, বোতল নেওয়া হল না ত ? আকাশগঙ্গার জল আসবে কিসে ?

ভৈরবী তখন বুঝিয়ে বললেন কুস্তীকে। জল ধরে নিয়ে গিরে আমাদের

লাভ কি ? আমাদের ত হরবাড়ি কোথাও কিছু নেই। জল নিয়ে গিয়ে আমরা রাখব কোথায় ? সবাই ফিরে যাবে নিজের নিজের বাড়িতে। বাড়িতে নিয়ে গিয়ে ঐ বোতলভরা জল পবিত্রভাবে রেখে দেবে হয়ত ঠাকুরঘরের কোণে। হিংলাজ থেকে ফিরে আসব আমরা ঘরে ফেরবার জন্তে নয়, পথে ঘোরবার জন্তে। পথ, পথ আর পথ। পথই আমাদের ঘর, পথই আমাদের সম্বল। আকাশগঙ্গার জল বত পবিত্রই হোক তা বোতলে ভরে নিয়ে কাঁধের ঝুলিতে করে চিরকাল বয়ে বেড়ানো সম্ভব নয়।

কুন্তী সত্যই আশ্চর্য হয়ে গেল। শুধু আশ্চর্যই হল না, আমাদের কোথাও ঘর না থাকার দুঃখটা এমন করেই বাজল তার বুকে যে সে ঐয় কৈদেই কেললে। আবার লাহসও দিলে আমাদের। কুছ পরোয়া নেই। আর আমাদের ঘরের দুঃখ থাকবেই না। এখান থেকে ফিরে গে নিয়ে যাবে আমাদের তার বাবার কাছে। কুন্তীর বাবা মাটির মাহুঘ আর তাঁর দয়াদর্শ ও খুব বেশি। আমাদের নিয়ে গিয়ে কুন্তী তার বাবাকে বলবে আমাদের একটা আশ্রম করে দিতে। দায়কার বুঝাবনে জুনাগড়ে—যেখানে আমরা পছন্দ করব সেখানেই জমি কিনে দেবে কুন্তীর বাবা। সেই জমিতে আশ্রম রাখব আমরা। কুন্তীও চিরকাল থাকবে কিনা সেই আশ্রমে সরাসিনী হয়ে। সেই হবু আশ্রমের পূজার ঘরের এক কোণে পবিত্র আকাশগঙ্গার জল নিয়ে গিয়ে টাঙিয়ে রাখতে পারবে না বলে কুন্তীর আফসোসের অন্ত রইল না।

একটা আলোও সন্ধ্যা নেওরা ঠিক হল। আর সন্ধ্যা নেওরা হল নিজের নিজের লোটা। ব্যস—এইবার চল সকলে।

“জয় শ্রী হিংলাজ মহারানী-কি—”

“জয় !”

উঠলো ছড়ি রূপলালের কাঁধে। তার সামনে আলো হাতে চলল গুলমহম্মদ। ধানিকটা এগিয়ে দিচ্ছে সে ফিরে আসবে। পথ তুল হবার কোনও সম্ভাবনা

নেই। সোজা পূবমুখো গেলেই নদী। রূপলাল এর আগে অন্তত বিশ্বাস বাওয়া-আসা করেছে।

মুখ বুজে সবাই চলেছি। গাছপালার ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে চাষের জমিতে পড়া গেল। তখন গুলমহম্মদ ফিরল একজনের হাতে আলো দিয়ে। বজ্রিশ ঘণ্টার মধ্যেই আমরা আবার ফিরে আসব এখানে। তবুও বুড়ার গলায় একটা করুণ বিচ্ছেদের সুর বেজে উঠল, যখন সে বার বার আমাদের সকলকে সাবধান করে দিবে বিদায় নিলে।

আমরা চললাম।

চাষের জমি শেষ হল। তখন হাড়ে হাড়ে টের পেলাম কি জন্তে উট নিয়ে নদীর ধার পর্যন্ত যাওয়া যায় না। হোঁচট, হোঁচট আর হোঁচট, সেই জোর রাতে আরম্ভ হল পদে পদে হোঁচট যাওয়া। শুধু অজস্র অক্লান্ত নোড়া-হুড়ি টিল-পাটকেল। তার উপর দিবে একবার খানিকটা উঠছি আবার নেমে যাচ্ছি অনেকটা। তখনও বেশ আশার রয়েছে। ভাল করে দেখাও যাচ্ছে না কিছু। একে অপরের ঘাড়ের উপর গিয়ে পড়ছি। সামনে থেকে রূপলাল চোঁচাচ্ছে “হঁশিয়ার, হঁশিয়ার!” আর ঠিক তার পর-মুহূর্তে যেই পা ফেললাম অমনি পায়ের নিচে থেকে কতকগুলো হুড়ি গেল গড়গড় করে গড়িয়ে! সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে পড়লাম সামনের কারো পিঠের উপর। তারপর আরম্ভ হল আলগা হুড়ির উপর দিবে উপর দিকে ওঠা। সে আরও কঠিন ব্যাপার। পা কেললেই খানিক পিছিয়ে নেমে আসতে হয়।

এই করতে করতে সকাল হল। চতুর্দিক স্পষ্ট পরিষ্কার দেখতে পাওয়া গেল তখন। দেখে একেবারে তাকব বনে গেলাম। এত নোড়া-হুড়ি কি উদ্দেশ্যে জড়ো করা হয়েছে এখানে? পৃথিবীস্থল মাহুদ মনের সাথ মিটিয়ে টেবিলের উপরের কাগজ-চাপা হুড়িরে নিয়ে বেতে পারে এখান থেকে। রঙে আকারে গঠনবৈচিত্র্যে একটির সঙ্গে অপরটির কিছুমাত্র মিল

নেই। এক রকমের একজোড়া কাগজ-চাপা খুঁজলেই মুশকিল, তা কিছুতেই মিলবে না এখানে।

সকলেই একটা-দুটো কুড়োতে লাগল। নিতে নিতে বোঝা ভারী হয়ে উঠল। তবুও বন্ধ হয় না ছড়ি কুড়ানো। কি করবে, এইমাত্র যেটি নজরে পড়ল সেটি যে আগেরগুলোর চেয়ে আরও অভূত ধরনের। টপ করে তুলে না নিয়ে উপায় কি। তারপর আবার ছ'না না এগোতেই ঐ আর একটি। আহা, এটি আরও অভূত। যেমন রঙ তেমনি জলজল করছে, সেটিকেও তুলে নিতে হল। এই করতে করতে শেষ পর্যন্ত সব কটি দিতে হল আঁচল থেকে ফেলে। কারণ তার পরেও বেগুলো চোখে পড়ছে, সেগুলো না নেওয়া একান্ত অস্বাভাবিক হবে। আবার ভরে উঠল আঁচল। কিন্তু আরও সামনে বেগুলো দেখতে পাওয়া গেল তার কাছে আগের কুড়োনো-গুলো সত্যিই একেবারে যাচ্ছেতাই বাজে জিনিস। হুতরাং আবার আঁচল খালি করবার দরকার হল।

হঠাৎ ছড়ির জগৎ গেল শেষ হয়ে। আরম্ভ হল বালি। ঝকঝকে তকতকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এক-নব্বরের সাদা বালি। রূপলাল তখন হাত তুলে দেখিয়ে দিলে। ঐ ওখানে ঐ পাহাড়ের কোল দিয়ে বয়ে যাচ্ছে অঘোর নদী, আর নদীর ওপারে ঐ পাহাড়েই মা হিংলাজের গুহা।

এবার পাহাড় দেখে কেউ ভয়বানি দিলে না। সাটাঙ্গ প্রণাম করতে শুয়ে পড়ল না কেউ। দণ্ড খাটতে খাটতে চললও না কোনও ভক্ত। উল্লাস-উচ্ছ্বাস লক্ষ্যবস্তু কিছুই নেই। নীরবে সকলে নেমে পড়লাম সেই বালির সমুদ্রে। শব্দবায়ের মত এটাকেও পার হতে হবে। ঐ দেখা যাচ্ছে কুল। এতদিনে কুল দেখা গেল। দাঁতে দাঁত চেপে সাঁতরে চললাম আমরা সেই বালির সমুদ্রে।

চোখে পড়ল জল। তার তর করে বয়ে যাচ্ছে কুলে কুলে ভরা এক নদী। ডান দিক দিয়ে নেমে এসে বাঁ দিকে চলে যাচ্ছে। এপারে বালি ওপারে

পাথর। সেই পাথরের পাড় উপর দিকে বেব ভেদ করে চলে গেছে অনন্ত আকাশের মধ্যে।

এই নদীর নাম অঘোর। ওপারের ঐ পাহাড়েই কোথাও আছে মা হিংলাজের গুহা। একার মহাপীঠের প্রথম আর প্রধান মহাপীঠ ঐ পাহাড়ের মধ্যে, যেখানে বিষ্ণুচক্রে খণ্ডিত হয়ে সতীর ব্রহ্মরত্ন পড়েছে। এই মহাপীঠ দর্শন করে ভগবান রামচন্দ্র ব্রহ্মহত্যার পাতক থেকে মুক্ত হন।

নদীর পাড়ে বালুর মধ্যে পৌতা হল হিংলাজের ছড়ি। কাঁধের ঝোলা নামিয়ে আমরাও বলে পড়লাম তার পাশে। চোদ্দ দিন চোদ্দ রাত পরে সত্যিই কুরিয়ে গেল পথ। সেই সঙ্গে নিঃশেষে কোথায় মিলিয়ে গেল এই চোদ্দ দিনের উত্তম-উৎসাহ আর পথের বিভীষিকা। এখন আমাদের কাছে পেরিয়ে-আসা পথের মূল্য এক কানাকড়িও নয়। বোধ হয় পথের কাছে আমাদেরও আর কানাকড়ির মূল্য নেই। হাব নদী থেকে অঘোর নদী—এই চোদ্দটা দিন আর রাত মনের অক্লিসক্তি জুড়ে ছিল এই পথ। হঠাৎ ঝাঁক হয়ে গেল মনটা। পথ খতম—আমরাও বেন খতম হয়ে গেলাম সেই সঙ্গে।

বলে আছি নদীর দিকে চেয়ে। কানে যাচ্ছে নদীর স্রোতের কলকল ছলছল ধ্বনি। মন দিয়ে শুনিছি কি বলছে নদী। হাঁ, বলছে—এইবার বেশ বুঝতে পারছি নদীর ভাষা—বলছে না শুধু, গাইতে গাইতে বয়ে চলেছে—

“নদীপারের এই আবারের

প্রত্যাহ্বানি—

নে রে, ও মন, নে রে আপন

প্রাণে টানি।

সবুজ নীলে সোনার মিলে

বে সুখা এই ছড়িয়ে দিলে,

জাগিয়ে দিলে আকাশতলে:

গভীর বাণী—

নে রে, ও মন, নে রে আপন

প্রাণে টানি।

এমনি করে চলতে পথে

ভবের কূলে,

ছুই ধারে যা কুল কূটে সব

নিস রে তুলে।

সেগুলি তোর চেতনাতে

গেঁথে রাখিস দিবসরাতে

প্রতি দিনটি যতন করে

ভাগ্য মানি—

নে রে, ও মন, নে রে আপন

প্রাণে টানি।”

“এই নিন আপনার দাঁতন।”

গানের উপর খাঁড়ার চোপ পড়ল। হুয়ের রেশটুকু কটাং করে দাঁত দিয়ে কেটে দিলে কে। কে আবার? কুন্ডী। ছু গাছা দাঁতন হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

“দাঁতন! দাঁতন কেন? বেশ ত চলছিল এতদিন বালি ঘষে দাঁত মাজা।”

“এখানে তা চলবে না। এখানকার নিয়ম দাঁতন করা। ঐ দেখুন সকলে দাঁতন ভাঙছে।”

নদীর পারে একেবারে জল ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে আছে কতকগুলো ডাঁটা। পাতা নেই বললেই হয়। সেইগুলো সবাই ছুটো করে ভেঙে আনছে। একটা দিয়ে

দাঁতন করবে আর একটা পুঁতে দেবে সেইখানে। এটিও একটি ভীর্ণকর্ম, অবশ্যপালনীয় কর্তব্য।

অবশ্যপালনীয় কর্তব্য এই একটিই নয় এখানে, আরও অনেক যকয়ের কর্তব্য রয়েছে। ময় পড়, তর্পণ কর পিতৃপুত্রের, দান-দক্ষিণা দাও। এখানকার দান দক্ষিণা সব ঐ ঠাঁর প্রাপ্য। ঐ যে এসে দাঁড়িয়েছেন, ছাত্তার কাপড়ের আলখালা পরে, বুক পর্যন্ত ছাড়ি, হাতে জপের মালা—উনি হচ্ছেন হিংলাজের পুরোহিত, নানী-কি হজের গীরসাহেব, এই মহাপীঠের মোহন্ত মহারাজ। মহাতপা নাগনাথের গদির বর্তমান অধীশ্বর বাবা ধর্মনাথ মহারাজ। কিন্তু ঐ ধর্মনাথ নাম উনি নিজের বহুকাল ভুলে গেছেন। ভুলতেই হবে। ব্যবহার না করলে বড় বড় ধারালো অস্ত্রই হোক না কেন তাতে মরচে ধরবেই। তেমনি নামের বেলাতেও। ঠাকুরদা শিবভক্ত। নাতির নাম রাখলেন পঞ্চানন। অতি মহৎ উদ্দেশ্য। নাতিকে ডাকবেন আর ঠাকুরের নামও নেওয়া হবে। পিসি সেই পঞ্চাননকে আদর করে পাঁচ বলে ডাকতে লাগলেন। সঙ্গে সঙ্গে দেশভুক্ত লোক বললে পেঁচো। ঐ পেঁচোই ঠিকল, পঞ্চাননকে সবাই গেল ভুলে।

হিংলাজের মোহন্ত মহারাজের বেলাও ঠিক তাই হয়েছে। কান কাটিয়ে—নাথসম্প্রদায়ের সাধুদের কানে ছোঁয়া করে একটা কিছু পরতে হয় কানে—গেরুয়া পরে, লম্বা কলকে লম্বল করে, মাত্র আটশ বছর বয়সে নাথসম্প্রদায়ের এক সন্ন্যাসী হিংলাজ-দর্শনে এসে আর কিয়তে চাইলেন না এখান থেকে। মরে গেলেন এই অঘোর নদীর কূলে। তাঁর সত্বের বাজীরা আর ছড়িওয়ালা তাঁর পারে মাথা খুঁড়েও তাঁকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারলে না। একটা মানুষকে এই জনমানবহীন জায়গায় কেলে বেখে তাঁরা কানতে কানতে কিরলেন করাচী। করাচীতে নাগনাথের আখড়ার সবাই হার-হার করতে লাগল। আহা লোকটা না যেতে পেয়ে শুকিয়ে মরবে কিংবা বাহ বাহেড়া বা নেকড়েতে খেয়ে কেলবে! তাঁরপর সবাই গেল সন্ন্যাসীর কথা ভুলে।

হু হু শব্দ পরে আবার ছড়ি এল করাচী থেকে। এল একদল বাজী আর ছড়িওরা। এসে এইখানে এই অঘোর নদীর কূলে বসেছে তখন সামনে আবির্ভূত হল এক মূর্তি। আপাদমস্তক নগ্ন এক নরকঙ্কাল। তাকে দেখে ত সবাইএর ভিঁরমি লাগবার যোগাড়। তখন সেই মূর্তি কথা বললেন, অভয় দান করলেন। বললেন, “আমিও তোমাদের মত মানুষ, মা হিংলাজের সেবায়িত। মা হিংলাজের আদেশে এখানে বাস করছি।”

সেই দিন এই নদীর কূলে সেই ভাগ্যবান বাজীদল আর তাদের ছড়িওরা চীৎকার করে উঠেছিল, “জয় মোহন্ত মহারাজ কি জয়!” সেই বাজীদলই সর্বপ্রথম পূজা করল মোহন্ত মহারাজের। তারা যা দান-দক্ষিণা করলে এখানে, তাদের ছড়িওরা তা আর নিলে না; মোহন্ত মহারাজের পায়ের কাছে নামিয়ে দিয়ে ঘোষণা করলে যে, এখন থেকে অঘোর নদীর কূলে বাজীরা যা দেবে সে সমস্তই হবে মোহন্ত মহারাজের প্রাণ্য। এ সব ব্যাপার ঘটে অস্তিত্ব বাট বছর আগে। কিন্তু সে নিয়ম আজও চলে আসছে। অঘোর নদীর কূলে বাজীরা হিংলাজের মোহন্তর হাতেই দানদক্ষিণা করেন।

কিন্তু এই বাট বছরে অনেক কিছু বদলেছে। বাট বছর আগেকার আটশ বছরের সন্ন্যাসী বাবা ধর্মনাথ নিজের নামটিও বোধ হয় ভুলে গেছেন। লাগবেলা রিয়ারতের সর্বত্র এখন ইনি ‘কোটুরী পীর’ বলে বিখ্যাত। আর করাচীর নাগনাথের আখড়ার ছড়িওরা তাকে ‘অঘোরী বাবা’ বলে। এখানকার সরকার প্রতি বছর এঁকে নজরানা দেন। তাতেই সারা বছর এঁর বেশ সচ্ছল অবস্থায় চলে। কোটুরী পীরের অসীম কৃপা। এখানকার লোকে বিশ্বাস করে যে ইনি মরা বাঁচাতে পারেন। এমন কি, এঁর মুখের কথায় সরকার যত্নদণ্ড পর্যন্ত মকুব করে দেন। অঘোর নদীর এ-পারে আরও ডানদিকে থানিকটা গেলে অঘোরী বাবার আন্তানা পাওয়া যাবে।

বলে বলে দাঁতন ববছি দাঁতে আর অঘোরী বাবার কাহিনী শুনিছি রূপলালের কাছে। ওখানে একে একে সবাই শ্রান করে গিয়ে অঘোরী বাবার

হাতে দানদক্ষিণা করছে। মেওয়া, মিছরি, আর মগদ টাকা-পয়সা। বাবা সকলের মাথার হাত রেখে আশীর্বাদ করছেন। দূর থেকে দেখতে পাচ্ছি একমুখ সাদা চুলদাড়ির ভিতর তাঁর চোখদুটি। চোখদুটি দিয়ে যেন হাসি উথলে উঠছে। জগতে সবচেয়ে দুর্লভ বস্তুটির নাম কি? আমাকে এ কথা জিজ্ঞাসা করলে আমি বিনা বিধায় উত্তর দেব—“বস্তুটির নাম অনাবিল প্রসন্নতা।” বস্তুটি এতই দুর্লভ যে অনেকের ভাগ্যে সারা জীবনে ও-জিনিসের দর্শনই মেলে না। কখনও কারও ভাগ্যে যদি দৈবাৎ মিলে যায় ওর সাক্ষাৎ, তখন ওর ছোঁয়া লেগে তার মনপ্রাণও চলছলিয়ে ওঠে। সেদিন অঘোর নদীর কিনারায় অঘোরী বাবার দুই চোখ দিয়ে যে-অমৃত ঝরে পড়ছিল তাতে স্নান করে দলহুত সবাইএর যেন মন আত্মা জুড়িয়ে গেল।

সকলের শেষে স্নান করে বাবার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। চোখ তুলে চেয়ে বাবা হাত পাতলেন। বললাম, “বাবা, আমার ত কিছুই নেই এ ছনিয়ার বা তোমার হাতে দিতে পারি। আমি নিজেই ভিখারী। একমাত্র আমি নিজেকেই দিতে পারি তোমার পায়ে। নাও তুমি আমাকে যদি তোমার কোনও কাজে লাগে।” বলে বাবার ছু পায়ে হাত দিলাম। বাবা হো হো করে হেসে উঠলেন। বললেন, “বা—নদী পার হয়ে মায়ের স্থানে চলে যা। ব্রাহ্মমুহুর্তে আবার দেখা হবে।”

কাঁধের ঝোলাঝুলি পুঁটলি বেঁধে মাথার তুলে সকলে জলে নামলাম। এখানে বৃষ্টি হয়ে গেছে। নদীর জল বেড়েছে। ভয়ানক টান নদীতে। জল আমাদের কোমর ছাড়াল। শ্রীমান ছোট পাণ্ডা বাবাজীর ছাড়াল গলা। তখন ভৈরবীর পুঁটলি এল আমার মাথার। স্খলনকে পিঠে করে ভৈরবী অবলীলাক্রমে মাতার দিকে একেবারে ওপারে চলে গেলেন। আমরাও অনেকে হেঁটে পার হয়ে এলাম। জল নদীর মাঝখানে আমাদের গলা পর্যন্ত পৌঁছল। এ পারে এসে কানে এল কুস্তীর গলা। গলা জলে দাঁড়িয়ে কুস্তী চিল-চৈচাচ্ছে। জ্বোতে তাকে টেনে নিয়ে যেতে চার। একলা পোশটতাই তার হাত টেনে

ধরে নদীর মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছেন। আবার ঝাঁপিয়ে পড়লেন ভৈরবী। সঁাতরে গিয়ে ধরলেন কুস্তীর হাত। কুস্তীর মাথা থেকে পুটলিটা পোপটভাই নিলেন। অমনি একটানে কুস্তীকে এখানে এনে কোমর-জলে দাঁড় করিয়ে দিলেন ভৈরবী। কুস্তী নাকানিচোবানি খেয়ে টোক-ছুই জল গিললে। বরিশাল না থাকলে রাজস্থান টানের চোটে ভেসেই যেত। শুকনো ভাঙার সব কারবারই চলতে পারে কিন্তু জলে না নামলে সঁাতার শেখা যায় না।

কূলে উঠে কাপড় নিঙড়ে নিয়ে ভিজ্ঞে কাপড়েই ঢুকলাম আমরা মার খামমহলে। ভিজ্ঞে কাপড় শুকোতে ক মিনিটই বা লাগবে এখানে। সকলের কাছে আর একখানি করে নতুন কাপড় আছে, যা পরে ভোরবেলা মাকে দর্শন করতে হবে।

তারপর নীরবে নিঃশব্দে মহলের পর মহল পার হয়ে চললাম আমরা। শুধু ছুই চোখ দিয়ে গিলছি সেই রহস্যপুরীর অদ্ভুত দৃশ্য আর অপক্লপ সাজ-সজ্জা। মার দ্বত্ভাঙারের বন্ধক হচ্ছেন বন্ধরাজ কুবের। এ সেই কুবেরের পুরী, মার কাছে পৌঁছতে হলে আগে এই বন্ধপুরী পার হতে হবে।

ডাইনে বায়ে পাহাড়, বন্ধপুরীর গগনস্পর্শী পাবাগপ্রাচীর। নিজেদের খেয়াল-খুশি মত গড়েছে এ পুরী বন্ধরা। বন্ধদের নিজস্ব নির্মাণকৌশল, তার উপর বন্ধ-পদ্ধতির উন্নত রঙের খেলা। রঙের উপর রঙ চলে দিয়েছে, মিলল কি মিলল না বন্ধ-পদ্ধতিতে সে-সবের বাছবিচার নেই। শুধু রূপে বর্ণে আলোর আধারে এমনটি হওয়া চাই যা একই সঙ্গে আনন্দ বিন্দুর আর আতঙ্ক সৃষ্টি করতে পারে, যা দেখে বাছজান পর্যন্ত লোপ পায়। তবেই হবে বন্ধ-শিল্পকলার চরম সার্থকতা।

এ পুরী গড়া হয়েছে বেশ সোজা কারদার। নানা রঙের পাখর গলিয়ে শুধু ঢেলেছে আর ঢেলেছে। সেই গলা পাখর ইচ্ছে মত গড়িয়ে গড়িয়ে মিলে-মিলে একাকার হয়ে কিছুতকিমাকার রূপ গ্রহণ করেছে। বহু উর্ধ্বে আকাশ-রঙের ছাত, সেখান থেকে নেমে এসেছে দু পাশের পাবাগপ্রাচীর। পারের

ভলার মেঝেও নানা রঙের গলানো পাথরের তৈরী। একবার ভাইনে একবার বাঁয়ে ঘুরে ঘুরে চলেছি ত চলেছিই। মোড় ঘুরলেই সব দাচ্ছে পালটে, দু পাশের পাষাণ-প্রাচীরের গায়ে আরও ভরস্বর সব চিত্র ফুটে উঠছে। সেই সমস্ত অমাহুযিক নকশায় না আছে কোনও অর্থ না আছে কোনও হান ছন্দ। গলানো পাথরের তৈরী সেই সব অতিকায় মূর্তি যে কাদের তা কল্পনা করাও দুঃসাধ্য।

এদের কারও হাত নেই, কারও পা নেই, কারও মাথাটাই নেই। কেউ ঝুলছে, কেউ বলে আছে, কেউ বা দাঁড়িয়ে আছে। কোনটা হাতির মত, কোনটা কুমিরের মত, কোনটা বা প্রকাণ্ড তালগাছের মত। বিকটাকার দানব আর রাক্ষস সব পাষাণ হয়ে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে দুপাশের গগন-স্পর্শী পাষাণ-প্রাচীরের গায়ে। আর মাঝখানের ফাঁকটি জুড়ে রয়েছে নিরেট নিশ্চিহ্ন নিস্তরতা। সেই প্রাণহীন নিস্তরতার মধ্যে আমরা ঘুরে বেড়াতে লাগলাম।

চলতে চলতে মনে হতে লাগল হয়ত এই মুহূর্তেই বক্ষাধিপতির অদৃষ্ট অঙ্গুলি-সঙ্কেতে এই সব পাষাণ-মূর্তিরা নড়েচড়ে উঠবে। পাষাণ-প্রাচীরের পা থেকে নেমে এসে দাঁড়াবে আমাদের পথ জুড়ে। কিংবা জুড়ে দেবে নিজেদের মধ্যে হিংস্র উদ্দাম হাতাহাতি। তখন? তখনকার অবস্থা কল্পনা করতে গিয়ে ভয়ে চোখ বুজে কেললাম।

চোখ বুজে চলতে চলতে বারবার মন দিয়ে শোনবার চেষ্টা করছি এই পাষাণ-প্রাচীরের অন্তরালে কবে কাঁদছে নাকি কোনও বিরহিনী বক্ষপ্রিয়া! কিংবা বাজছে নাকি কোথাও বক্ষরমণীর গদ-শিখিনী বীণা স্বন্দর মুরলীর তালে তালে। বারবার মনে হতে লাগল এই বক্ষপুত্রীর বক্ষকেরা অন্তরীক থেকে আমাদের উপর নজর রাখছে। অনেকে আবার চলেছেও আমাদের সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু আররা তাদের দেখতে পাচ্ছি না। এ চোখ দিয়ে তাদের দেখা যায় না। শিপ্রা নদীর তীরে মহাকালকে তপস্তার ভূট করে কালিদাস

যে দৃষ্টি লাভ করেছিলেন সেই দৃষ্টি লাভ করলে বন্ধ-বন্ধীদের চাক্ষু্য দেখা যায়। আর তখন বন্ধপুত্রীয় এমন বর্ণনাই করা যায়—যা শুনে লোকে সেখানে না গিয়েও সেই বন্ধপুত্রীয় প্রত্যক্ষ ধারণা করে আনন্দ লাভ করতে পারে।

একসময় ডান পাশের দেওয়াল গিছু হটে সরে যেতে লাগল। পায়ে নীচে দেখা দিল মাটি, ভিত্তি নরম মাটি। বোদ আর ছায়া, ছায়া আর বোদের লুকোচুরি খেলা চলতে লাগল। দেখা দিল দূর্বাঘাসের সবুজ চাপড়া, সব শেষে মস্ত বড় বড় রক্তকরবীর ঝাড়। সেই রক্তকরবীর ঝাড়ের ওপাশে একটি কীণ নিরীক্ষণী ফুল ফুল করে বয়ে চলেছে।

জলের ধারে পৌছেই রূপলাল চীৎকার করে উঠল, “হিংলাজ মহা-মারীকি”—

মারের সব-কিছু সন্তান সমবেত কণ্ঠে উত্তর দিলে, “জয়!”

সামনেই হিংলাজ।

হু তিন হাত চওড়া জলধারাটির অপর পারে আর একটি খাড়া পাহাড়। সেই পাহাড়ের কোলে ঠিক আমাদের সামনেই এক বিরাট গহ্বর। মুখের দিকটা অস্বস্ত তিনতলা সমান উচু। ছাত ক্রমে ভিতর দিকে নেমে গেছে। নীচে কি আছে দেখা গেল না। জলের ওপারেই কয়েক ঝাড় করবী গাছের আড়াল পড়েছে।

কাউকে বলে দিতে হল না এই হিংলাজের গুহা। প্রকৃতিদেবী বহুতে লাজিয়ে দিয়েছেন মারের স্থান। লাজিয়েছেন অতি অল্প উপচারে। তর তর করে বয়ে চলেছে একটি কীণ নিরীক্ষণী, আর কয়েক ঝাড় রক্তকরবীর গাছ। টকটকে লাল ফুল অজস্র ফুটে রয়েছে গাছে। বইছে নীতল হাওয়া। এতকণে যে সুরু পথটা দিয়ে ঘুরে ঘুরে এলাম তার মধ্যে এতটুকু হাওয়া ছিল না। হু পাশে পাহাড় ভেঙে ভিতরের হাওয়া আগুন হয়ে উঠেছিল। অঘোর নদী থেকে উঠে ভিত্তি কাপড়ে আমরা ঢুকেছিলাম পাহাড়ের মধ্যে। কাপড়

তকিয়ে কখন খরখরে হয়ে গেছে তা টেরও পাই নি। এতক্ষণে হাঁক ছেড়ে বাঁচলাম। হিংলাজের নীতল স্পর্শে দেহ মন প্রাণ জুড়িয়ে গেল। এখানে এলে সকলের সকল আলা জুড়োবেই। স্বয়ং দক্ষকণ্ঠা পতিনিদার আলা জুড়োবার অন্তে এখানে এসে লুকিয়েছেন। ত্রিতাপ-আলা জুড়োবার এর চেয়ে উপযুক্ত স্থান আর কোথাও আছে নাকি!

তখন রূপলাল কাঁধ থেকে ছড়ি নামিয়ে সেখানে পুঁতলে। ছড়ি আর ঘাবে না। ছড়ির ওপারে যাওয়া নিষেধ। ছড়ি পুঁতে জলে নামল রূপলাল। তার পিছন পিছন আমরাও।

জল পারের গোছ পর্যন্ত উঠল। কিন্তু খুব সাবধানে পা টিপে টিপে পার হতে হল। পাখরের উপর শেওলা পড়েছে। পা ফেললেই পিছলে যায়। অপর কূলে পা দিয়েই আবার রূপলাল চীৎকার করে উঠল—“জয় শ্রীহিংলাজ মহামায়া কি—”

আবার সকলে একযোগে জয়ধ্বনি দিলে। এবার কিন্তু সেই ধ্বনি তখনই মিলিয়ে গেল না। গুম গুম করে ছুটে বেড়াতে লাগল গুহার মধ্যে। সেই জয়ধ্বনি শতগুণ হয়ে ফিরে এল আমাদের কানে। রূপলালের পিছু পিছু দু’ঝাড় রক্তকরবীর মাঝখানের সরু পথ দিয়ে গিয়ে আমরা দাঁড়ালাম একটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন আড়িনায়। মূখ তুলে দেখলাম অনেক উচুতে লালচে পাখরের ছাত কূলে আছে আড়িনার উপর। সামনে কয়েক খাক সিঁড়ির মত উপর দিকে উঠে গেছে, তারপর অন্ধকার গুহা। তখন সেই আড়িনার উপর সবাই সাঁটানে লুটিয়ে পড়ল।

অবশেষে সত্যাই পৌঁছলাম।

হুঃখ-কষ্ট, লাভ-লোকসান, এমন কি প্রাণের বাঁচা পর্যন্ত তুচ্ছ করে বার ডাকে কাঁপিয়ে পড়েছিলাম মরুভূমির বুকে, বার বলে বলীয়ান হয়ে এই এক পক্ষ দিনরাত অহরহ বুকেছি মরণের সঙ্গে, বার ছুঁবার আকর্ষণ এই অসম্ভব

সম্ভব করলে, তার চরণতলে পৌঁছে এতটুকু উত্তেজনা উজ্জ্বল নেই মনের কোণেও। বরং একটা পরম নিশ্চিন্ত ভাব বেন পেরে বসল। হাত-পা লবাক এলিয়ে পড়ল। কাঁধের বুলিটা একপাশে নামিয়ে শুহার সিঁড়িতে হেলান দিয়ে বসে পড়লাম।

অতবড় মহাভীর্ষে পৌঁছে একটি অতি সাধারণ সহজ সরল ঘটনা মনে পড়ে মনকে একেবারে আচ্ছন্ন করে ফেললে। একবার অনেক দিন পরে বাড়ি গিয়েছি। বাড়ি বাবার অস্ত্রে মা বারবার চিঠি দিচ্ছিলেন। কিন্তু ছুটি পাচ্ছিলাম না। হঠাৎ ছুটি পেলাম, পেয়েই রওয়ানা। স্ত্রীয়ার থেকে নেমে নৌকা পেলাম না। তাতে বড় ব্যয়েই গেল। হেঁটেই মেরে দিলাম ক্রোশ তিনেক পথ। বাড়িতে ঢুকে কাকেও দেখতে পেলাম না। মা বোধ হয় তখন ঘাটে গিয়েছেন—কিংবা ওপাশের রাস্তাঘরে কিছু করছেন। তা আর ভাকাভাকি করব কি, দাওয়ার উঠে নিশ্চিন্তে শরীর এলিয়ে দিলাম। মা আসবেনই এখানে, এখনই। তখন আমার দেখে একেবারে আকাশ থেকে পড়বেন। মায়ের গলার আওয়াজ শোনবার আশায় চোখ বুজে শুয়ে আছি। বোধ হয় একটু তন্দ্রাও এসেছিল। হঠাৎ তন্দ্রা ছুটে গেল। মাথার চুলের মধ্যে আঙুলের স্পর্শ পেলাম কার। মটকা মেয়ে পড়ে রইলাম। এ স্পর্শ অল্প কারও হতেই পারে না। এ আমার মায়ের হাতের স্পর্শ। এইটুকুর লোভেই এতটা পথ ছুটে এসেছি। ভিটকিলিমি করে চোখ বুজে পড়ে আছি, তখন কানে এল মায়ের গলার স্বর, “কখন এলি বাবা? একটা ধবর দিবে আসতে হয়—ঘাটে নৌকা পাঠাতাম।” তবু চোখ বুজে চুপটি করে শুয়ে আছি। যতক্ষণ এ ভাবে থাকব ততক্ষণ মা মাথার কপালে হাত বুলিয়ে দেবেন।

আবার কানে এল, “শরীর ভাল আছে ত রে খোকা? এসেই দাওয়ার উপর শুধু মাটিতে এ ভাবে শুয়ে পড়েছিল!” চাপা উৎকর্ষা মায় গলার। আর থাকতে পারলাম না, তড়াক করে উঠে বসে মায়ের পা চুখানিতে হাত বুলিয়ে কপালে মাথার ঠেকালাম। বললাম, “ভয়ানক শরীর ধারণ হয়েছে

মা, পেটের ভিতর জ্বলছে। তোমার ছেলের সারা শরীরের মধ্যে ঐ একটা জায়গাতেই যা কিছু খারাপ-ভাল হয়—আর তখন খালি তোমার কথা মনে পড়ে। দাও, আগে কি খেতে দেবে দাও। নয় ত অনর্থ বাধিয়ে বসব।”

মা হেসে কেললেন। আমার নিজস্ব সম্পদ আমার মায়ের মুখের সেই হাসি, যার সঙ্গে ছুনিয়ার আর কারও মায়ের হাসি মেলেই না। সব ছেলের কাছেই তার মায় মুখের হাসিটি হচ্ছে একান্ত নিজস্ব সম্পদ যার সঙ্গে অন্য কারও মায়ের হাসি মেলেই না। হেসে কলে মা বললেন, “তবে উঠে পড় না, হাত মুখ ধুয়ে নে। সেই ত কাল সকালে ভাত খেয়েছিল, এতটা পথ হেঁটে এলি, ক্ষিদে পাবে না।” তবু উঠছি না, জলুক পেট, তবু যতদূর মায় কাছে বসে থাকি যায়।

অনেক দিন পরে আজ আবার চোখ বুজে শরীর এলিয়ে দিই পড়ে আছি নিশ্চিন্ত হয়ে। মন আচ্ছন্ন হয়ে আছে একটি কৃত্যশার। আজ আবার মা এসে পাশে বসে মাথায় কপালে হাত বুলিয়ে দেবেন। আমার মায় চাপা কণ্ঠস্বর শুনতে পাব, “কখন এলি বাবা, শরীর খারাপ করে নি ত?” তখন চোখ মেলেই মায়ের মুখের হাসিটি দেখতে পাব, যে হাসির সঙ্গে অন্য কারও মায়ের হাসি মেলেই না, যে হাসি আমার একান্ত নিজস্ব সম্পদ।

“নিম, বিড়ি নিম একটা।”

চোখ চাইতে হল। মায়ের হাসি কোথায় মিলিয়ে গেল। দীর্ঘশ্বাস কলে বললাম, “দাও।”

বিড়ি ধরানো হলে রূপলাল বললে, “একটা মহা অজ্ঞান করলাম। অঘোরী বাবা ভয়ানক চটে যাবেন।”

আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, “কেন, কি হল আবার?”

একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে রূপলাল বললে, “এই যে সোজা আপনাদের এনে

তুললাম মায়ের হানে এইটেই অভ্যাস হয়ে গেছে। নিয়ম হচ্ছে, দিনের বেলা ঝরনার ওপারে থাকতে হবে। লক্ষ্য করেন নি বোধ হয়, খানিকটা আগে রাস্তার ধারে জঙ্গলের মধ্যে একখানা পাথরের ঘর আছে। ওখানেই সন্ধ্যা পর্যন্ত আমাদের থাকতে হবে। সেখানে রান্না-খাওয়া সেরে সন্ধ্যার পর ঝরনা পার হওয়া হচ্ছে নিয়ম। আর ভোর-রাতে ব্রাহ্মমূর্ত্তে মায়ের গুহা থেকে বেরিয়ে এসে তৎক্ষণাৎ ঝরনা পার হয়ে ওপারে চলে যেতে হবে।”

বললাম, “তা নিয়ে গেলে না কেন আমাদের সেই জঙ্গলের মধ্যকার ঘরে। বেশ ত, সন্ধ্যা পর্যন্ত না-হয় আমরা সেখানেই কাটিয়ে আসতাম। কি দরকার ছিল বেআইনী কাজ করবার।”

রূপলাল একান্ত তাক্ষিল্যের সঙ্গে উত্তর দিলে, “আরে রেখে দিন আপনার আইন-কাহ্নন। এবারের যাত্রায় চন্দ্রকূপে সব নিয়ম আমরা বিসর্জন দিয়ে এসেছি। নিয়ম হচ্ছে, চন্দ্রকূপ বাবা বাধা দিলে আর এগোনো যাবে না। কতকগুলো লোকের ত পূজোই হল না সেখানে, বাবার হুকুমও নেওয়া হল না। তা কাউকে কি আমরা ফেলে এসেছি নাকি। ওখানে অঘোরী বাবাকে চন্দ্রকূপের ঘটনা বলে জিজ্ঞাসা করলাম, ‘এখন কি করা উচিত? সবাই কি যেতে পারবে নদীর ওপারে?’ বাবা বললেন, ‘আলবৎ পারবে। সোজা সবাইকে নিয়ে যা মায়ের হানে। তুই ব্যাটা কালকের বাচ্ছা, তুই নিয়মের কি বুঝবি?’ তখন সবাইকে নিয়ে অঘোর নদী পার হয়ে চলে এলাম। কিন্তু দিন থাকতেই যে মায়ের গুহার চলে এলাম এতে হয়ত অঘোরী বাবা ভয়ানক চটে যাবেন।”

বললাম, “তা বেশ ত, এখন আবার চল, সবাই চলে যাই সেই পাথরের ঘরে। আবার সন্ধ্যার পর আসা যাবে।”

রূপলাল বললে, “হ্যাঁ এখন আবার কেউ যেতে রাজি হবে নাকি সেখানে। সেখানে গিয়ে ঘর পরিষ্কার করতে করতেই সন্ধ্যা হয়ে যাবে। তার চেয়ে এক কাজ করুন, অঘোরী বাবা যদি জিজ্ঞাসা করেন ‘কেন দিনের বেলা এলি এখানে?’ তখন আমি আপনাকে দেখিয়ে দেব, বলব ‘কি করব, এই দলের

মোহন্ত যদি যেদাজেদি করেন দিনের বেলা এখানে আলুবার জন্মে, তখন আমি—ছড়িদার পাণ্ডা বাহু—আমি কি করতে পারি।”—তারপর আপনি সামলাবেন।”

কিছুক্ষণ চুপ করে ছোকরার মুখের দিকে চেয়ে রইলাম। তারপর বললাম, “বেশ, তাই হবে। অঘোরী বাবাকে আমি সামলাব। তুমি তোমার রাজীনের সামলাও। ঝরনার এ পারে কেউ যেন থুথুও না ফেলে। বার বা দরকার হবে ওপারে গিয়ে করে আসবে।”

রূপলাল উঠে গেল সবাইকে সাবধান করতে। সুখলাল এসে বললে, “চলুন আবার ঝরনার ওপারে। ওখানে চা বানানো হয়ে গেছে।”

“এখানেও চা হয়ে এনেছ নাকি তুমি?”

সুখলাল প্রশান্ত হাসি হেসে বললে, “তুখু চা কেন, মারীজি কিসমিস খেজুর আখরোট সব এনেছেন চিরঞ্জীলালের বাড়ে চাপিয়ে। সবাই ওপারে চলে গেছে, সেখানে জল খেয়ে তবে আবার আসবে।”

উঠে দাঁড়িয়ে চারিদিকে চেয়ে দেখি একটি প্রাণীও নেই। তুখু কুলিগুলি পড়ে আছে। সুখলালের হাত ধরে শেওলা-পড়া পাথরের উপর সাবধানে পা কেলো আবার সেই তিন হাত জল পার হলাম।

এ পারের একটা পরিষ্কার জায়গায় কুড়ী চা চড়িয়েছে ছোট ডেকচিটার। তার পাশে ভৈরবী আঁচল পেতে শুয়ে পড়েছেন। আর সবাই চারিদিকে ঘিরে বসেছে। বড় কলকের আত্মন দেওয়া হয়েছে। বেশ একটা নিশ্চিন্ত ভাব সবাইএর চোখে-মুখে ফুটে উঠেছে—যেন দুটির দিনে চড়ুইভাতি করতে এসেছে সবাই। পোপটভাই সাহর অভ্যর্থনা করলেন—“আত্মন আত্মন, বসে পড়ুন এখানে।” বললাম, “তবে যে শুনেছিলাম আমরা আজ উপোস করে থাকব?” শুয়ে শুয়েই ভৈরবী উত্তর দিলেন—“কেন? উপোস করে করতে বাব কেন গুটিমুড় সবাই মায়ের স্থানে এসে? আজ ভাল করে ধাওয়া-দাওয়া করবার দিন। কিছু নেই লভে, তা আর কি করা যাবে। যা আছে তাই এক এক

মুঠো খেয়ে জল খাওয়া থাক। সেই ভোররাতে দর্শন, ততক্ষণ না খেয়ে শুকিয়ে থেকে কি লাভ।”

উপোস করে থাকলে কি লাভ হয় তা আমিও জানি না। উপোস-তত্ত্ব সবকিছু জান আছে ভাস্করদের, যারা পঞ্জিকা ছাপান তাঁদের, আর দেশের সরকারী কর্তাদের। প্রথম দল বলেন, উপোস করলে রোগ সারে। দ্বিতীয় দল বিধান দেন, উপোসে পাপ কমে। আর তৃতীয় দল আইন বানান, কম খাও, উপোস কর, মুখ বুজে উপোস করে মর, পেট ভরে খেতে চাওয়া আইমত দণ্ডনীয় অপরাধ। তা আমি ঐ তিনদলের কোনও দলে স্থান পাব না। কাজেই মাথা চুলকোতে লাগলার।

শ্রীমতী কুন্তীদেবী একাই একশ’। কোমরে আঁচল জড়িয়ে ছুটোছুটি করছে। এঁকে আরও ছুটো খেজুর, ওকে কিসমিস একমুঠো বেশি, আবার কাউকে বা শুধু মিষ্টি থমক দিয়ে লম্বাট করছে। শুয়ে শুয়েই ভৈরবী সাবধান করে দিলেন, “সব দিয়ে ফেলিস নি। হুখলালের জন্তে কিছু যেন থাকে। রাতে আবার ওকে খাওয়াতে হবে।”

চায়ের গেলান হাতে করে বসে বসে দেখছি আর ভাবছি কিরে গিরে কোথাও আশ্রয় ফাঁদলে এ মেয়ে বেশ চালাতে পারবে। শুধু এ মেয়ে নয়, পৃথিবীস্থল মেয়েরাই এই একটি মাত্র কাজ সহজে হুশুখলে অবলীলাক্রমে সমাধা করতে পারে, আর তা করে তৃপ্তিও পায়। যদি বলি গৃহের মধ্যে গৃহীণীপনা করাতেই নারীজীবনের চরম সার্থকতা তাহলে আমারও যেমন বাড়াবাড়ি করা হবে, তেমনি অবিলম্বে লগুড় হাতে তেড়ে আসবেন আর একদল যারা কায়মনো-বাক্যে কামনা করেন যে ভবিষ্যৎ হাওড়া পুলের মাথাটা যখন জোড়া হবে তখন সেখানে উঠে বুলতে বুলতে হাতুড়ি ঠোকা কর্মটি দাড়িওয়াল পাঞ্জাবী ভ্রাতাদের বদলে বেগী-ঝোলানো মেয়েরাই করবে। তা করুক, আর তাতে যদি মেয়ে-পুরুষের সমান অধিকার নিরে বিটকেল খেয়োখেরিটা ঠাণ্ডা হয় তা হোক। তবু লবিনরে নিবেদন করব যে, যতদিন না শারদা ছনিয়ার সবাই হোটোলে

খেতে আর সরাইখানায় শুতে শুরু করছে, ততদিন গৃহ থাকবেই। তখন গৃহ বাঁধলেই প্রয়োজন হবে গৃহিণীর। ওর একটিকে ছেড়ে অপরটির কোনও সার্থকতা নেই।

দেশময় বড় বড় হোটেল আর প্রমুখিত্তবন বানাতে পারলে রান্নাঘর আর আতুড়ঘরের হাত থেকে রেহাই পেয়ে আমরা হাঁক ছেড়ে বাঁচব এ কথা আমিও মানি। ঘর থেকে মুক্তি-পাওয়া মেয়েরা কামান বন্দুক এরোপ্লেন চালিয়ে কত বড় বড় বীরত্ব দেখাচ্ছেন সে সব কাহিনী শুনতে শুনতে আমারও সর্বশরীর রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। তখনকার গার্মী-মৈত্রেয়ী আর এখনকার অনারেবল মিনিষ্টার শ্রীমতী লক্ষ্মীরা হুত্বক্ষণ্য আগার এম ডি, ডি টি এম, ডি এস সি, পি এইচ ডি—এঁদের সকলের কাছেই আমি প্রজ্ঞার মাথা নত করি। সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের কথাও তুলতে পারি না যারা কোটি কোটি গৃহের মধ্যে মা বোন স্ত্রী কস্তা রূপে নীরবে নিঃশব্দে সারাজীবন কাটিয়ে দিচ্ছেন শুধু এতবড় মহত্ব-সমাজকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে। এঁরা ঘরে বসে রয়েছেন এই দুঃখে কত ঘটি চোখের জল বে এ পর্বন্ত পড়েছে এবং ভবিষ্যতে আরও কত ঘটি পড়বে তার ইয়ত্তা নেই। তবু ভেবে পাই না এঁরা সবাই যেদিন ঘর ছেড়ে পথে নেমে পাড়াবেন সেদিন ঘরের প্রাণ থাকবে কেমন করে। মা বোন স্ত্রী কস্তা এঁদের কাছে বা আমরা চাই আর পাই তা তখন পাওয়া বাবে কোথায়? এতবড় প্রয়োজনের দাবী সেদিন মিটবে কি দিয়ে? হাওড়া পুলের মাথার দাড়ির বহলে বেণীকে হাতুড়ি ঠুকতে দেখেই কি তখন আমরা ঘরের অভাব তুলতে পারব?

চায়ের গেলাসে চুমুক দিতে দিতে সেই কথাই ভাবছিলাম। ভাবছিলাম আমাদের এই পুণ্যকারী দলটিতে একটি কুস্তী বহিনের অভাব সত্যই ছিল। ভাগ্যক্রমে কুস্তী এসে জুটেছিল আমাদের সঙ্গে। তা না হলে এই ঘায়ের স্থানে এসে আজ আমরা গোরড়া মুখ করে কলকে হাতে নিয়ে আত্মচিন্তার ডুবে থাকতাম কিংবা কখন রাতটা শেষ হবে আর মায়ের শুহা থেকে বেরিয়ে এসে

আমরা এ স্থান থেকে বিদায় নেব সেই চিন্তায় ছটফট করতাম। তাতে তীর্থস্থানের মর্যাদা হয়ত যোল আনাই রক্ষা পেল কিন্তু এত দুঃখকষ্ট সহ করে এখানে পৌঁছে কতটুকু শান্তি আর আনন্দ লাভ করতাম আমরা, তা কে বলতে পারে। ওই যে ওই ঘেরোটিকে ঘিরে বসে ছেলেমানুষের মত “কুস্তী বহিন, আমার আরও দুটো খেজুর দাও, আমার আরও দুটো আখরোট দাও” বলে হৈ চৈ করছে সকলে, ও না এলে এ সমস্ত ত কিছুই হত না এখানে। বিজ্ঞ লোকে বলবেন—‘যদি ওই সমস্তই চাও তবে অত কষ্ট করে অতবড় মহাতীর্থে কেন গেলে বাপু? লোকের ধারে গেলেই ত পারতে।’ তাঁদের চেয়ে বিজ্ঞ ঝাড়া, ঝাড়া বলেন ‘নারী নরকের দার’, তাঁরা নাক সিটকে বলে উঠবেন, ‘ছি ছি ছি, ওখানে গিয়েও ওই সব ছাংলামো গেল না?’ এঁদের কথা মাথা নিচু করে মেনে না নিয়ে উপায় নেই। কিন্তু এই যে আজ এতগুলি সম্ভানের হাসি চীৎকার আনন্দ উল্লাসে মাঝের স্থানটি গমগম করছে, জগৎ-জননীর কাছেও কি এর কোনও মূল্য নেই? যা কি সত্যই এ কামনা করেন যে তাঁর প্রতিটি ছেলে মেয়ে অবধা জ্ঞানার্জন করে গোমড়ামুখো কাঠগোঁয়ার হয়ে উঠুক, হয়ে জননীর জাতকে হয় ঘৃণা করতে শিখুক, নয় বিলাসের উপকরণ বলে মনে করুক? আমরা আজ আনন্দময়ী মাঝের স্থানে এসেও যদি একবার প্রাণখুলে না হাসতাম, শুধু ‘ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা’ ইত্যাদি বড় বড় তত্ত্ব আলোচনার চুল হেঁড়াছিঁড়ি করে সময়টুকু কাটিয়ে দিতাম, তাহলে কি সত্যই জননী খুশি হতেন?

যা যে কিসে খুশি হন আর কিসে হন না এ এক সমস্যা বটে। সেই ব্যতীতই হিংলাজের আভিনায় শুয়ে বোধ হয় এ মহাসমস্যার একটা সহজ সমাধানও পেয়েছিলাম।

চান্দর মুড়ি দিয়ে সকলেই শুয়ে পড়েছে মার আভিনায়। শেষরাতেও দিকে অঘোরী বাবা বখন আসবেন তখন উঠে জান করে নতুন কাপড় পরে

ব্রাহ্মমূর্ত্তে মায়ের ওহার চুকে হবে। নিশ্চিত হবে সকলে ওয়ে-বলে
আছি। রূপলাল আর সুখলাল ওধারে মায়ের জন্তে ভোগ বীধছে। আমার
পাশে বসে পোপটভাই আর ভৈরবী বকবক করছেন। সবই কানে আসছে।

প্যাটেল জিজ্ঞাসা করলেন, “তাহলে কুন্তী কি আপনার সঙ্গেই থাকবে মা ?
ওকে নিয়ে গিয়ে কোথায় দেবেন আপনারা ?

ভৈরবী বললেন, “ও মা, আমার কাছে থাকবে না ত বাছা বাবে কোথায় ?”

একটু চুপ করে থেকে পোপটভাই বললেন, “কিন্তু আপনি জানেন ত,
মেরেটার জাত গেছে। স্বভাবচরিত্রও ভাল নয়। সেই ছোকরা খিরমল
ওর—”

ভৈরবী তাঁকে ধামিয়ে দিয়ে বললেন—“জানি, সবই জানি বাবা। কিন্তু
সে সমস্ত হাঙ্গামা ত আমার সঙ্গে দেখা হবার আগেই ঘটে গেছে ওর
জীবনে। তার হিসেব নিয়ে আমার মাথা ধামিয়ে লাভ কি। সে হিসেব
মায়েরা রাখে না। তা রাখলে কুন্তী এল কি করে এখানে ? অগৎজননী
সতী মায়ের এই স্থান। সেই মা ত ওর উপর দয়া করলেন। তাঁর দয়ায় ও
শেষ পর্যন্ত এসে পৌঁছল এখানে। এর পরেও কি ওর কোনও পাপ থাকতে
পারে নাকি ? আর, জাতের কথা বলছ বাবা—মায়ের কাছে ছেলেমেয়ের
কিছুতেই জাত যায় না। মায়ের কাছে সন্তানের আবার ভিন্ন ভিন্ন জাত
আছে নাকি ! মায়ের কাছে ছেলেরা হচ্ছে ছেলের জাত আর ছেলের কাছে
মায়েরা হচ্ছে মায়ের জাত। তা কুন্তী ত আমার মা বলেছে। ওর জাত গেলে
আমারও যে জাত থাকে না !”

পোপটভাইএর আরও প্রশ্ন ছিল, “কিন্তু ওর কি কিছু হবে মা ?
দেখবেন আবার ও কারও সঙ্গে একটা কিছু ঘটিয়ে আপনার অপমান করবে।”

শব্দ করে হেসে উঠলেন ভৈরবী। বললেন, “আমার আবার অপমান
করবে কি করে ও বেটী ? কারও সঙ্গে আবার যদি কিছু ঘটায় তাতে আমার
কি ক্ষতি হবে ? ও নিজেই আবার জলে পুড়ে মরবে। যতদিন হেসে খেলে

যেদের মত আনন্দ করে থাকবে আমার কাছে ততদিন আমি ওকে বুক দিয়ে আগলে রাখব। যেদিন ও আমাকে তুলে গিয়ে অন্য কিছু নিয়ে যেতে উঠবে সেদিনও আমি বাধা দেব না। ছেলেমেয়েরা কি চিরকাল মাকে নিয়ে তুলে থাকতে পারে বাবা? তা কখনও সম্ভব নয়। না হয় একটু যা খেয়েছে, তা বলে ওতেই ওর চিরকালের জন্যে সংসারের উপর ঘেরা হয়ে গেছে এতটা আমি আশা করব কেন। পাঁচজনের পাঁচ রকম দেখে ও যদি তখন নিজের ভালমন্দ বুঝে আমার কারও সঙ্গে পা বাড়ায়, তাতে আমার কি ক্ষতি হবে। যে ক’দিন ও আমার কাছে থেকে নিজেকে শান্তি পাবে ততদিন আমিও শান্তি পাব ওকে নিয়ে। তারপর ও কোথাও ভাল ভাবে শান্তিতে আছে এইটুকু জানতে পারলেই আমার শান্তি।”

আরও অনেক কথাবার্তা হল ভৈরবীর সঙ্গে পোপটলালের। কিন্তু আর আমার কানে কিছু ঢুকল না। আমি তখন চাদর চাপা দিয়ে শুয়ে মাকেই বারবার বলতে লাগলাম, “তাই কর মা, তাই কর। আমরা যেন কেউ কাকেও ছোট বা বড় না দেখি। ওই বরিশেলে অজমুখ ভৈরবীর মুখ দিয়ে যা তুমি আজ আমার শোনালে জগৎজোড়া তোমার সবকিছু ছেলেমেয়ে যেন ওইটুকুই মেনে চলে। মায়েরা মায়ের জাত আর ছেলেরা হচ্ছে ছেলের জাত। ছেলেমেয়ে যতদিন মাকে নিয়ে তুলে থাকে ততদিন মায়ের শান্তি। আমার যখন মাকে ছেড়ে অন্য কিছু নিয়ে ছেলেমেয়ে শান্তিতে থাকে তখনও মায়ের শান্তি। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, ছেলেমেয়ের জাত গেলে মায়েরও যে জাত যায়। পাপ পুণ্য, ভাল মন্দ, স্ত্রীর অস্ত্রায়, এই সব বিদগ্ধটে সমস্তার এর চেয়ে সহজ সরল সমাধান আর কোথায় খুঁজে পাওয়া বাবে!

মায় অঙ্ককার।

রাত্রির শেষ গ্রহণ। বরনার জল ঘটি করে মাথায় ঢেলে স্নান করে

নতুন কাপড় পরে অনেকগুলো খাপ উঠে আসরা শুহার মধ্যে গিয়ে দাঁড়াল। শুহার একেবারে শেষ সীমায় যা হিংলাজের বেদী। অনেক উচুতে ছাত। একটিমাত্র প্রদীপ জলছে বেদীর উপর। তাতে ছাতের নীচে আর বেদীর চারপাশে অন্ধকার জমাট বেঁধে রয়েছে। প্রদীপের আলোর দেখা যাচ্ছে লাল সালুতে মোড়া বেদী। মেওয়া মিহরি নারকেল সাজানো হয়েছে বেদীর উপর। মাঝখানে বসানো হয়েছে ষি আটা চিনি আর মেওয়া দিয়ে বানানো মস্ত বড় লোন্টটা। অনেকগুলো রক্তকরবী ফুল ছিটিয়ে দেওয়া হয়েছে চার পাশে। গুলমহম্মদের খুশ-বাতিগুলোও জালিয়ে দেওয়া হয়েছে। মোমবাতি-গুলোও বসানো হয়েছে বেদীর চতুর্দিকে, এখনও জালিয়ে দেওয়া হয় নি। রূপলাল আর সুখলাল তখনও কি করছে বেদীর পাশে দাঁড়িয়ে।

আসরা বেদীর সামনে জোড়হাতে ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে আছি। বার বার নজর করে দেখবার চেষ্টা করছি কি আছে বেদীর ওধারে। আরও কতদূর যাওয়া যায় ঐ অন্ধকারের মধ্যে? বেদীর পিছনের ঐ অন্ধকারের মধ্যেই কি জ্যোতির্দর্শন হবে? চোখের পলক পড়ছে না, রক্ত নিখালে চেরে আছি—কখন জ্যোতির্দর্শন হবে!

অনেকক্ষণ ঐ ভাবে কাটল। হঠাৎ কানে গেল, “বাচ্চা, এখন সময় হয়েছে।”

শরীরের ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎ খেলে গেল। কে বললে ও কথা? কিসের সময় হয়েছে? কি হবে এবার?

বেদীর উপর থেকে রূপলাল প্রদীপটা তুলে নিলে। প্রদীপ হাতে আশানের সামনে দিয়ে বা দিকে ঝানকটা এগিয়ে গেল। এবার কানে এল রূপলালের গলার স্বর—

“প্রথমে আহ্নন স্বামীজি মহারাজ। আপনি এই দলের মোহন। আপনাকেই সর্বপ্রথম যেতে হবে মায়ের শুহার মধ্যে।”

এগিয়ে গেলাম রূপলালের কাছে। ভৈরবীও এলে পাশে দাঁড়ালেন।

হাতের প্রদীপটা রূপলাল নিচু করে ধরলে। তখন চোখে পড়ল প্রদীপের পিছনে দেওয়ালের গায়ে একটি ছোট গহ্বর।

সেই গহ্বরের মুখে প্রদীপ ধরে রূপলাল বললে—“এই হচ্ছে মা হিংলাজের গুহা। হামাগুড়ি দিয়ে যেতে হবে এই গুহার মধ্যে। এই গুহার এখানে একটা মুখ, আর একটা মুখ বেদীর ওপাশে। এই গুহার উপরেই বেদী, মায়ের আসন। কোনও ভয় নেই, সাবধানে আস্তে আস্তে যাবেন। মাথাঘষে ঘন পাথরের ঘা না লাগে। বান, চুকুন এবার।”

প্রদীপটা আরও একটু নামিয়ে ধরলে রূপলাল।

সেই অন্ধকার গুহার মধ্যে একবার চাইলাম। পিছন ফিরে একবার ভৈরবীর মুখের দিকেও চাইলাম। অন্ধকারে তাঁর মুখ দেখা গেল না। প্রদীপ-শিখাটার দিকে চেয়ে রইলাম। আবার কানে এল রূপলালের গলা—

“বান, চলে বান এবার। মাকে দর্শন করে আসুন।”

‘মাকে দর্শন করে আসুন’ কথাটা শুনে সর্বশরীরের ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎ ছুটে গেল। চোখের সামনে ভেসে উঠল মায়ের মুখখানি। সেই আধ হাত চওড়া লাল পাড় শাড়ির ঘোমটা, কপালে ডগডগে সিন্দূরের ফোঁটা, একমুখ পানদোস্তা স্বচ্ছ আমার মায়ের মুখের সেই হাসি, আমার মায়ের সেই চোখের দৃষ্টি। আমার দিকে চেয়ে মা হাসছেন।

বলে পড়লাম হাঁটু গেড়ে গুহার মুখে। এক মুহূর্ত ইতস্তত না করে হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে পড়লাম।

বোধ হয় পাঁচ মিনিটও নয়। হঠাৎ বেরিয়ে এলাম বেদীর এপাশে। প্রদীপ হাতে রূপলাল এখানে এসে দাঁড়িয়েছে। আমার সে হাত ধরে টেনে তুলে দাঁড় করালে। লম্বা একটা নিখাস টেনে নিলাম বৃকের মধ্যে। কানে এল—“মা কিছু দেখতে পেয়েছিল গুহার মধ্যে, জীবনে কখনো তা প্রকাশ করিস নি কারও কাছে। সাবধান ব্যাটা, কখনও মায়ের এ আদেশ ভুলবি না।”

আবার চমকে উঠলাম। কে বললে এ কথা? এবার কিন্তু ভুল হল না। অন্ধকারের মধ্যে নজর করে দেখতে পেলাম আমার হু হাত দূরেই বেদীর পাশে গুহার দেওয়ালে ঠেস দিয়ে অঘোরী বাবা মালা হাতে দাঁড়িয়ে আছেন। কালো আলখাল্লায় তাঁর সর্বাঙ্গ ঢাকা। সাদা চুলদাড়ির জন্তে তাঁকে চেনা গেল।

রূপলাল বললে, “এবার স্পর্শ করুন মায়ের বেদী। আপনার মালা হুগাছা মায়ের বেদীর উপর দিন।”

হু হাতে মায়ের বেদী স্পর্শ করলাম। মালা আমার নেই। সন্ন্যাসীর কিছুই থাকতে নেই যে। বেদীর উপর মাথা ঠেকিয়ে পিছিয়ে এলাম।

প্রদীপ হাতে আবার ওপাশে চলে গেল রূপলাল। এবার ভৈরবীর পালা। পাঁচ মিনিট পরে ভৈরবীও বেরিয়ে এলেন এ পাশের মুখ দিয়ে। হু ছড়া মালা রাখলেন বেদীর উপর। তার একছড়া তুলে নিয়ে রূপলাল ভৈরবীর হাতে দিলে। বললে, “গলায় দিন মালা। এ মালা যতদিন গলায় থাকবে ততদিন মা হিংলাজের দরায় কোনও বিপদ-আপদ হবে না। মায়ের দরায় সমস্ত আশা পূর্ণ হবে।”

মালা গলায় দিয়ে কি জানি কেন ভৈরবী আমার পারে একটা প্রণাম করলেন।

রূপলালের গলা শোনা গেল, “কুস্তী বহিন, এস এবার।” তারপর একে একে সকলের নাম ডাকা হতে লাগল। দাঁড়িয়ে আছি প্রদীপশিখার দিকে চেয়ে। চেয়ে থাকতে থাকতে একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটল। প্রদীপ-শিখাটা আমার মধ্যে জলতে আরম্ভ করল। আরও কিছুক্ষণ পরে আমি নিজেই সেই শিখার সঙ্গে মিলিয়ে গেলাম। এখন আর কিছুই নেই, শুধু সেই শিখাটি। স্থির অচঞ্চল এক আড়ুল উঁচু সেই শিখা। ক্রমে সেই শিখার তেজ বাড়তে লাগল, বাড়তে বাড়তে তার উজ্জলতা এমন ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল যে, আর তার দিকে চেয়েই থাকা যায় না। টপ করে চোখ বুজে ফেললাম।

এবং এ জীবনের সবচেয়ে মারাত্মক ভুল করা হল সেই চোখ বুজে ফেলা।
তৎক্ষণাৎ আমি আর প্রদীপশিখা আলাদা হয়ে গেলাম। সব শেষ হয়ে গেল।
আবার বেখানকার মানুষ সেখানেই ফিরে এলাম।

ছড়িওয়ালা রূপলাল তখন বলছে, “এবার যান আপনারা, নিজের নিজের
ঝোলা কাঁধে নিয়ে দাঁড়ান বাইরে গিয়ে। কোনও জিনিস যেন পড়ে না
থাকে। সূর্যদেব উদয় হচ্ছেন। হিংলাজের মোহন্ত মহাবাজ এবার আপনারাদের
এই ভীষণের সর্বশেষ দর্শন যেটি সেটি করাবেন। সঙ্গে সঙ্গে আপনারা হিংলাজের
দিকে পিছন ফিরে ফেরা পার হলে ওপারে চলে যাবেন। সাবধান, কেউ
তুলেও মায়ের স্থানের দিকে আর ফিরে চাইবেন না—”

আর একবার শেষবারের মত হিংলাজের বেদীর দিকে চাইলাম। কিছুই
নেই আর সেখানে। শুধু লাল সালুর উপর রক্তকরবী ফুলগুলি ছড়ানো
রয়েছে। প্রদীপটিও নেই, তার বদলে বেদীর চতুর্দিকে জলে উঠেছে অনেক-
গুলো মোমবাতি। মোমবাতির আলোর বেশ স্পষ্ট দেখা গেল সব কিছু।
বেদীর উপর ত্রিশূল পোতা রয়েছে, ত্রিশূলের পিছনেই পাথর। ঐ পাথর
আর পাথর আর পাথর,—এবড়ো-খেবড়ো পাথরের চাকড়, কর্ণ বীভৎস।
একেবারে উঠে গেছে ছাত পর্বত। মোমবাতির আলোর সবই স্পষ্ট দেখা
গেল। আর কোনও রকমের ভুল ধারণা করবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নেই।
আর কিছুই আশা করবার নেই এখানে। এবার অলজ্যাস্ত নভার অগতে ফিরে
এলাম। যা হিংলাজের গুহার উপর ঐ বেদী। যা হিংলাজের গুহা কিন্তু
চিরঅন্ধকারময়। সেই অন্ধকার অগতে আর ফিরে যাওয়া বাবে না। একটা
দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বেদীর উপর কপাল ঠেকিয়ে বেরিয়ে এলাম। তারপর
খাপগুলোর উপর দিবে নেমে এলাম আড়িনার এবং ফেলে রেখে যাওয়া ঝোলা-
ঝুলি আবার কাঁধে তুলে নিলাম।

“এবার সকলে চোখ তুলে চেয়ে দেখ এই পাহাড়ের চূড়ার,” বললেন
অধোরী বাবা। বাবা বেরিয়ে এসে দাঁড়িয়েছেন খাপগুলোর মাঝার গুহার

সামনে। হালাতুহ হাতটি উঠিয়ে আবার বললেন তিনি, “ঐ উপর দিকে চেয়ে দেখ। কি দেখছ?”

আলো এসে পড়েছে পাহাড়ের মাথার। আকাশের দিকে মুখ তুলে চেয়ে দেখছি একখানা প্রকাণ্ড পাথর। পাথরখানা বেশ ঝানিকটা বেরিয়ে এসেছে পাহাড়ের গা থেকে।

“দেখছ সকলে—ভাল করে চেয়ে দেখ ঐ পাথরের গায়ে কি আঁকা আছে। ওখানে পাহাড়ের গায়ে আঁকা আছে চন্দ্র আর সূর্য। ভগবান রামচন্দ্র একে দিয়ে গেছেন নিজ হাতে। তিনি যে এখানে এসেছিলেন তার চিহ্ন রেখে গেছেন পাহাড়ের গায়ে চন্দ্র সূর্য একে দিয়ে। ভেবে দেখ, কি করে ঐ অসম্ভব সম্ভব হল—কি করে ঐ অত উচুতে পাথর কেটে চন্দ্রসূর্য আঁকলেন তিনি। এ কি অদ্ভুত কারও দ্বারা সম্ভব? ঐ অসম্ভব কাজ একমাত্র ভগবান রামচন্দ্রের দ্বারাই সম্ভব হয়েছিল। এই পৃথিবীতে যতকাল চন্দ্রসূর্য থাকবে ততকাল এই হিংলাজ পাহাড়ের চূড়ার আঁকা ঐ চন্দ্রসূর্যও থাকবে। আর মানুষ এখানে এসে চান্দ্র প্রমাণ পাবে যে একসময় ভগবান শ্রীরামচন্দ্রও এই তীর্থ দর্শন করতে এসেছিলেন। রাক্ষস রাবণ ছিল ব্রাহ্মণসন্তান। রাবণ বধ করে রামচন্দ্রের ব্রহ্মহত্যার পাপ হয়েছিল। সেই পাপ থেকে তিনি মুক্তি লাভ করেন এখানে জ্যোতির্দর্শন করে।”

অঘোরী বাবা খামলেন। আমরা আকাশের দিকে মুখ তুলে চেয়ে বইলাম পাহাড়ের কপালের উপর। হাঁ, আছেই ত। গোল দুটো কি যেন আঁকা রয়েছে সেখানে। আলো এসে পড়েছে তার উপর। লাল হয়ে উঠেছে সেখানটা। ভগবান রামচন্দ্রের আঁকা চন্দ্রসূর্যের গা থেকে ছটা বেরিয়েছে। সত্যই ভেবে পাওয়া যায় না ওখানে তিনি পৌছিলেনই বা কি করে, আর পাহাড়ের গায়ে ছেনি দিয়ে হাতুড়ি ঠুকে ও-কাজ করলেনই বা কিসের উপর দাঁড়িয়ে। সবই সম্ভব, ভগবানের দ্বারা সবই সম্ভব। হুঁচের মতো হাত্তি চালানো যখন সম্ভব তখন কি না সম্ভব তাঁর দ্বারা। শুধু মানুষের বুদ্ধিবিশেষনা-

ভুলোকে একটু তৌতা করে নেওয়া চাই। তা' হলেই হল। 'বিবাহে বিলার বস, তর্কে বহু'।'

অখোঁরী বাবা বলতে লাগলেন আর সকলে সম্মুখে আঙড়াতে লাগল এক লম্বা ফিরিঙ্গি—আমি অমূকের ছেলে অমূকের নাতি,—আমি হাব নদীর ধারে সন্ন্যাস নিয়ে তবে হিংলাজ-দর্শনে যাত্রা করেছি। সে সন্ন্যাস আমি এখনও রক্ষা করছি। আমি গুরুশিষ্যের মানে জল দিয়েছি, চন্দ্রকূপে গিয়ে বাবার আদেশ নিয়েছি। আরও কত কি করেছি সে সব বলে শেষ করে তারপর হিংলাজের শুভায় ঢুকে মাকে দর্শন করেছি। স্মৃতরাং আমার বাবজীর জ্ঞাত আর অজ্ঞাত পাপ, সেই পাপেদের আর একগ্রন্থ লম্বা কর্দ বলে তারপর বলতে হবে জন্ম-জন্মান্তরের পাপের কথা—সেই সমস্ত পাপ বিলকুল ধুয়ে মুছে লাক হয়ে গেল মাতৃদর্শনের কলে।

অখোঁরী বাবা মালাত্মক তান হাত তুলে আশীর্বাদ করলেন, “তোমাদের জন্ম হোক। বাও, এবার বাড়ি ফিরে বাও।”

তিনবার জয়ধ্বনি দিয়ে আমরা পিছন ফিরলাম। রক্তকরবীর ঝাড়ের মাঝখানের সরু পথ দিয়ে বেরিয়ে এসে ছোট করনাটি পা টিপে টিপে সাবধানে পার হলাম।

মনটা ভয়ানক ভার হয়ে উঠল। কেন? এ ‘কেন’র উত্তর দেওয়া সহজ নয়। সব ‘কেন’র উত্তর খুঁজে গেলে ছুনিয়ার সবকিছুর মূল্যও ক’মে এই এতটুকু হয়ে যেত।

হিংলাজ দর্শন করলে আকাশগঙ্গাও দর্শন করতে হয়। করনার এ পারে এসে আবার আমরা কাঁধে বুলি নামালাম। রূপলাল কপালে সিঙ্গুর দিয়ে হাতে হিংলাজের প্রসাদ দিলে সকলের—মেওয়া মিছরি নারকেল লোটের টুকরো। এবার চল সকলে আকাশগঙ্গার। এই শাহাড় ভেঙে উঠতে হবে। এই শাহাড়ের বাধার আকাশগঙ্গা। সেই আকাশগঙ্গার কন্ঠ

নেমে আসছে কখনো দিবে। আকাশগঙ্গাও মহাভীর্ণ। আকাশগঙ্গার ধারে আছে একরকমের গাছ, যার ডাল নিয়ে আসতে হবে। সে জিনিস চক্ষুরোগের মহামূল্যবান ঔষধ। আকাশগঙ্গার জল দিয়ে সেই ডাল ঘষে চোখে অন্ধন দিলে কানাও দৃষ্টিশক্তি ফিরে পায়।

তা পাক। কানাদের দৃষ্টিশক্তি কেবাবার জন্মে আবার এখন জন্মের ভিতর দিয়ে এই পাহাড়ের মাথায় চড়বার শক্তিসামর্থ্য নেই ভৈরবীর। আকাশগঙ্গার জল নেবার মত কিছু নেইও আমাদের সঙ্গে। খামকা আর কষ্ট না করে ভৈরবী এখানে বসেই একটু বিশ্রাম করবেন, বডকণ না আমরা আকাশগঙ্গা থেকে ফিরে আসি।

রূপলাল বললে, “আমরা ত আর এখার দিয়ে ফিরব না। আকাশগঙ্গা থেকে আর একটা পথ আছে অঘোর নদী পর্বত। সেই পথেই আমরা নেমে যাব।”

কুন্তী বললে, “ঠিক হায়। আমরাও একটু আয়াম করে নিয়ে চলে বাজি নদীতে। আমরা নদী পর্বত বেতে পারব, এ পথ ত সোজা চলে গেছে নদীতে। কোনও কষ্ট হবে না আমাদের।”

হুতরাং আরিও বললেন, “তবে সেই ডাল। বাও তোমরা আকাশগঙ্গার। আমরা নদীর পাড়ে গিয়ে তোমাদের জন্তে অপেক্ষা করব।”

রূপলাল বললে, “উহ—অপেক্ষা করবেন কেন আমাদের জন্তে। আপনারা যেখানে নদী পার হবেন আমরা ত সেখানে পার হব না, তার অনেক উপরে নদী পার হব। আপনারা নদী পার হয়ে অঘোরী বাবার স্থানে চলে আসবেন। আপনারা যেখানে পার হবেন নদী, সেখান থেকে নদীর উপর দিকে খানিকটা গেলেই অঘোরী বাবার স্থান। অঘোরী বাবার স্থানে আমরা আপনারদের জন্তে বসে থাকব।”

তখন ভৈরবী বাবির সাবধান করলেন, হুতলাল যেন কোথাও আছাড়-টাছাড় না খায়। রূপলাল, পোশটতাই আমাদের সাবধান করলেন, সাবধানে

যেন আমরা যাই, নদীটা যেন সাবধানে পার হই, আর বেশি দেরি যেন না করি।

জুয়া আর একবার জয়ধ্বনি দিয়ে জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। আমরাও একটু পরে উঠে পড়লাম। ভাড়াভাড়ি নদী পার হয়ে মাঝের প্রসাদ খাওয়া যাবে।

আবার সেই বন্ধুপুরীর ভিতর ঘুরতে আরম্ভ করলাম। কিন্তু এবার আর তত ভয়ঙ্কর যেন হল না হু পাশের পাহাড়ের দৃশ্য। পথও চট করে ফুরিয়ে গেল। সামনেই অঘোর নদী। এ ঠিক সেই জায়গা যেখানে আমরা আগবার সন্ধ্যা নদী পার হয়েছিলাম।

এবার একটা মতলব ঠাওরানো হল যাতে কুস্তীকে আর নাকানি-চোবানি খেয়ে জল গিলতে না হয়। কুস্তী আমাদের মাঝখানে হু'জনের কাঁধ ধরে ঝুলে থাকবে—সেই অবস্থায় তাকে নিয়ে আমরা নদী পার হয়ে যাব। তাই হল, হুশ্রম্বেলে নদী পার হওয়া গেল। শুধু নদীর মাঝখানে আমাদের হু'জনের কাঁধে ঝুলতে ঝুলতে কুস্তী ব্যয়কতক চিল-চোঁচালে।

নদীর এপাড়ে উঠেও জল খাওয়া হল না। নদীর জলও খুব ঘোলা। ঠিক হল অঘোরী বাবার আশ্রমে পৌঁছে জল খাওয়া হবে, অঘোরী বাবার আশ্রমে নিশ্চয়ই পরিষ্কার জল মিলবে। তখন চলতে আরম্ভ করলাম নদীর উত্তান দিকে। আকাশের দিকে চেয়ে দেখলাম সূর্য পোরাটাক পথ এগিয়ে এসেছেন।

চলছি ত চলছিই। বাববার ডান দিকে ঘাড় ফিরিয়ে দেখছি। কই, কোথাও কিছু নেই! বাবির পাড় ক্রমশ উচু হয়ে উঠতে লাগল। তখন বাধ্য হয়ে আমরা সেই উচু পাড়ের উপর উঠলাম। নদীর জল অনেক নীচে রয়েছে গেল।

সেই উচু বাবির পাহাড়ের মাথার খাড়িরে চতুর্দিকে নজর করে দেখলাম।

কই, কোথাও কিছুই দেখা যায় না বে! অঘোরী বাবার আশ্রম কি তাহলে পিছনে কেলে এলাম? হঠাৎ ভৈরবী টেচিয়ে উঠলেন—“ঐ বে ঐ—ঐ দেখা যাচ্ছে কালো মত।” নজর করে দেখলাম—ঠিকই, একটা বালির টিলার পাশ দিয়ে কালো মত কি উচু হয়ে রয়েছে। নিশ্চয়ই অঘোরী বাবার আশ্রমের চাল। চললাম সেই দিকে এগিয়ে। তখন নদীর জলও চোখের আড়ালে চলে গেল।

তারপর অনেকক্ষণ ধরে চলতে লাগলাম, সেই কালো মত বা দেখেছিলাম তার দিকে। একবার একটা বালির টিলার মাথায় উঠি আবার নেমে বাই। আবার লায়নের টিলাটার মাথায় উঠি।

বারবার মনে হতে লাগল, ঐ ত দেখা যাচ্ছে অঘোরী বাবার আশ্রমের ছাদ, সামনের ঐ বালির টিলাটা পার হলেই হয়। শেষে একসময় খেরাল হল—তাইত, নদীর কাছ থেকে এতদূরে কি অঘোরী বাবার আশ্রম? ঐ বুড়ো মাহুদ, এতদূর থেকে নদীতে যান! এতদূর থেকে মা হিংলাজের স্থানে যাওয়া-আসা করেন! এ কখনই সম্ভব নয়, আমরা অনর্থক তুল জায়গার ঘুরে মরছি।

কথাটা বললাম ওদের। ভৈরবীর মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে উঠল, কুস্তীর চোখে ফুটে উঠল জ্বাশ। এই প্রথম বার কুস্তী বললে, “জল খাব।”

মাথার উপর চেয়ে দেখলাম সূর্যসেব অনেকটা পথ পার হয়েছেন। ভৈরবী তাঁর শুকনো ঠোঁট একবার জিব দিয়ে চাটলেন। বললেন—“সেই ভাল, চলুন নদীর ধারেই কিরে বাই। নিশ্চয়ই আমরা কেলে চলে এসেছি অঘোরী বাবার আশ্রম। নদীর ধারে গিয়ে খুঁজলেই পাওয়া যাবে।”

কিরে চললাম আবার। আবার সেই একবার একটা বালির ঢেউএর মাথায় চড়া আবার নামা, আবার চড়া। কিরছি ত কিরছিই। যতবার উঠছি একটা ঢেউএর মাথায় ততবার নজর করে দেখছি নদী দেখা যায় কি না।

না, দেখা যাচ্ছে না নদী। কিন্তু নিশ্চয়ই দেখা যাবে এই সামনের ঢেউটার মাথায় চড়লে। মনে হোর এনে আবার পা চালাচ্ছি। আবার প্রাণপণ উঠছি সামনের টিলাটার মাথায়। কপালের উপর হাত রেখে বোদটাকে আড়াল করে দেখছি—কই, কোথায় নদী? শুধু ধু ধু করছে বালি আর বালি। আনিগন্ত খাঁ খাঁ করছে। হঠাৎ খেয়াল হল হিংলাজ পাহাড়ের কথা। নদীর এ-পাড় থেকে ত ও-পাড়ের পাহাড়টাকে দেখতে পাওয়া যায়। তাইনে বায়ে, সামনে পিছনে কোনও দিকে কোথাও পাহাড়ের চিহ্নমাত্র নেই। ভৈরবীর মুখের দিকে একবার চাইলাম, কুন্তীর মুখের দিকেও। ওরা কত নিখালে প্রতীক্ষা করছে আমার মুখ থেকে কিছু শোনবার জন্তে। কিন্তু কি বলব আমি, বলবার আছে কি! কোনও কথা জোগাল না মুখে। একটা ঢৌক গিলতে গেলাম। ঢৌক গিলব কি, গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে।

মাথার উপর অগ্নিবৃষ্টি হচ্ছে। চোখেও কাপসা দেখছি, পারের ডলা গুড়ে যাচ্ছে। আবার একবার ওদের মুখের দিকে চেয়ে দেখলাম। কুন্তী কেমন যেন অদ্ভুত ভাবে চেয়ে আছে আমার দিকে। ভৈরবী চোখ বুজে কেলেন। বা হয়েছে তা আর মুখ ফুটে বলতে হল না। তিনজনেই তিনজনের বুকের ভিতর কি হচ্ছে স্পষ্ট বুঝতে পারছি। দ্বিতীয়বার কুন্তী উচ্চারণ করলে, “জল খাব।”

চোখ চেয়ে ভৈরবী বললেন, “জল কোথায়?” বলে রক্তবর্ণ চোখে আমার দিকে ক্যাল ক্যাল করে চেয়ে রইলেন।

সজোরে নিজের মাথায় একটা ঝাঁকানি দিলাম। চোখের দৃষ্টি একটু পরিষ্কার হল। ছ’হাতে ওদের দুজনের হাত ধরে টান দিলাম। “চল—এগিয়ে চল আমার সঙ্গে। সামনেই নদী, নদীর ধারে না গেলে জল পাবে কোথায়।”

কুন্তীর চোখ ঝোলাটে হয়ে গেছে। সে তৃতীয়বার উচ্চারণ করলে, “জল খাব।”

চললাম আবার ওদের দুজনকে টেনে নিয়ে।

যাচ্ছি, কোথায় যাচ্ছি তা নিজেও জানি না। কেন যাচ্ছি তাও জানি না। তবু যাচ্ছি, কারণ না গিয়ে করবই বা কি। যতক্ষণ শক্তিতে কুলোর থাকে। যেতে যেতে একসময় নিশ্চয়ই এই বালি শেষ হয়ে যাবে। কোথাও না কোথাও নিশ্চয়ই এর শেষ আছে। সেইখান পর্যন্ত পৌঁছতে হবে। তিনজনেই মুখ বুজে যাচ্ছি, ওরা হাত ছাড়াবার জন্তে জোর করছে না। মাঝে মাঝে শুধু ওদের হাতে টান দিতে হচ্ছে। যখন টান মিচ্ছি তখন ওরা চোখ খুলে আমার মুখের দিকে চেয়ে দেখছে। দেখে আবার চোখ বন্ধ করে হাঁটছে। কোনও আপত্তি নেই। আমি যেখানে নিরে যাব সেখানেই যাবে—কিন্তু আমি এদের কোথায় টেনে নিয়ে চলেছি!

ওদের হাত ছেড়ে দিলাম। ওরাও দাঁড়িয়ে পড়ল। চতুর্থবার কুন্তী বললে, “জল খাব।” কিন্তু এবার আর চোখ চেয়ে বললে না। কি রকম বেন জড়িয়ে গেল তার কথা।

তৈরবী চোখ চাইলেন। চতুর্দিকে নজর করে কি দেখতে লাগলেন। তারপর একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে চোখ বুজে ফেললেন।

একটা ঢৌক গেলবার চেষ্টা করলাম। নোনতা বিব্বাদ লাগল গলার মধ্যে। তবু গলার ভিতরটা একটু ভিজল। তখন বললাম তৈরবীকে—“কি, হয়েছে কি আমাদের বে এই মধ্য আমরা জল জল করে এলিয়ে পড়েছি! শিবরাত্রির উপোস করে চব্বিশ ঘণ্টা জল না খেয়ে কাটাই। মহাষ্টমীর দিন কোনও কোনও বার তোর হয়ে বার জল খেতে। আর কাল অর্ধেক রাতে জল খেয়েছি, এখনও অর্ধেক দিন পার হল না, এর মধ্যে জল জল করে মরে যাচ্ছি! কেন, হয়েছে কি আমাদের?”

বাঙলা কথা কুন্তী বুঝলে না। তবে কাজ হল। তার চোখের ঘোর কেটে গেল। তৈরবীও একটু চাফা হয়ে উঠলেন। বললেন—“তবে কোথাও একটু বলা থাক না। মিছিমিছি ঘুরে মরছি কেন রোদের মধ্যে। রোদ কমলে আবার তখন হাঁটা যাবে।”

কুন্তী জিজ্ঞাসা করলে, “কি হয়েছে ?”

বললাম, “কিছুই হয় নি। এই রোদের মধ্যে অনর্থক ঘুরে ঘুরে আরও তেঁটী বেড়ে যাচ্ছে। চল কোথাও একটু বসি। রোদ পড়ুক, তখন খুঁজে দেখা যাবে কোথায় নদী।”

কুন্তী আর কিছু বললে না। তখন চললাম আবার তিনজনে, যদি কোথাও একটু ছায়া পাওয়া যায় এই আশায়।

কোথায় ছায়া। একটি গাছপালা কোথাও নেই। তবু চলেছি। মনে হচ্ছে আর খানিকটা এগোলেই হঠাৎ চোখে পড়বে নদী; তার তীর করে বয়ে যাচ্ছে জল, নদীর নাম অঘোর। আবার একবার নজর করে দেখলাম, কোনও দিকে পাহাড় দেখা যাচ্ছে না ত? পাহাড় দেখা গেলেই নদী পাওয়া যাবে। নদী বয়ে যাচ্ছে পাহাড়ের কোল দিয়ে। কোথায় পাহাড়, শুধু বালি আর রোদ, রোদ আর বালি। মাথার উপর থেকে মার্ত্তণ্ডদেব কিছুতেই নড়ছেন না।

তবুও চলেছি। অস্তির চেষ্টায় দাঁতে দাঁত দিয়ে চলেছি। আবার ওদের ছ’জনের হাত ধরে টেনে নিয়ে চলেছি। একবার বসে পড়লে যদি আর উঠতে না পারি। যতক্ষণ চলব ততক্ষণ একটা না একটা কিছু ঘটবার আশা আছে, কোথাও না কোথাও পৌঁছবই শেষ পর্যন্ত। কিন্তু বসে পড়া মানে, একেবারে সব শেষ। আর কিছুই আশা করবার থাকবে না। বসে পড়লে আন্তে আন্তে বেথানে গিয়ে পৌঁছব সেখান থেকে আর কিরে আসা যায় না।

একটা টিলা থেকে নামলাম। নামনেই আর একটা টিলা। আরগাটা গর্তের মত। ছায়া আছে, ভৈরবী জোর করে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে সেখানে বসে পড়লেন।

“নাঃ আর একপাও যাব না। অনর্থক ঘুরে মরবার কোনও মানে নেই। যতক্ষণ সূর্যাস্ত না হচ্ছে এখানেই পড়ে থাকব।”

কুন্তীর হাত ছেড়ে দিলাম। সেও বসে পড়ল। তখন ওদের দিকে

চেয়ে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে কাঁধের ঝোলাটা নামিয়ে আমিও বসে পড়লাম ওদের পাশে।...

এইখানে হিংলাজ-কাহিনী বলা সমাপ্ত হল। সেদিন সেই বালির গর্তে বসে পড়বার পরে মরুতীর্থ সবচেয়ে আর কিছুই বলার রইল না। এর পর যা হ'ল, ঘটেছিল তার সঙ্গে মহাতীর্থ হিংলাজের কিছুমাত্র সম্পর্ক নেই, তা ওছিরে বলার শক্তিও আমার নেই। প্রবৃতি হয় না তার পরের ঘটনাগুলো মনে করবার। এখনও প্রাণপণে চেষ্টা করছি যদি কোনও রকমে তুলতে পারি, একেবারে ঘুছে ফেলতে পারি মন থেকে যা কিছু ঘটেছিল তারপর। কিন্তু তা হবার উপায় নেই।

আজ উঠতে বসতে শত সহস্রবার নিজেকে নিজে খিৎকার দিচ্ছি সেদিন সেই বালির গর্তে বসে পড়েছিলাম বলে। তারও আগে হিংলাজের গুহা থেকে বেরিয়ে রূপলালের সঙ্গে আকাশগঙ্গার বেতে চান নি বলে ভৈরবী এখনও লুকিয়ে নিজের কপাল নিজে ঠোকেন। এই যে চোখ দুটো কপালের উপর জল জল করে জলছে সেই চোখ দুটোই সেদিন চরম বেইমানি করেছিল। 'ঐ অদোদী বাবার আশ্রয়ের ঢাল দেখা যাচ্ছে' এই বলে জলের কাছ থেকে, নদীর ধার ছেড়ে, মিথ্যে মরীচিকার পিছনে ছুটেছিলাম এই চোখ দুটোর বেইমানির জন্তেই। বাজারে গিয়ে যখন চোখে পড়ে থরে থরে ডাব লাঙ্গানো রয়েছে, তার পাশে রয়েছে লাল টকটকে শুকনুজ আনারস পেঁপে লেবু আম, তখন চোখ দুটো জ্বালা করে ওঠে। বরক আর লরবতের দোকানের সামনে গিয়ে হাঁটতে চাই না। ও-সব এখন আমার ছু চোখের বিব। কেবল-মাত্র একবার একটু ভাতের সঙ্গে ভিন্ন লারা দিনমাতে ভেটোর ছাতি ফেটে গেলেও ভৈরবী এক কৌটা জল বুখে হোয়ান না। বন্ধুবান্ধব আশ্রয়ন কারও বাড়ি গেলে যখন শুনি "একটু জল খাও", তখন কেন যে চরকে উঠি তা বলতে পারি না। আশ্রয়-প্রাপ্তি যখন আকাশ ভেঙে নামে তখন গভীর রাতে

বিহানার শুয়ে জল পড়ার শব্দ শুনে শুনে কেন যে পোড়া চোখ দুটোর জলে বালিস ভিজতে থাকে, তার সঠিক কোনও অর্থ খুঁজে পাই না।

এখন যেদিকে তাকাই সেদিকেই জল। কলে-কুলে, আকাশে-বাতাসে লোকের চোখে-মুখে সর্বত্র জল। কিছুই শুকনো নয়। সবই সরস, সবই সজীব। দুনিয়ায় এত জল—কিন্তু সেদিন এই পোড়া চোখ দুটোর বেইমানির জন্তে এক ফোটা জল কোথাও মিলল না।

জল।

অতি ভুচ্ছ জিনিস। সকাল হবার আগেই পাইপ লাগিয়ে কট কট কটাল শব্দে রাস্তার ঢালতে থাকে, রাজপথ ধোয়া হয়। ঘুম থেকে উঠে কুলকুচো করতে লাগে দু'ঘটি, সারাদিনে পারে ঢালতে হয় দশঘটি, রান করতে কত ঘটি রাখার ঢালি তার কি হিসেব আছে। সেদিন যখন সূর্যদেব শেষ পর্বন্ত সত্যই অস্ত গেলেন তখন আবার আমরা নিভেদের টেনে তুললাম, আবার চললাম জলের খোঁজে, আবার শুয়ে পড়লাম বালির উপর। তারপর ধমকানি খোণামুনি গালাগালি এই সমস্ত করে আবার উঠে দাঁড়লাম সকলে, আবার খানিক ছোট্টাছুটি করে পড়লাম একজায়গায়। কি করে যে সারারাত কাটল, কে কাকে কি বললাম, সে কাহিনী মনের মধ্যে শুছিরে রাখবার মত কি অবস্থা ছিল তখন, না তার সরস বিবরণ দেওয়া সম্ভব। সে রাতের চরম কথাটি হচ্ছে এই যে, বতকণ উঠে দাঁড়াবার সাক্ষ্যটুকু ছিল শরীরে ততকণ ছোট্টাছুটি করে কাটল সেই বালির সমুদ্রে। তারপর শেষবারের মত শুয়ে পড়লাম তিন জনেই। তখন আমাদের অস্তিত্ব অবস্থাটুকু দেখে আমোদ পাবার জন্তে সূর্যদেব কিরে এলেন আকাশের গার।

তার পরের ঘটনাটুকু অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। মনে আছে, কুতী চলে যাচ্ছিল বলে তাকে চুল ধরে টেনে এনে কেনেছিলাম। একবার তৈরবীর চোখে দু ফোটা জলও দেখেছিলাম। আর একবার খাড়া হয়ে বলে বন্ধন খাড়া দিয়েও

ওদের ছজনকে আগাতে পারলাম না তখন তিনটে বোনার সমস্ত জিনিসপত্র
ঢেলে কি ঘেন খুঁজেছিলাম। তারপর ভৈরবীর আর কুস্তীর মুখ তাদের আঁচল
দিয়ে ঢেকে দিয়েছিলাম। তিনটে বুলির সব জিনিসপত্র বসে বসে চতুর্দিকে
ছুঁড়েছিলাম। নিজেও শুয়ে পড়েছিলাম তারপর শুণ্ড বালির উপর মুখ শুঁজবে।
ব্যস—আর কিছু মনে নেই।

তলিয়ে যেতে লাগলাম। সে কি অন্ধকার! নেমে যাচ্ছি সেই আধারের
মধ্যে। কোনও আলো নেই যন্ত্রণা নেই। বরফের মত ঠাণ্ডা অন্ধকারের
মাঝে ডুবে যাচ্ছি। অনবরত নামছি, নামছি আর নামছি সেই আধার সমুদ্রে।
এর ঘেন আর তল নেই। অনন্তকাল ধরে শুধু নেমেই যাব। কতকাল ধরে যে
ডুবে রইলাম সেই আধারের মাঝে তা বলতে পারব না। হঠাৎ কিসে গিলে
ঠেকলাম। তৎক্ষণাৎ দপ করে আলো জলে উঠল। পরিষ্কার দিনের আলো।
চোখ চেয়ে দেখলাম।

একি! এ সব কি দেখছি! কি করছে ও!

বাখা দিতে গেলাম। কুস্তী টেরই পেলো না। বারবার বুক কাটিয়ে
চীৎকার করলাম—কুস্তী তখনই পেলো না। সে তার নিজের কাজ করে
যেতে লাগল।

ভৈরবীর মুখের আঁচল সরিয়ে তাঁর মাথাটা ধরে টানাটানি করতে লাগল।
জোর করে চোখের পাতা ঝাঁক করে কি দেখলে। মুখের মধ্যে আঙুল দেবার
চেষ্টা করলে বারবার। তারপর আন্তে আন্তে মাথাটা বালির উপর নামিয়ে
রেখে আছড়ে এসে পড়ল আমার বুকের উপর। কি বীভৎস দেখাচ্ছে কুস্তীর
মুখ! ওর নাক দিয়ে রক্ত বেরচ্ছে কেন! চোখের জলে চুলে রক্তে মিশে কি
ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে শুকে!

কুস্তী আমার মাথাটা কোলের উপর তুলে নিলে। নিয়ে ভয়ঙ্কর দৃষ্টিতে
চেয়ে রইল আমার মুখের দিকে। কি কতকগুলো গদগদ করে বললে

কাঁদতে কাঁদতে। বারবার আমার মুখের ভিতর আঙুল দিতে গেল। —হু হাতে নিজের হু মুঠো চুল ছিঁড়ে ফেলল। তাতেও হল না, নিজের তান হাতের পিঠ নিজের মুখে চেপে ধরলে। ধরে—দম বন্ধ করে রইল কিছুক্ষণ। হাতটা যখন মুখ থেকে নামাল তখন টপ টপ করে রক্ত পড়ছে হাতের পিঠ দিয়ে। কামড়ে' মাংস ছিঁড়ে নিরেছে কুস্তী নিজের হাত থেকে।

আরও সব অভূত পাগলামো করতে লাগল সে। তাকে বাধা দিতে গেলাম, বুক কাটিয়ে চীৎকার করলাম, ধরলাম চেপে তার হাত। কুস্তী এবারও কিছুই টের পেল না।

সে তখন তার জামাটা টেনে ছিঁড়ে ফেললে গা থেকে। নিজের পরনের কাপড়খানাও খুলে ফালা-ফালা করে ফেলে দিলে। আবার ঝাঁপিয়ে এসে পড়ল আমার বুকের উপর। বুকের উপর পড়ে তার স্তন দুটি জোর করে আমার মুখে ঝুঁজে দিতে আশ্রাণ চেষ্টা করতে লাগল। তাতেও যখন কিছু হল না, তখন ঠাস ঠাস করে গোটা কতক চড় লাগালে আমার হু গালে। আমার মাথার চুল হু হাতের মুঠোর ধরে অনবরত ঝাঁকাতে লাগল। শেষে অনেকক্ষণ ধরে চেয়ে রইল আমার চোখের দিকে।

তারপর কুস্তী আমাকে ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল। দাঁড়িয়ে আবার কি ভেবে একবার আমার উপর ঝুঁকে পড়ে কি কতকগুলো বললে। কিছুই বুঝতে পারলাম না তার কথা। তার সেই রক্তমাখা ভরফর চেহারার দিকে চেয়ে রইলাম।

তখন কুস্তী আমাকে ছেড়ে দিয়ে উলল অবস্থাতেই নিজের শরীরটাকে টানতে টানতে হামাগুড়ি দিয়ে উঠতে লাগল বালির টিলার উপর।

শেষবারের মত প্রাণপণে চীৎকার করলাম, “কুস্তী, যাস নি, কেলে যাস নি আমাদের।”

কুস্তী তখনোই পেল না।

আবার তুলিয়ে যেতে লাগলাম অঙ্ককারের মাঝে, বরকের মত ঠাণ্ডা আর জমার্ট অঙ্ককার। ব্যন, আর কিছু মনে নেই।

হাঁ, মনে পড়ছে যটে একবার যেন সেই অঙ্ককারের তল থেকে ফিরেছিলাম কয়েক মুহূর্তের জন্যে। সেই সময় যেন গুলমহম্মদের চীৎকারও শুনেছিলাম। চোখ মেলে দেখেছিলাম আমার মুখের উপরে একটা উটের মুখ। উটটা নাক দিয়ে আমার মুখ শুঁকছে। আর কিছুই মনে পড়ছে না। আবার তুলিয়ে গেলাম সেই অঙ্ককার সমুদ্রে।

এরপর এক রাত্রে একবার ঘুম ভেঙেছিল। চোখ চেয়ে দেখলাম টিম টিম করে একটা আলো জ্বলছে। মাথার কাছে বসে আছেন ভৈরবী। অতি কষ্টে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম—“আমরা কোথায়?” তিনি মুখের উপর হুঁকে পড়ে কানের কাছে মুখ এনে বললেন, “শোনবেণী ধর্মশালায়।” বলে আমার চোখের উপর হাত তুলিয়ে চোখ বন্ধ করে দিলেন। আবার ঘুমিয়ে পড়লাম।

১৩৫৩ সাল, ভাদ্র মাস।

করাচীর আর এক প্রান্তে সমুদ্রের কিনারায় একদিন বিকেল তিনটের সময় শেঠ ভগবান দাসের প্রকাণ্ড গাড়ি থেকে আমরা নামলাম। ডান দিকে কাঁটাতারের বেড়ার মধ্যে শত শত সী-গ্লেন বালির উপর ডানা মেলে বিমজে। বাঁ দিকে ঐ নীচে জলের ধারে সমুদ্রগামী প্রকাণ্ড পালের নৌকোটা ভাঙার দিকে কাত হয়ে রয়েছে।

ঐ নৌকোতেই ছ দিন ছ রাত সমুদ্রের বুকে পাড়ি দিয়ে কোটেশ্বর দর্শন করতে যাচ্ছি। কাছতুলের পশ্চিম দিকের শেষ প্রান্তে ভৈরব কোটেশ্বরের স্থান। মহাপীঠ হিংলাজ দর্শন করলে কোটেশ্বর দর্শন করতেই হবে। যা

কাষাখ্যার ভৈরব উমানন্দ, কালীর ভৈরব নকুলেশ্বর, তেমনি হিংলাজের ভৈরব কোটেস্বর। ভৈরব দর্শন না করলে মহাপীঠ দর্শনের ফল হয় না।

সরিতে কবে এল বড় বড় নতুন ছটা কলসী। কলসীতে আছে ধাবার জল ছ দিনের। সমুদ্রের উপর ছ দিন ঐ জল ধাব আমরা। মুখবন্ধ টিনে বুড়িতে টুকরিতে ফল মিষ্টি আরও কত কি। ছ দিনের জন্তে ছ মাসের খাতি নৌকোর উঠছে।

শেঠজী, তাঁর পত্নী, করাচীর বন্ধুবান্ধবরা—দীরা আগ্রাণ চেটায় আমাকে খাড়া করেছেন—তাঁরা সবাই এসেছেন নৌকোর তুলে দিতে। ফুল, ফুলের মালা, প্রণামী, আন্তর সিন্দূর কুমকুমের ছড়াছড়ি। ক্লিক ক্লিক কোটো উঠছে।

জোয়ার আসছে জলে। মাঝি-মালারা নৌকোর উপর ছোটোছুটি করছে। আমরা উঠে গেলাম। লম্বা কাঠখানা টেনে তুলে ফেললে নৌকোর উপর।

হুজনে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আহি ডাঙার দিকে চেয়ে। ভৈরবী কানের কাছে মুখ এনে বললেন, “আর ছুটো দিন করাচীতে থেকে গেলে হত। গুলমহম্মদ বলে গেছে যে, সে কুন্ডীর খবর নিয়ে ফিরে আসবে। তাঁদের দেশের লোক কুন্ডীকে খুঁজছে। নিশ্চয়ই তাকে পাওয়া গেছে এতদিনে।”

গোটা কতক পাল একনঙ্গে উঠে গেল উপরে দড়ির টানে। হৈ হৈ করে উঠল নৌকোর লোকেরা। নৌকোখানাও হঠাৎ ঘুরে গেল। করাচীর ডাঙা চোখের আড়ালে চলে গেল।

ভীরবেগে নৌকা ছুটল সমুদ্রের বুকে। পালে বেশ খাতাস ধরেছে।